বৈষ্ণবীয় প্রেম

(তুলনামূলক আলোচনা)

প্রথম খণ্ড

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।"

[শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।৩৬]

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ রাঢ়ী, এম, এ

চলন্তিকা
৭, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :—
করুণা বন্দোপাধ্যায়—বি. এ. (অনার্স) ; বি, টি,
রেজিঃ অফিস্ নবদ্বীপ, নদীয়া চলন্তিকা
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট—ভহর দাস

গ্রন্থণে—শ্রীকৃষ্ণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

মুদ্রাকর :—
শ্রীহরলাল বর্দ্ধন
বর্দ্ধন প্রেস
৮।৪এ, কালী ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

য—বারো টাকা

ভূমিকা

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি।

[পরলোকগত লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, ভাগবতরত্ন, এম্ এ, পি-এইচ্-ডি, পি, আর এস্ কর্তৃক তাঁহার জীবদ্দশায় লিখিত।]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে প্রেমের যে মহান্ আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে, তাহার প্রতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মনীষীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমেরিকার হার্ভার্ড শিকাগো প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে Daniel H. H. Ingalls, Edward C Dimock Jr. প্রভৃতি অধ্যাপকদের অধীনে কয়েকজন প্রতিভাবান ছাত্র এই বিষয়ের বিভিন্ন দিক লইয়া গবেষণা করিতেছেন। আমেরিকার সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্যে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বাংলা দেশে আসিয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের মধ্যে বসবাস করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে রচিত কোন গ্রন্থের উল্লেখ করিতে গেলে বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হয়। কেন না ঐ জাতীয় গ্রন্থের একান্ত অভাব। ইংরাজীতে গিরীন্দ্র মোহন মল্লিক ও ভাগবত কুমার শাস্ত্রী বৈষ্ণব ধর্মের যে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনি দুর্বোধ্য। ড. সুশীল কুমার দে তাঁহার Early history of the Vaisnava faith and culture and Movement in Bengal গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, কিন্তু শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির অভাবে ঐ গ্রন্থের অনেক উক্তি বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে ক্লেশ উৎপাদন করে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কেনেডি সাহেব চৈতন্য ধর্ম সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতে সংক্ষেপে অনেক তথ্য বর্ণিত হইলেও মিশনারিদের রচনায় যে উন্নাসিকতা দেখা যায়, তাহা হইতে উহা মুক্ত নহে। মিশনারিদের শিরোমণি Alexander Duff প্রায় সওয়া শত বৎসর পূর্বে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের উচ্চ ভাব ও আদর্শ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতে পারেন নাই যে খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রভাব ছাড়া এমন মতবাদ প্রচারিত হওয়া সম্ভব। তাই তিনি Calcutta Review য়ের পঞ্চম সংখ্যায় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখেন—

"Many of the doctrines and practices of the vaisnavas of the Chaitanya party appear to have been borrowed from the chris-tians-

tic tenets of Christianity of which they probably had received some indirect account. Their doctrines of salvation by faith, independent of the rules and observances of castes, reminds us of St. Paul's doctrine of justification without the deeds of the law. Their disregard of caste is a faint representation of that enlarged philanthropy of the evangelical dispensation, which offers its privileges to all nations and kindreds and peoples and tongues, without distinction of tribe and colour. Their exhortations to love call to our minds the charity of the New Testament, which is the bond of christian perfection."

খ্রীষ্টধর্ম্মের কোন প্রচারকের সহিত কখনও শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং ছয় গোস্বামী কোন প্রকার পরোক্ষ সংস্পর্শেও আসেন নাই। ষোড়শ শত দীর মধ্য ভাগে আকবরের রাজ্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই তাহারা তিরোধান করিয়াছিলেন। সে সময়ে উত্তর ভারতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের Asiatic Researches পত্রিকায় Robertus De Nobibilves বা Robert De Nobili নামক খ্রীষ্টীয় পাদরির কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে জানা যায় যে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি দাক্ষিণ ভারতে আগমন করেন, দাক্ষিণাত্যের লোকের মনে শ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্য বলেন যে তিনি একজন উত্তর দেশীয় ব্রাহ্মণ। তিনি সন্ন্যাসীর মত খালি গায়ে থাকিতেন এবং দেহে ছাই মাখিতেন। এইরূপে সুকৌশলে তিনি বারজন ব্রাহ্মণকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে হাজার হাজার লোককে খৃষ্টান করেন। তিনি মাদুরার মিশনের প্রতিষ্ঠাতা।

বহু পূর্ব্বে সীরিয় সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু খৃষ্টান দক্ষিণ দেশে ছিলেন বটে, কিন্তু উত্তর ভারতে তাঁহাদের কোন প্রকার প্রভাব পড়ে নাই। ডাফ্ সাহেবের অনুমান যে সম্পূর্ণ ভিত্তি হীন এবং বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্ম্ম যে বাইবেলে লিখিত প্রেমের আদর্শ অপেক্ষা অনেক উপরে তাহা বিজয়কৃষ্ণ বাটী মহাশয়ের বক্ষ্যমান গ্রন্থে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবীয় প্রেম বলিতে আমরা সাধারণতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা প্রচারিত প্রেম ধর্ম্মই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের অন্ততঃ পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে তামিল দেশের আড়্বার সন্তগণের রচনার মধ্যে প্রেম ধর্ম্মের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম আড়বার শঠকোপ তাঁহার 'তিরুবায়মাড়ি' নামক দিব্য প্রবন্ধে

দেহ, গেহ, পুত্রপরিজন, ধনজনমানযশ প্রভৃতির প্রতি বৈরাগ্য করিলে পরে ভগবদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা, রুচি এবং আসক্তির উদয় হয়। তারপর পরমভক্তি জাত হয়। সেই অবস্থায় সাধক দাস্য, সখ্য বা মধুর ভাব লাভ করেন। মধুরভাবে ভাবিত হইয়া শঠকোপ লিখিয়াছেন—

"যদি যাও গোচারণে সারাদিন অদর্শনে
ধরিতে নারিব প্রাণ কহিনু তোমায়।
বিরহ অনলে হায়— প্রাণ মোর দহি যায়
খর বহে উষ্ণ শ্বাস না দেখি সহায়॥
তব গতি মনোহর রূপশ্যাম সুন্দর
না দেখি নয়নে হায়। গেলে গোচারণে।
ব্যাকুলিত এ নয়ন বহে বারি অনুক্ষণ
মরণ সমান গণি তব অদর্শনে॥
না জানি কি কর্মফলে আসি এই গোপকুলে
অবলা গোপিনী হয়ে লভেছি জনম।
তব দাসী গণ দীনা সদা তব পরাধীনা
অসহায় দশা গণি তা যে মৃত্যু সম॥"

(সহস্র গীতি ১০।৩।৩ আচার্য্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাসের অনুবাদ)

আড়বারদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। তাঁহার নাম অণ্ডাল বা গোদাম্বজী তিনি গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া লিখিয়াছেন—হে বন্ধু, আমরা গুণহীনা, জ্ঞানহীনা, যে গোপকুলে কোন প্রকার জ্ঞান থাকিতে পারেনা, তাহাতে আমরা জন্মিয়াছি; কিন্তু সেই গোপকুলে আমাদের জীবদ্দশায় তুমি আসিয়া জন্ম লইয়াছ; এই মহাপুণ্যে তোমাকে আমরা লাভ করিয়াছি। হে গোবিন্দ, তোমার সহিত আমাদের এই যে জন্মগত সম্বন্ধ তাহা আমরা বিচ্ছিন্ন করিতে অক্ষম; তুমি যদি ইহা কাটাইতে চাও, তাহা তুমি পারিবে না; এমনকি আমরা উভয়পক্ষ মিলিত হইয়া যদি-এই জন্মগত সম্বন্ধ নিবৃত্ত করিতে চাই তাহাও সম্ভব নহে। ইহার পরে গোপীরা কৃষ্ণকে বলিতেছেন, "তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃই আমরা তোমাকে উপযুক্ত মর্য্যাদার সহিত কথা বলিতে পারিনা, তুমি যেন রাগ করিও না।" (আড়বার পৃঃ ১৬৭-১৬৮) আলোচ্য গ্রন্থের ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ অধ্যায় পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে

পারিবেন শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট অনুসরণ করিয়া কিভাবে আড়্বারগণ অপেক্ষাও প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীজীবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাধককে সখীর অনুগতা মঞ্জরীভাবে রাধাগোবিন্দের সেবা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীজী পাদ বলেন যে অন্তশ্চিন্তিত গোপীদেহে সাধন করিতে হইবে; পুরুষের পক্ষে নারীদের বেশভূষা ধারণের কোন কথা তিনি বলেন নাই। কিন্তু ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস বুকানন পূর্ণিয়া জেলার রিপোর্টে (পৃঃ ২৭৩) লেখেন যে "In the territory of Gour, at a place called Jangali-tolla is the chief seat of the Sakhibhav Vaisnavas, who dress like girls and act as religious guides for some of the impure tribes. The order is said to have been established by Sita Thakurani, wife of Adwaita." বুকানন সীতাদেবীর নন্দিনী ও জঙ্গলী নামক দুই পুরুষ শিষ্যের নামও করিয়াছেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থের প্রথম ভাগে লেখেন—যে প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল কলিকাতায় সখীভাবক সম্প্রদায়ের পুরুষেরা স্ত্রীজাতির ন্যায় বেশভূষা করিতেন ও নিজদিগকে নম্রসখীর অনুগতা বলিতেন। দত্ত মহাশয় নর্ম্ম-সখীকে ভুল করিয়া নম্রসখী বলিয়াছেন, অথবা উহা মুদ্রাকর প্রমাদ-মাত্র। তিনি লিখিয়াছেন—"বৌবাজার ও জগন্নাথ ঘাট নিবাসী কোন কোন ব্রাহ্মণ, কলুটোলা ও গরাণহাট নিবাসী কোন কোন কায়স্থ ও অন্যান্য পল্লীস্থিত-বৈদ্য, সুবর্ণবণিক ও অপরাপর জাতীয় ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্ত লোকেরা ও দুই একটি উদাসীন বৈষ্ণব এবং দলাক্রান্ত হইয়া অতিশয় উৎসাহ সহকারে উল্লিখিত রূপ প্রেমসেবার অনুষ্ঠান করিতেন। ইঁহারা সকলেই এক এক সখীর নামে বিখ্যাত ছিলেন, সময় বিশেষে এবং বিশেষতঃ দ্বাদশী তিথিতে আপনাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির বাটীতে সকলে সমাগত হইয়া স্ত্রীবেশ ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন। (২য় সংস্করণ পৃঃ ২৩০)। বলা বাহুল্য যে দত্ত মহাশয় ইহাদিগকে এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ভাবিয়া ভুল করিয়াছেন। ইঁহারা শ্রীচৈতন্য মতাবলম্বী ছিলেন। নবদ্বীপের সমাজবাড়ীর প্রধান স্থানীয় নেতা "ললিতাসখী" নামে পরিচিত ছিলেন ও সর্ব্বদা নারীর বেশভূষা ধারণ করিয়া থাকিতেন। ব্রজ মণ্ডলের সাধকেরা কিন্তু পুরুষ বেশেই থাকেন, তাঁহারা মনে মনে নিজদিগকে অল্প বয়স্কা মঞ্জরী রূপে চিন্তা করেন। এইরূপ সাধনার দার্শনিক তত্ত্ব বিজয়কৃষ্ণ বাটী মহাশয় নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। (বৈষ্ণবীয় প্রেম ২য় খণ্ড)।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্ক ভূষণ প্রেমধর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থদ্বয় লিখিয়াছেন, তাহাতে সূক্ষ্মরসানুভূতি ও গভীর পাণ্ডিত্যের ছাপ থাকিলে পাঠকের মন ভরে না, কেন না। গ্রন্থদ্বয়ের আকার অতিশয় ক্ষুদ্র। আবার অন্যদিকে পরম ভাগবত রাধা গোবিন্দনাথ মহাশয় বৈষ্ণব দর্শন লইয়া যে বিশাল পাঁচখণ্ড গ্র লিখিয়াছেন তাহাতে সাধারণ পাঠক দিশাহারা হইয়া যায়। এই দুই প্রান্তের আধিক বর্জ্জন করিয়া বিজয়কৃষ্ণ রাঢ়ী মহাশয় "বৈষ্ণবীয় প্রেম" গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বংশ বিদ্যা, সংস্কার ও চরিত্রের দ্বারা তিনি এই ধরণের গ্রন্থ লেখার উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার কৌলিক উপাধি রাঢ়ী হইতে জানা যায় যে বংশ পরম্পরায় তাঁহারা রাঢ় দেশে লোক। মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম গৌড়ীয় আখ্যায় পরিচিত হইলেও ইহার উৎপত্তি ও বিকাশ রাঢ় অঞ্চলেই। নিত্যানন্দ প্রভু রাঢ়দেশেরই মানুষ; তাঁহার লীলাক্ষেত্রও ছিল বরাহনগর-পানিহাটী হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী গ্রাম ও নগর অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে বাস করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার অনেক পার্ষদ নবদ্বীপে ও তাঁহার আশেপাশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ নবদ্বীপ হিন্দুস্কুলে আমার এক শ্রেণী উপরে পড়িতেন। আমি কোন রকমে উঁচু ক্লাসে উঠতাম কিন্তু তিনি বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পাশ করিতেন। পরে কলেজ জীবনে তিনি দর্শন শাস্ত্রে এম্, এ উপাধি লাভ করেন কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তিনি শিক্ষাবিভাগে যোগ না দিয়া রেল বিভাগে কাজ করিয়া জীবনের অধিকাংশ ভাগ অতিবাহিত করিলেন।

একজন জার্মান দার্শনিককে গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করায় তিনি বলেন, আমার বয়স মাত্র ষাট বৎসর, সত্তর বৎসরের পূর্ব্বে কি দর্শনের বই লেখা চলে?" বিজয়কৃষ্ণ বোধ হয় তো সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া সারাজীবন নীরবে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিয়া সত্তর বছরের কাছাকাছি সময়ে এই বক্ষ্যমান গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি অদ্বৈত-বংশীয় পরম পণ্ডিত ও উচ্চকোটির সাধক আনন্দ গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে যেমন বিজয়কৃষ্ণের গভীর অন্তর্দৃষ্টি আধ্যাত্মিক অনুভূতিতেও তেমনি তিনি সমৃদ্ধ। এই মণিকাঞ্চন যোগের ফলে যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা বাংলা সাহিত্যের সম্পদরূপে গণ্য হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি, ফিল, পি, এইচ,-ডি এমন কি ডিলিট্ উপাধির জন্য বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে যে সমস্ত নিবন্ধ পেশ করা হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই আমাকে পরীক্ষা করিতে হয়। সেই অভিজ্ঞতা হইতে আমি

বলিতে পারি যে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ রাঢ়ী মহাশয় এই গ্রন্থে যে পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি এবং গভীর মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনন্য সাধারণ। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় যে তিনি কোথাও নিজের পাণ্ডিত্য ফলাইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার রচনা ভঙ্গী সরল এবং সাবলীল এবং সেইজন্যই চিত্তাকর্ষক। তাঁহার এই অমূল্য গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

গোলা—দরিয়াপুর
পাটনা—৪

(স্বঃ ড. বিমান বিহারী মজুমদার)

বৈষ্ণবীয় প্রেম।

নিবেদন।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।।"

আমি যেমন ক্ষুদ্র, আমার গ্রন্থখানি তেমনি ক্ষুদ্র এবং নিবেদন ততোধিক ক্ষুদ্র। কিন্তু বিষয় বস্তু সুমহৎ। সময়ে সময়ে ভাবি, ছোট মুখে বড় কথা কেন? যাহার সাধু সঙ্গ লাভ হয় নাই, বিদ্বদ সমাজে মিশিবার সুযোগ সুবিধা ঘটে নাই, জ্ঞানের পরিধি অল্প-পরিসর, নাই বলিলেই চলে, সামান্য চাকুরী দ্বারা যাহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে এই প্রকার দুঃসাহসিক কার্যে হস্তক্ষেপ করা বামন হইয়া চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করার ন্যায় বাতুলতা এবং ধৃষ্টতামাত্র।

বৈষ্ণবগণ গ্রন্থ লিখিবার প্রারম্ভে কিম্বা তদন্তে অশেষবিধ বিনয় প্রদর্শন করেন। দৈন্য, আর্ত্তি এবং বিনয় তাঁহাদের শিরোভূষণ। বিনয় ভগবানের পাদপীঠ। যাঁহারা অতুল প্রেম সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও, নিজদিগকে দীন, হীন এবং কাঙাল বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারাই বিনয় এবং সৌজন্যাদি গুণে বিশ্বজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় কূট তর্ক জাল বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে, দম্ভ সহকারে যখন বৃন্দাবনে গোস্বামি প্রভুগণের নিকট আগমন করিতেন, তখন তাঁহাদের একদিকে অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং মনীষা, অপরদিকে বিনয়, আর্ত্তি এবং দৈন্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং অবশেষে তাঁহাদের চরণে নতি স্বীকার করিতেন। যাঁহারা অশেষ গুণ মণ্ডিত, তাঁহাদের দৈন্য মহিমোজ্জ্বল এবং মাদৃশ জনের দৈন্য দুর্বলতার পরিচায়ক এবং লজ্জাজনক। তাঁহাদের বিনয় স্বাভাবিক, মাদৃশজনের বিনয় কাঠিন্য এবং শুষ্ক লৌকিকতায় পর্য্যবসিত।

যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরন্ত, জ্ঞান-সমুদ্রের কূল কিনারা নাই, তাঁহাদের বিনয় স্বতঃস্ফূর্ত্ত। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিউটনের উক্তি তাহার প্রমাণ।

গ্রীস্ দেশের প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিত সক্রেটিসকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয়! আপনাকে বিজ্ঞ বা জ্ঞানী বলে কেন?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,

"আমাকে জ্ঞানী বা বিজ্ঞ বলে, তাহার কারণ আমি আমার অজ্ঞতা সম্বন্ধে বিজ্ঞ। (I am wise of my own ignorance.) কিন্তু আপনারা আপনাদের দোষ, ত্রুটি ধরিতে পারেন না বলিয়া এবং সে সকল বিষয়ে অচেতন থাকেন বলিয়া, লোকে আপনাদিগকে বিজ্ঞ মনে করেন না।

আমাদের উপনিষদ বলিয়াছেন—যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভগবদ্ তত্ত্ব সম্বন্ধে সকল বিষয় জানেন, তাঁহারা কিছুই জানেন না। আর যাঁহারা বলেন যে ভগবৎতত্ত্ব এবং মহিমা আমরা ক্ষুদ্র মানব হইয়া কি করিয়া জানিব, ব্রহ্মাব নিকট যাহা অবাঙ্ম-মনসো গোচর, তাঁহারা ঠিক কথাই বলেন। তাঁহাদের মধ্যে হয়তো কেহ তাঁহাকে জানিয়া থাকিবেন। প্রকৃতপক্ষে যিনি অবিষয় এবং অধোক্ষজ, তাঁহাকে জ্ঞানের প্রপঞ্চীকৃত করিয়া জানা বলাতেও অপরাধ হয়।

কেনোপনিষদেব বাণী ;—(দ্বিতীয় খণ্ড-৩য় শ্লোক।)

"যস্যামতং তস্যমতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতং অবিজানতাম্"

অর্থাৎ যিনি মনে করেন যে তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই, তিনি হয়তো কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাকে জানিযাছেন এবং যিনি মনে করেন, তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি কিছুই জানেন নাই। যাঁহারা জ্ঞানবান এবং সম্যগ দর্শী, তাঁহাদের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ তাঁহাদেব জ্ঞান আছে যে তাঁহারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে পারেন নাই। কিন্তু যাঁহারা অবিজ্ঞ এবং অসম্যগ দর্শী তাঁহাদের নিকট ব্রহ্ম বিজ্ঞাত অর্থাৎ ভ্রান্তি এবং মোহ বশতঃ তাঁহারা মনে করেন তাঁহারা যেন ব্রহ্মকে সম্যকরূপে জানিতে পারিয়াছেন।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দার্শনিকগণ, যাঁহাদেব দার্শনিক মতবাদ প্রত্যক্ষ-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা বলেন প্রমাণভাবে ভগবানের অস্তিত্ব স্থাপন করা যায় না। তন্মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন হয়তো তিনি থাকিতে পারেন, কিন্তু যদি বা তিনি থাকেন, তাহা হইলে তিনি অজ্ঞাত এবং অবিজ্ঞেয়। (un-known and un-knowable.)

আমাদের গীতাশাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—তিনি একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু এবং জ্ঞান-গম্য। 'জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।" তিনি অবিজ্ঞেয় নন তবে তিনি অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত। শুধু যে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, তাহা নহে

তিনিই একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু। তাঁহাকে জানিতে হইবে। তিনি সকলকার হৃদয়ে অধিষ্ঠাতৃরূপে বিরাজমান।

কেনোপনিষদ্ দ্বিতীয় শ্লোকেও বলিয়াছেন ;

"নাহং মন্যে সু বেদেতি, নোন বেদেতি বেদচ।
যোনস্তদ্‌বেদ, তদ্‌বেদ, নান বেদেতি বেদচ॥"

অর্থাৎ আমি মনে করি না যে আমি ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিয়াছি, কিন্তু এমন নহে যে আমি তাঁহাকে জানি না। আমি যে তাঁহাকে জানি না এমন নহে, আবার জানি এমন নহে। আমাদের মধ্যে যিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন, তিনিই-.কবল তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিযাছেন।

তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে যাঁহারা তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাঁহাবা তাঁহাকে অরূপ বলেন না সরূপ বলেন। ইহা শাশ্বত প্রশ্ন। এই প্রশ্নই যুগে যুগে উত্থিত হয়।

উপনিষদ্ বলেন—তিনি অরূপ হইয়াও বহুরূপ। 'রূপং রূপং বহুরূপং বিভাতি।' তিনি রূপে রূপে বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ বলেন, তিনি অপরূপ। প্রকৃতপক্ষে তিনি অপরূপ। কারণ তাঁহাদের চক্ষে, তাঁহার গোপবেশ, করে বংশীবিরাজিত। তিনি নবীন নীরদ বর্ণ, পীতাম্বর, ময়ূরপুচ্ছ তাঁহার শিরোভূষণ। তিনি অলকা তিলকায় বিভূষিত, নব কিশোর এবং নটবর। তাঁহার সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য অনন্ত ধারায় প্রবাহিত। তিনি নরাকৃতি—পরব্রহ্ম।

তিনি যে অপরূপ শুধু তাহা নহে তিনি অভিনব। কারণ তাঁহার নাম আছে, ধাম আছে পিতামাতা আছে এবং সর্ব্বোপরি অসংখ্য প্রেয়সী আছে। তিনি সখা-দেব সঙ্গে ধেনু চরান। বংশী বাদন করেন। ভগবত্তাকে দূরে সরাইযা দিয়া এবং নিজেব মর্য্যাদা জ্ঞান ভুলিযা গিয়া তিনি প্রেয়সীদিগের সহিত বিবিধ লীলা করিযা থাকেন। ভূভার হরণ কিম্বাধর্মসংস্থাপন পরোক্ষভাবে হইতে পারে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে তিনি কোন বিষয়ে লিপ্ত নন। কেবল লীলায় মগ্ন থাকেন। তিনি নরলীল এবং লীলা পুরুষোত্তম। তিনি নন্দ নন্দন বা যশোদা নন্দন, শ্যামসুন্দর, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বিশুদ্ধ শৃঙ্গার রসের দ্বারা তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি গঠিত। এবম্প্রকার পরি-প্রেক্ষিতে তাঁহারা ব্রহ্মকে দেখিয়া থাকেন।

তাঁহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হন না, এমন কি ভগবানের মহিমা এবং ঐশ্বর্য্য বোধের দ্বারা অভিভূত হন না। তাঁহারা ভগবানকে

প্রেমময় এবং রসময়রূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সহিত মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ তাঁহার মধুর লীলায় অনুপ্রবিষ্ট হন। তাহার ফলে তাঁহারা ভগবৎ তত্ত্বের যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা সবিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। ভগবানের সহিত তাঁহাদের যে পরিচিতি তাহা অতি নিবিড় এবং নিগূঢ়।

বৈষ্ণবদিগের আর একটি বিশেষতঃ এই যে তাঁহারা তাঁহাকে একক ভজন করেন না। যিনি তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিরূপা মহাশক্তি এবং অশেষ প্রেমবতী, তাঁহাকে তাঁহার সহিত সংগত করাইয়া এবং প্রেমের বিষয় এবং প্রেমের আশ্রয়, এতদুভয়ের সম্মেলন বিধান করাইয়া নিয়ম প্রেমোপচারে পূজা করেন। তাঁহাদের পূজার মন্ত্র এবং উপকরণ কেবল মাত্র প্রেম, অকৈতব প্রেম। ইহা সাধারণ সার্বজনীন প্রেম নহে ইহা অতীব নিগূঢ় উন্নত এবং উজ্জ্বল। ইহা শৃঙ্গার রসের দ্বারা পরিসিঞ্চিত, কেবল মাত্র ভক্ত রসিক বৃন্দের অনুভব যোগ্য এবং পরম আস্বাদ্য।

অনেকে ধারনা করেন যে বৈষ্ণবগণ anthropomorphic view লইয়া ব্রহ্মকে অতিশয় ছোট করিয়া দেখিয়াছেন। এই গ্রন্থে ইহাই আলোচ্য বিষয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাণের আবেগে লিখিতে আরম্ভ করিলেন,

'পিতা হ'য়ে পুত্র হয়ে, বন্ধু হয়ে,
এসো তুমি এসো হৃদয়ে।

কিন্তু তৎপরে তাঁহার মনে হইল, যিনি বিরাট এবং ভূমা, তাহাকে তিনি কি করিয়া ক্ষুদ্র করিবেন। তাই তিনি তাঁহার লেখনী সংযত করিয়া উপসংহার করিলেন,

"আমিও কি আপন হাতে
করবো ছোটো বিশ্ব নাথে,
জানাব আর জানবে তোমায়
ক্ষুদ্র পরিচয়ে?"

কিন্তু বৈষ্ণব গণ এই প্রকার ক্ষুদ্র পরিচয়ের মধ্য দিয়া, সেই বিরাট এবং ভূমা বস্তুকে শুধু যে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার সহিত এইরূপ ভাবে পরিচিত হইয়াছেন, যাহা অন্য কেহ হইতে পারেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের পরিচিতির চাবি কাঠি কেবলমাত্র স্বচ্ছ নির্মল এবং নিরবস্ত্র প্রেম। প্রেমের কাছে যিনি অনন্ত, যিনি ভূমা, যাঁহার উর্দ্ধে কেহ নাই, তিনি বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হন। তাঁহাদের প্রেম নিবদ্ধ থাকে একটি বস্তুতে। ইহা একনিষ্ঠ প্রেম: অপরাপর যেখানকার যত প্রেম আছে তাহা মিশিয়া যায় এই অনন্ত প্রেম পারাবারে।

তাই কবি গুরুর ভাষা উদ্ধৃত করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে,

"নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ—নিখিল প্রাণের প্রীতি।
একটি প্রেমের মাঝারে মিশিছে সকল প্রেমের স্মৃতি॥"

—অনন্ত প্রেম—

বৈষ্ণবীয় প্রেম অনন্ত প্রেমের আধার। ইহা নিবদ্ধ থাকে একটি বস্তুতে কিন্তু পরিব্যাপ্ত হয় অনন্ত ভুবনে।

আর একটি দোষারোপ করা হয় যে বৈষ্ণবদিগের ধর্ম ভাববিলাসিতার ধর্ম, যাহাকে ইংরাজীতে বলে Emotional কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য্য যে ভাবাবেগ প্রেমের অন্তর্নিহিত বস্তু। শ্রীভগবানের পঞ্চবিধ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া ভাবাবেগ স্বতঃস্ফূর্ত রূপে প্রকটিত হয় এবং হৃদয়কে তোলপাড় করে। প্রাণের মধ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলে এবং মনকে উল্লসিত করে। মৃগ যেমন মৃগনাভির গন্ধে মত্ত হইয়া দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকে, তদ্রূপ ভগবানের অপরিসীম সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যের লোভে, প্রেম হয় তখন সীমাহারা, গণ্ডীহারা এবং অসংযত। এই অসংযত প্রেম বৈষ্ণবীয় প্রেম। কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রেমের বিচিত্র স্বভাব এই যে ইহা কখন ভুল পথে চলে না এবং নীতি বিরুদ্ধ হয় না পরন্তু নূতন নূতন আনন্দ রসের সঞ্চার করে। প্রবল ভগবদনুভূতির ফলে দেহে সাত্ত্বিক বিকারাদি প্রকাশ পায়।

বৈষ্ণবীয়প্রেমসাগরের অনন্ত তরঙ্গের মধ্যে কতিপয় তরঙ্গ লইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত। ইহা নিছক সমালোচনামূলক আলোচনা। ইহা কেবল উদ্দেশ্যমূলক নহে অথবা কাহাকে কোন শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। আমি সাধারণ লোক। কাহাকে কোন শিক্ষা দিবার যোগ্যতা এবং অধিকার আমার নাই। আমার চক্ষে বৈষ্ণবীয় প্রেম যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে তাহা ঔৎসুক্য ভরে এবং সাধারণ দৃষ্টি ভঙ্গিতে প্রবন্ধাকারে বিবৃত করিয়াছি।

রাধা প্রেম এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বৈষ্ণবীয় প্রেম বলিতে রাধা প্রেমকে বুঝায়। বিবিধ প্রেমরাজ্যের উল্লেখ করিয়া এবং তাহাদের আপেক্ষিক ন্যূনতা বা অপকর্ষ দেখাইয়া 'নেতি, নেতি' এই নীতিমুখে তাহাদিগকে খণ্ডন করা হইয়াছে এবং উন্নত হইতে উন্নততর এবং পরিশেষে সর্কোন্নত প্রেমের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা প্রেমের ক্রমবিকাশ (Evolution of love প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার মাধুর্য্য নির্ভর করে প্রকাশ বৈচিত্র্যের উপর। মিষ্টান্ন তৈয়ারী করিবার উপাদান অনেকের জানা থাকিতে পারে কিন্তু মিষ্টান্নের তারতম্য নির্ভর করে 'ভিয়ান

পারিপাট্যের উপর।' গোস্বামি চরণ গণ তাঁহাদের অনবদ্য সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রেমের বহুবিধ অনুশীলন করিয়াছেন, বহুমুখী লীলাকাহিনী বিস্তাবিত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন এবং তন্মধ্যদিয়া ভজন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করা সুদুষ্কর। অনেকের পক্ষে সে সকল গ্রন্থ পড়িবার অবকাশ বা সুযোগ সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। পক্ষান্তরে এই সকল লীলা কাহিনী বহু গ্রন্থে বহু স্থলে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। সেই সকল গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এবং সাধারণের দৃষ্টি ভঙ্গী লইয়া বৈষ্ণবীয় প্রেমের একটি আলেখ্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। অবশ্য যাহার ভাব নাই, ভাষা নাই, ভক্তি নাই এবং প্রেম নাই তাহার পক্ষে ইহা দুঃসাহসের কার্য্য এবং তাহাতে যে বহুবিধ দোষ ত্রুটি চ্যুতি বিচ্যুতি থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি সহৃদয় পাঠক বৃন্দ সে সকল দোষ ত্রুটি কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবেন।

নিম্নোক্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থের মূল উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে—

১। শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত শ্রীমদুজ্জ্বল নীলমণি, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, বিদগ্ধ মাধব নাটক এবং স্তবমালা।

২। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, গোবিন্দ লীলামৃত, সারঙ্গ রঙ্গদাটীকা।

৩। শ্রীবিল্ব মঙ্গল ঠাকুরের—শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত।

৪। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর—শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত, সঙ্গীত মাধব, রাধা-রস-সুধানিধি।

৫। শ্রীজয়দেব কৃত—শ্রীগীত গোবিন্দ।

৬। ভক্ত কবিগণের পদাবলী, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, শ্রীজীব গোস্বামীর সন্দর্ভ ইত্যাদি।

৭। শ্রীরাধা গোবিন্দ নাথ মহাশয়ের—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের গৌর কৃপা তরঙ্গিনী টীকা—ইত্যাদি।

বিষয় বস্তুকে হৃদয় গ্রাহী করিবার উদ্দেশ্যে কবি সাহিত্যিক দিগের বাক্য স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কবিগুরু রবীন্দ্র নাথের কবিতা বৈষ্ণব ভাবানুকূল্যে গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তুলনা মূলক রূপে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীঅদ্বৈত কুলোদ্ভব পূজ্যপাদ নিত্যধামগত আনন্দ গোপাল গোস্বামি মহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি তাহার কিছু কিছু এই গ্রন্থে ছায়াপাত করিয়াছে।

তাঁহার সুযোগ্য পুত্র প্রসিদ্ধ ভাগবত বক্তা প্রভু পাদ শ্রীকিশোর গোপাল গোস্বামী এম এ কাব্য তীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।

আমার বাল্যবন্ধু বিশ্ব বিশ্রুত অধ্যাপক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, ভাগবতরত্ন, এম, এ, পি, এইচ্, ডি, পি, আর, এস্ মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক এই গ্রন্থের "গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার পরিচিতি," শীর্ষক যে দীর্ঘ ভূমিকা তাঁহার জীবদ্দশায় লিখিয়া দিয়াছেন তাহাতে আমি অতিশয় ধন্য হইয়াছি। কিন্তু আকস্মিকভাবে তাঁহার যে দেহ অবসান হইল, তাহাতে আমি যে কতদূর মর্ম্মাহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত তাহা বর্ণনাতীত। তিনি তাঁহার পরলোক গমনের দুই সপ্তাহ পূর্বেও এই গ্রন্থ কবে প্রকাশিত হইবে তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে ইহা দেখাইতে পারিলাম না। ইহাই আমার দুঃখ রহিয়া গেল।

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, এম, এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত আমাকে বিশেষভাবে প্রণোদিত করিয়াছেন। তাঁহার প্ররোচনা এই গ্রন্থ মুদ্রণের মূলীভূত কারণ।

যে সকল শিক্ষিত ভদ্র মহোদয় মৌখিকভাবে কিম্বা লিখিত ভাবে এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

যে সকল বিষয় মূলগ্রন্থে পরিস্ফুট হয় নাই, সেই সকল বিষয় পুনরায় 'পরিশিষ্টে' লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের যে সকল পৃষ্ঠায় শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেই শ্লোকের পরিশিষ্টে একটি শ্লোক নির্দ্দেশনী তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

অনবধানতা বশতঃ বহুস্থলে বহুবিধ মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গেল। সেজন্য আমি বিশেষ লজ্জিত এবং সহৃদয় পাঠকবৃন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

"জয়শ্রী শ্রীরাধা মদন গোপাল।"

নবদ্বীপ

দীনাতিদীন

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রাঢ়ী।

গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত

অদ্বৈতকুলোদ্ভব, পরমারাধ্য নিত্যধামগত পূজ্যপাদ আনন্দ গোপাল গোস্বামীর সুযোগ্য পুত্র, প্রসিদ্ধ ভাগবতবক্তা প্রভুপাদ শ্রীকিশোরগোপাল গোস্বামী এম, এ, কাব্যতীর্থ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"শ্রীশ্রীরাধামদন গোপাল শরণম্।
শ্রীশ্রীসীতাদ্বৈত চন্দ্রো জয়তি।।'

শ্রীযুক্ত বিজয় দাদার সহিত সম্বন্ধ হইবার সমকাল হইতেই—তাহার প্রেমে পড়িয়াছি—এইবার উহার "বৈষ্ণবীয় প্রেম" পড়াও হইল। নিত্য লীল প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীঅদ্বৈতকুল তিলক পরমারাধ্য মদীয় পিতৃদেব প্রভুপাদ আনন্দ গোপাল গোস্বামীর কৃপাপাত্র তিনি। পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীমুখ নির্গলিত, বিবিধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত তাঁহার নিজগবেষণা প্রসূত সিদ্ধান্ত ও কাহিনী সমূহ চয়ন করিয়া তিনি এই "বৈষ্ণবীয় প্রেম" গ্রন্থখানি সাজাইয়াছেন।

বিজয়দাদা বৈষ্ণব, বিদ্বান এবং সুলেখক। সাধারণ লোককে সহজভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হার্দ্দ উপাসনা বুঝাইবার জন্য তাঁহার এই প্রয়াস।

বিজয়দাদা তাঁহার "বৈষ্ণবীয় প্রেম" গ্রন্থে প্রেমের **বিজয়-বৈজয়ন্তী** উড়াইয়াছেন। আশীর্বাদ করি মায়া বিজয় করিয়া স্বরূপের আবেশে রাধা-দাস্য রসে তিনি সর্বদা বিভোর হইয়া নিজ অভিষ্ট শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালযুগলের সেবা রসে-তন্ময় হইয়া যাউন।"

আশীর্বাদক—
স্বাঃ শ্রী কিশোরগোপাল গোস্বামী।

"শ্রীশ্রীশ্যামবিনোদিনী কুঞ্জ
শ্রীধাম নবদ্বীপ—(নদীয়া)
মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী রোড্।

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের বিখ্যাত ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্য নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নে বিবৃত হইল।

* * * *

কেবলমাত্র এই গ্রন্থে আমি কি পাইলাম, কি বুঝিলাম এবং কি ভাবিলাম তাহাই সসংকোচে নিবেদন করিব।

গ্রন্থ খানির প্রথম খণ্ড বিবরণ ও তুলনামূলক, দ্বিতীয় খণ্ড দর্শনাত্মক।

* * * * *

শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন নিজের ভক্তি শ্রী কলিহত জীবকে বিলাইতে। সেই ভক্তি উন্নত-উজ্জ্বল রসাশ্রিত। ভক্ত ও ভগবান নহেন, রসিক ও রাসেশ্বরী এই বিশ্বে বিদ্যমান। তাঁহার চরণাশ্রয়ী গৌড়ীয় আচার্যগণ তাই স্বীকার করেন বেদান্তের ভাষ্য স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রকে। সেই মতে আছেন শুধু রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ীশ্রী রাধা। ব্রজদেবীগণ এই শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপা শ্রীরাধার কায়ব্যূহ। কালসহোদরা কালিন্দীকূলে তাঁহার বেণুরন্ধ্রে নিত্যকাম গায়ত্রী বাজিতেছে, আকৃষ্ট হইতেছেন গোপীগণ, রাসলীলা শাশ্বত কাল চলিতেছে। প্রেমের আশ্রয় গোপীগণ ও বিষয় শ্রীকৃষ্ণে বিশ্ব যেন দ্বিধা বিভক্ত। ভক্ত নামের সেই তো সার্থকতা।

আকর্ষণ করেন সেই রসিক শেখর কৃষ্ণ, আরাধনা করেন বা আরাধিত হন বলিয়াই মহাভাবময়ী রাধা। বিশ্বে ইহার বাহিরে কিছু নাই। আজিও বৃন্দাবনে এই বিশ্ব প্রতিমা বিরাজিত। **শ্রদ্ধেয় বিজয় বাবু এই বৃন্দাবনের অনুপম চিত্র আঁকিয়াছেন, নানারঙে, নানারসে। তিনি এই গ্রন্থে প্রেমের বর্ণ পরিচয়** করাইয়াছেন আমাদের।

* * * *

অশ্রু সিক্ত নয়নে, বাষ্পাকুলকণ্ঠে, প্রেম গদগদ চিত্তে বিজয় বাবু তাঁহার এই অপূর্ব গ্রন্থের মধ্য দিয়া আমাদের এই পরম রমণীয় লোকে আহ্বান করিতেছেন। কর্ম জীবনে নানা ঘাটে ঘাটে নানা দেশ বিদেশে জীবন অতিবাহিত করিয়া, আজি কর্ম জীবনের অবসানে, জাহ্নবীকূলে গুপ্ত বৃন্দাবন শ্রীনবদ্বীপে শ্রীরসিকেন্দ্রের মুরলী ধ্বনি শ্রবণ করাইতেছেন। আমরা অবনত মস্তকে সেই পথ অনুসরণ করিলে, "হন্ত ন্যস্ত লতাপবর্গ মখিলোদারং কিশোরাকৃতিঃ" অবশ্যই আমাদের প্রতি ব্রজদেবীগণ

পদপঙ্কজ মধুপ মনে করিয়া একবার কৃপা কটাক্ষ করিবেন, আমাদের জীবন সার্থক হইবে।

শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী

(স্বা) শ্রীসত্য নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক-ইংরাজী বিভাগ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়।

অদ্বৈতকুলোদ্ভব প্রখ্যাত ভাগবত বক্তা প্রভুপাদ শ্রীজীতেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ভক্তি শ্রী মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"শ্রীশ্রীরাধামদন গোপাল বিজয়তে।"

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ রাঢী এম্.-এ. মহাশয়ের "বৈষ্ণবীয় প্রেম" নামক অপূর্ব বৈষ্ণবীয় নিগূঢ় সারসিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য গ্রন্থখানি পড়িয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি। এই অমূল্য গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিবে—ইহাই আমার বিশ্বাস।

প্রভু সীতানাথের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করি গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হইয়া এইপ্রকার সুসিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থরচনা করিয়া সম্প্রদায়ের মঙ্গল সাধন করুন।

ইতি—
আশীর্বাদক
শ্রীজীতেন্দ্রনাথ গোস্বামী

শ্রীধাম নবদ্বীপ
অদ্বৈতভবন

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বৈষ্ণবীয় প্রেমের ২য় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া এবং প্রথম খণ্ডের কিয়দংশ দেখিয়া যে দীর্ঘ মন্তব্য ২য় খণ্ডের ভূমিকা স্বরূপ লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"বিশ্বব্যাপী নানা অমঙ্গলজনক দুঃসংবাদের মধ্যে একটি মঙ্গলজনক সূচনা হইল—শিক্ষিত সমাজে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেম ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ আলোচনায় আগ্রহ ও অনুরাগবৃদ্ধি। কিছুদিন হইতেই বাংলা সাহিত্যে এবিষয়ে কয়েকখানি ছোটবড়

পুস্তক ও মাসিকপত্রে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি শুধু যে ইহাতে সংখ্যাবৃদ্ধি করিল তাহা নহে, সম্পদবৃদ্ধি করিয়াছে বলিতে হইবে।

* * * *

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তত্ত্বটিও যেরূপ নিগূঢ়, তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্মের দার্শনিক অনুভূতিও সেইরূপ দুর্বোধ্য ও দুরূহ। দুঃখের বিষয় ইংরাজী শিক্ষিত গ্রন্থকারগণের লেখার মধ্যে বহুস্থলে স্বাধীন চিন্তার প্রাবল্যে প্রাচীন সিদ্ধান্ত সম্পদ আবৃত হইয়া পড়ে। অন্তরে রীতিমত দৃঢ়তা না থাকিলে এই সব নানামতকে আত্মস্থ করিয়া "সকলি সম্ভবে তাতে যাতে অবতারী" এই সুসিদ্ধান্তে অটল থাকা যায় না। সুখের বিষয় গ্রন্থকার যুগোপযোগী সাবধানতা অবলম্বন করিলেও গোস্বামি সিদ্ধান্তে দৃঢ়নিষ্ঠ আছেন ইহা বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিযাছি।

* * * *

এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম ধর্ম সম্বন্ধে যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

হরি কথার বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই ধন্য হন। গ্রন্থকার ও পাঠক উভযেই ধন্য হউন, ইহাই শুভকামনা জানাইতেছি। ইতি—

শ্রীধাম নবদ্বীপ

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যতীর্থ

উৎসর্গ পত্র

যাঁহার মুখাব্জ নিঃসৃত লীলামৃত পান করিয়া বিনীত মস্তকে তচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম, যিনি ছিলেন অদ্বৈত কুলতিলক উন্নত প্রভাব এবং অদ্বিতীয় ভাগবত বক্তা, সেই নিত্যধামগত পূজ্যপাদ **আনন্দগোপাল গোস্বামী** প্রভুর স্মৃত্যর্থে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি—

নবদ্বীপ

তাঁহার দীনাতিদীন সেবক
"বিজয়"

—ঃ বিষয় সূচী ঃ—

বৈষ্ণবীয় প্রেম।

প্রথম তরঙ্গ।

সূচনা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রেমকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। প্রেম তাঁহাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে এবং শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে প্রেম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। প্রেম যে কেবল বিশ্বজয়ী তাহা নহে, ভগবৎবিজয়ী স্পর্ধা দ্বারাও স্পর্ধান্বিত। প্রেম সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ, অখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীভগবানের সহিত মিলন ঘটাইতে এবং স্বতন্ত্রেচ্ছ ভগবানকে অধীনস্থ করিতে সমর্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমকে সর্বোর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছেন। তাহার ভূলোকে অবতরণের মূলীভূত কারণ কেবল মাত্র স্বপ্রেম মাধুর্য্যাস্বাদন এবং তৎসঙ্গে জগতে প্রেমরস বিতরণ। শ্রীমদ্ভাগবতে নিরুপাধিক প্রেমের মহিমোজ্জ্বল বিচিত্র লীলাকাহিনী বর্ণিত আছে। সে কারণ তিনি ভাগবতকে বেদের যথার্থ অর্থ নির্ণায়ক, সর্ববেদান্ত সার এবং বেদের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।" (ইতি শ্রীচৈতন্য-মত-মঞ্জুষা) অর্থাৎ ইহাই তাহার সুদৃঢ় অভিমত। বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়া যে সকল রহস্যপূর্ণ বাণী তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল এবং যে সকল লীলা তিনি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় প্রেম মহিমার পরিচায়ক।

তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের যে সকল ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহার কোনটিই তাঁহার আদৃত হয় নাই এবং অকাট্য যুক্তি বলে তৎসমুদয় খণ্ডন করিয়া তিনি স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার অনুগৃহীত পার্ষদগণ প্রেমের অপরিসীম প্রভাব এবং অপূর্ব বশীকরণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রেমের মধ্যে যেমন নিখিল সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য নিহিত, তেমনি নিরাবিল আনন্দের প্রাচুর্য্য জড়িত, ইহা তাঁহারা বিভিন্ন

ছন্দে, গানে এবং বিবিধ সন্দর্ভ নাটকাদির মাধ্যমে প্রদর্শন করিয়াছেন। এবম্বিধ অলৌকিক প্রেমের বৈচিত্র্য এবং বিজয় গৌরব অন্য কোথাও পরিদৃষ্ট হয় নাই।

জীবের পক্ষে প্রেমের ক্ষুদ্র কণিকা লাভও কঠিন। প্রেম অনন্ত পারাবার সদৃশ। তাহার গভীরতা নির্ণয় দুঃসাধ্য। প্রেম দুরধিগম্য এবং দুষ্প্রাপ্য। বায়ু সমুদ্র বক্ষের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া এক কণিকা জল বহন করিতে পারে বটে কিন্তু প্রেমের সামান্য কণিকা লাভও দুরায়ত্ত।

প্রেমের সংজ্ঞা নির্ধারণ করাও দুরূহ। প্রেমের কোন গণ্ডী বা সীমা নাই, কোন শব্দার্থের দ্বারাও তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন। প্রেম অসীম এবং ভূমা। শাখাচন্দ্রের ন্যায় কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করা যায় মাত্র।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ 'শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি নামক তাহার অমূল্য রসশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন—আমি ঐ রস সমুদ্রের তটে স্থিত হইয়া অঙ্গুলি দ্বারা যৎ সামান্য স্পর্শ করিলাম কিন্তু উহাতে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। যেহেতু রসসমুদ্র অতুল এবং অপার বলিয়া দুর্বিগ্রাহ এবং দুরধিগম্য হইয়া রহিল।

তাঁহার এবম্প্রকার উক্তি একদিকে যেমন সত্যের স্বীকৃতি, অপরদিকে তেমনি বৈষ্ণব সুলভ বিনয় প্রদর্শন। ইহা প্রসঙ্গতঃ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় প্রাচীনপ্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার্ আইজাক্ নিউটনের সুপরিচিত উক্তি। "তিনিও তদ্রূপ বলিয়াছিলেন, 'আমার সম্মুখে বিশাল জ্ঞান সমুদ্র দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু আমি তাহাতে অবগাহন করিতে পারিলাম না। কেবল সাগর সৈকতে বসিয়া কতিপয় উপলখণ্ড আহরণ করিলাম। জ্ঞানরূপ মহামূল্য রত্নসমূহ সমুদ্রের অতল তলে লুক্কায়িত রহিল।"

এই প্রকারে যাহা চিরন্তন সত্য, তাহা দেশ কাল পাত্র প্রভৃতির ক্ষুদ্রগণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বতঃ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন কালের মনীষী বৃন্দের মধ্যে যে ভাবৈক্য দৃষ্ট হয়, ইহা তাহার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

যাহা হউক এস্থলে প্রেমরূপ মহাবস্তুর যৎকিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে মাত্র। ইষ্টে আসক্তি যখন গাঢ়ত্ব এবং সান্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সুদৃঢ় ভাববন্ধন যখন প্রতিকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও কখন শ্লথ হয় না, তখন পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রেম আখ্যা দেন।

"সর্বথা ধ্বংস রহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে।
যদ্ভাব বন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (উঃ নীঃ)

রতির ঘনীভূত অবস্থার নাম প্রেম। প্রেম প্রাকৃত মনের প্রাকৃত বৃত্তি নহে। প্রেম অপ্রাকৃত। হ্লাদিনী সম্বিদংশপ্রধান শুদ্ধ সত্বের বৃত্তি। সে কারণ প্রেম স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু, স্বপ্রকাশ এবং হ্লাদিনীরূপ স্বরূপ শক্তির পরিণতি। বৈষ্ণবাচার্যগণ ইহাকে প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। প্রেম পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম শক্তির সারাংশ।

প্রেমের দ্বারা প্রকৃত পক্ষে শ্রীভগবানের তুষ্টি-বিধান করিতে পারা যায়। তাঁহার তত্ত্বে এবং লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ হয়। প্রেমের অপূর্ব বশীকরণ শক্তির দ্বারা ভগবানকে সম্যকরূপে বন্ধন করিতে পারা যায়। অপর দিকে প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান স্বয়ং আত্মারাম এবং আপ্তকাম হইয়াও লুব্ধ তৃষিত এবং চঞ্চল হইয়া উঠেন।

ভগবৎ স্বরূপে অবস্থিত প্রেম যখন তাহা হইতে নামিয়া আসে এবং পরম বিশুদ্ধ আধারে পতিত হয়, তখন সে প্রেম সর্বগুণাকর্ষী ভগবানকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে। তাহার আত্মারামতা ঘুচাইয়া দিয়া পূর্ণের মধ্যেও অভাব ঘটাইয়া দেয় এবং স্বকীয় প্রেমের আনন্দ বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহাকে মুগ্ধ এবং উন্মত্ত করিয়া তুলে। সে কারণ ভগবান প্রেমময়, রসময় এবং আনন্দময়। শ্রুতি তাঁহাকে 'রসোবৈ সঃ।" বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন।

তাহার স্বরূপের আনন্দ যখন অপর কর্তৃক আস্বাদ্য হয় তখন তিনি কেবল রসস্বরূপ। কিন্তু তিনিও যখন স্বপ্রেম রস আস্বাদন করিবার জন্য উদ্গ্রীব হন তখন তিনি রসিক বা রসাভিলাষী। রসস্বরূপতা এবং রসিকতা তাহার স্বরূপগত ধর্ম।

অপরাপর আচার্যগণ 'রসোবৈ সঃ' এই শ্রুতিবাক্য হইতে কেবলমাত্র তাহার রসস্বরূপতা—বা আনন্দ স্বরূপতা ধর্মের পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্যতীত কেহই তাহার রসিকত্ব বা রসলিপ্সুতা ধর্মের সম্যক পরিচয় দেন নাই।

প্রেমের দ্বারাই জীব এবং ভগবানের মধ্যে নিবিড় এবং মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। জীবের চিত্তের মধ্যে রসস্বরূপতা ধর্ম নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রেমলাভের জন্য জীবের অসীম আকাঙ্খাও আছে। কিন্তু প্রেমের স্বরূপকে ধরিতে না পারায় সে মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাৎ ছুটাছুটি করে। ফলে বিশুদ্ধ প্রেমকে না পাওয়ায় তাহাকে অশেষবিধ দুঃখ এবং অশান্তি ভোগ করিতে হয়। অপ্রাকৃত প্রেমকে লাভ করিতে পারিলে জীবের পরা নির্বৃত্তি লাভ হয় এবং অপরিসীম আনন্দের উচ্ছ্বাস

বহিয়া যায়। জীবনিষ্ঠ ভালবাসা যখন ভগবৎ নিষ্ঠায় পরিণত হয় তখন তাহা প্রেম পদ বাচ্য হয়। ভগবৎ প্রীতিই কেবল প্রেম পদ বাচ্য।

প্রেম জীবের মুখ্য প্রয়োজন এবং পঞ্চম পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল অতিক্রম করিয়া প্রেমের রাজ্য তদুপরি বিরাজিত। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফলের স্বরূপ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহাদের কোনটারই বাস্তব পুরুষার্থতা নাই। পুরুষার্থের অর্থ যাহা জীবের চির আকাঙ্ক্ষিত এবং অভীষ্ট বস্তু। সুখই জীবের অভীষ্ট বস্তু। "সুখং মে ভূযাৎ, দুঃখং মা ভূঃ।" ইহাই জীবের ঐকান্তিক অভিলাষ। কিন্তু সুখের স্বরূপ বুঝিতে না পারায় মায়াবদ্ধ অজ্ঞজীব সাংসারিক সুখকেই সুখ বলিয়া মনে করে এবং পরিশেষে প্রতারিত হয়। তাহারা কামকে পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করে এবং কামোপভোগ পরায়ণ হইয়া ধর্মাধর্মে জলাঞ্জলি দেয় এবং হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করিবার জন্য তাহারা নীতিবিরুদ্ধ কর্ম করিতেও পশ্চাদ পদ হয় না। যে কোন উপায়ে তাহারা কাম বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য চেষ্টিত হয়। ফলে তাহারা সাংসারিক সুখভোগ করিতে গিয়া কেবল ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হয়। **ইহারা নিম্নস্তরীয় তমোগুণ-প্রধান পশুতুল্য অজ্ঞ জীব।**

এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর জীব আছেন, যাহারা বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান এবং নীতি মার্গ অনুসরণকারী। যদিও কামই তাহাদের পুরুষার্থ তথাপি তাহাদের কামোপভোগ এবং নিকৃষ্ট স্তরীয় জীবের কামোপভোগ এক পর্য্যায় ভুক্ত নহে। তাহারা সাংসারিক অনিত্য সুখে লালায়িত না হইয়া বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম পালন করেন এবং পুণ্য সঞ্চয় করিয়া অন্তিমে স্বর্গসুখ ভোগ করেন। স্বজন প্রতিপালন এবং বিবিধ সৎকর্ম অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত তাহাদের অর্থের প্রয়োজন হয়। সৎপথে অর্থ উপার্জন করিয়া তাহারা আনুষঙ্গিক ভাবে দেশের এবং সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। যদিও দৈহিক ও মানসিক সুখ তাহাদের কাম্য তথাপি নীতিমার্গ অনুসরণ করায় তাহাদের জীবন যাত্রার মান প্রথম পর্য্যায়ভুক্ত জীবের মান হইতে উন্নত। ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কামই উভয় শ্রেণীর পুরুষার্থ। ধর্ম এবং অর্থ কামোপভোগরূপ পুরুষার্থের উপকরণ স্বরূপ।

কিন্তু পুণ্য ফলে তাঁহারা স্বর্গে গিয়া যে সুখ ভোগ করেন তাহাও অনিত্য। পুণ্য ক্ষয়িত হইলেই তাঁহাদের পুনরায় স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া মর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার বচন :—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈ রিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্য মাসাদ্য সুরেন্দ্র লোক
মশ্নন্তি দিব্যান দিবি দেব ভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম্
ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশন্তি
এবং ত্রয়ীধর্ম মনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥"

অতএব যাঁহারা কাম কামী এবং স্বর্গই যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা বর্ণাশ্রম কর্ম প্রতিপালন করিয়াও সংসারের গতাগতি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। সে কারণ শ্রীরঘুনাথ দাস মহাশয় তাহার মনঃ শিক্ষায় উপদেশ দিয়াছেন,—

নধর্মং নাধর্মং শ্রুতিগণ নিরুক্তং কিলকুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যা মিহতনু॥"

হে মন। তুমি শ্রুতিগণ নিরুক্ত ধর্ম এবং অধর্ম কিছুই করিও না। শ্রুতিগণ যাহা সর্বোপরি এবং সর্বোপাদেয় বস্তু বলিয়া চরম সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যা কর। স্থূল কথা এই যে ধর্ম অনুষ্ঠান করিলে অনিত্য স্বর্গ সুখ লাভ হইতে পারে কিন্তু তাহাও 'খ' পুষ্পের ন্যায় অলীক এবং অধর্ম করিলে নিরয়গামী হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সুখ এবং দুঃখ উভয় প্রকার ভোগই প্রেম ভক্তি লাভের ঘোর পরিপন্থী। অতএব ইহা হইতে বুঝা যায় যে কাম কখন পুরুষার্থ হইতে পারে না। এবম্প্রকার জীবগণের মনোবৃত্তি রজোগুণ প্রধান। **তাঁহারাও মায়াবদ্ধ বুভুক্ষু জীব।**

ইঁহাদের অপেক্ষা আর এক শ্রেণী: উন্নত জীব আছেন, যাঁহারা তত্ত্বান্বেষী এবং সাত্ত্বিকভাবাপন্ন। **তাঁহারা মুমুক্ষু জীব।** তাঁহারা ইহলোক এবং পরলোকের সুখকে সুখ বলিয়া গণ্য করেন না। এ সংসার যে দুঃখের আগার এবং স্বর্গ-সুখও যে নশ্বর তাহা তাঁহারা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। সে কারণ মায়া বন্ধন ছিন্ন করিয়া দুঃখের হ' হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য তাঁহারা মোক্ষকে পুরুষার্থ রূপে গ্রহণ করেন। মোক্ষ শব্দের রূঢ়ি অর্থ 'ব্রহ্মসাযুজ্য'। পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে সাযুজ্য মুক্তিই তাঁহাদের কাম্য। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন যে, ভুক্তি মুক্তি বাসনা অপেক্ষাও মোক্ষ বাঞ্ছা অজ্ঞানতম

অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকার। শুধু তাহাই নহে, ইহা সর্বোচ্চ কৈতব বা কপটতা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বাণী :—

"তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ।।"

মোক্ষকামী জীব স্বস্বরূপের বিনাশ সাধন করিয়া দুঃখের হাত এড়াইবার জন্য নির্বিশেষ ব্রহ্মে মিশিয়া যাইতে চান। ইহাতে প্রেমভক্তির প্রাণস্বরূপ সেব্য সেবকত্ব বুদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাঁহারা একপ্রকার আত্মঘাতী হইয়া পড়েন। উপরন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মে মিশিয়া যাওয়া নিবন্ধন, তাঁহাদের পৃথক অস্তিত্ব না থাকায় এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম আনন্দ বৈচিত্রীহীন হওয়ায় তাহারা ব্রহ্মসুখও উপভোগ করিতে পারেন না।

মোক্ষকে কৈতব প্রধান বলিবার হেতু এই যে অপরাপর মুক্তি চতুষ্টয় যথা সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি এবং সারূপ্য ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সেবার অবকাশ আছে, যদিও স্বসুখ বাসনাই প্রধান, তথাপি মোক্ষ অর্থাৎ ব্রহ্ম সাযুজ্যে তাহা একেবারে তিরোহিত। সেকারণ মোক্ষবাঞ্ছার ন্যায় আত্মবঞ্চনা আর কিছুই নাই।

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লিখিত হইতেছে যে ব্রহ্ম সাযুজ্য অপেক্ষা ঈশ্বর সাযুজ্য আরও ঘৃণিত এবং নিন্দনীয়। কারণ ভক্তিরাণীর কৃপা হইলে যাঁহারা ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা পুনরায় সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া ভগবৎ ভজন করিতে পারেন এই প্রকার শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। 'মুক্তাঃপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।' এখানে মুক্তি শব্দে সাযুজ্য মুক্তিকে বুঝায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে সাযুজ্য মুক্তি কিম্বা অন্য কোন প্রকার মুক্তিতে জীবের জীবত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধিত হয় না। কিন্তু ঈশ্বর সাযুজ্যে ভক্তির মূল উৎপাটিত হওয়ায় প্রেমভক্তির কোন স্থান থাকে না।

অতএব বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উপদেশ দিলেন যে যদি তোমরা পরমধর্ম উদ্‌যাপন করিয়া প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতে চাও তাহা হইলে মোক্ষাদি বাসনা সম্যকরূপে পরিত্যাগ কর। শ্রীমদ্ভাগবতে যে ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে তাহাই পরম ধর্ম। পরম ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—

"ধর্ম প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিংবা পরৈরীশ্বর:
সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ।।"

মহামুনি শ্রীনারায়ণ কৃত শ্রীমদ্ভাগবতে নির্মৎসর সাধুদিগের যে ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে তাহা সর্বপ্রকার কৈতব বা কপটতাশূন্য, অতএব পরমধর্ম। 'প্রোজ্ঝিত কৈতব' পরমধর্মের স্বরূপ লক্ষণ, অপরাপরগুলি পরমধর্মের তটস্থ লক্ষণ। "প্রোজ্ঝিত কৈতব' শব্দের শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "প্র শব্দেন মোক্ষাদিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" 'প্র' শব্দে মোক্ষ বাঞ্ছা পর্য্যন্ত যাহা অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ চরম পুরুষার্থ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, সেই মোক্ষ বাঞ্ছাও নিরাকৃত হইল। প্রেম-ভক্তির পথে মোক্ষ বাঞ্ছা প্রধান অন্তরায়। মোক্ষকামী ব্যক্তির মূল উদ্দেশ্য দুঃখ নিবৃত্তি। দুঃখ ভোগ হইতে রেহাই পাইবার জন্য নিজেকে তিনি ব্রহ্ম সত্তায় বিলীন করিয়া দিতে চান। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মোক্ষকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাহার কারণ তাহাদের কাম্য সেবা এবং তজ্জনিত আনন্দ। কিন্তু যদি নিজের সত্তা ব্রহ্মসত্তায় বিলীন হয়, তাহা হইলে কে কাহাকে সেবা বা উপাসনা করিবে। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদিবর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথামভ্যুদয়ো ভবেৎ"।
শ্রীকৃষ্ণ চরণাম্ভোজ—সেবা—নিবৃতচেতসাং।
এবং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ॥"

ভুক্তি মুক্তিরূপ পিশাচী যদি হৃদয়ে নৃত্য করে, তাহা হইলে প্রেমভক্তিরূপ সুখের উদয় কিরূপে সম্ভবে। শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল সেবাজাত পরমানন্দে পরিপূর্ণচিত্ত ভক্তবৃন্দের কখন মোক্ষ বাসনা হয় না। অতএব ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বিধ ফল প্রেমের গণ্ডীর বহির্ভূত। সে কারণ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থ রূপে স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য দেব বলিলেন,—বেদে, পুরাণে, সর্বশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ তত্ত্ব বলিয়া নিরূপিত। জীবের সহিত তাঁহার মধুর সম্বন্ধ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান। জীব স্বরূপতঃ তাঁহার নিত্য দাস। দাসের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য সেবা। এই সম্বন্ধ মধুর হওয়ায় সেবা কার্য্যও মধুর হইবে। মধুর সেবা প্রাপ্তির মূল প্রয়োজন প্রেম।

বৈষ্ণবদিগের সাধ্য এবং সাধন এতদুভয় তত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যাহা সাধন তাহাই সাধ্য। প্রেম সাধন এবং সাধ্য উভয়ই। অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধ্য এবং সাধনের পার্থক্য আছে। অভীষ্ট বস্তু অর্থাৎ যাহা সাধ্য তাহা পাইতে হইলে সাধনের প্রয়োজন। কিন্তু সাধ্য বস্তু প্রাপ্ত হইলে সাধনের আর

প্রযোজন থাকে না। যেমন দালান তৈয়ারী করিবার সময় ভারা বা কাঠামোর (Scaffolding) দরকার হয় কিন্তু গৃহ নির্মিত হইলে যেমন তাহার আর দরকার থাকে না এবং ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় তদ্রূপ। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের পক্ষে ইহার বিপরীত। নামীকে অর্থাৎ সাধ্য বস্তুকে পাইতে হইলে নামাশ্রয়ী হইতে হয় অর্থাৎ নামরূপ সাধন অবলম্বন করিতে হয কিন্তু নামীকে পাইলে নাম তখন আরও তীব্র এবং সমুজ্জ্বল হইয়া নামীর মহিমা কীর্ত্তন করে। প্রেমাস্পদকে পাইতে হইলে প্রেমরূপ সাধনের প্রযোজন এবং প্রেমিককে লাভ করিলে প্রেম তখন আরও গাঢ়, উজ্জ্বল এবং সমৃদ্ধিপূর্ণ হইয়া উঠে।

প্রেম চিত্তের প্রসারতা বৃদ্ধি করে, উর্ধ্বগতি লইয়া আসে। বিস্ময় এবং আনন্দের অপূর্ব সম্মেলন ঘটায় এবং অপূর্ব চমৎকৃতির সৃজন করে। প্রেম যখন পূর্ণরূপে আত্মপ্রসার করে, তখন সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করিয়া ব্যাপকত্বের মহিমোজ্জ্বলতা লাভ করে এবং যেখানে নিখিল সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য রূপায়িত হইয়া আছে, সেই স্থানে গিয়া তাহার অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। অখণ্ড সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য প্রেমের লীলাভূমি। কমনীয়তা, স্নিগ্ধতা, সরলতা, অনাবিলতা এবং রসপ্রিয়তা প্রেমের উপাদান। বিভ্রমশীলতা প্রেমের পরিণতি। শৃঙ্গার রসের মধ্য দিয়া প্রেমের অপূর্ব বৈচিত্রী প্রকটিত হয়। তাই শৃঙ্গার রসকে পরমোন্নত এবং পরমোজ্জ্বল রস বলা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেহ শৃঙ্গার রসের পরমোজ্জ্বতা এবং নিষ্কামতা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে অপ্রাকৃত প্রেমরাজ্যে উন্নীত করিতে পারেন নাই। ইহা মন এবং বুদ্ধির অগোচর বলিয়া জগতে আদৃত হয় নাই এবং নিন্দনীয় হইয়া আছে।

প্রাকচৈতন্য যুগে লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শৃঙ্গার রসকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়াছেন, যথা—

"শৃঙ্গার রসসর্ব্বস্বং শিখিপিঞ্ছ বিভূষণ-
মঙ্গীকৃত্য নরাকার মাশ্রযে জগদীশ্বরম্॥"

শৃঙ্গার রসের দ্বারা যাঁহার স্বরূপ গঠিত এবং যিনি নরাকার অঙ্গীকার করিযা জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই ময়ূর পিচ্ছধারী জগদীশ্বরকে আশ্রয় করি। কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি সকলেই শৃঙ্গার রসসম্বন্ধি প্রেমার পূজারী বা উপাসক ছিলেন।

কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে শৃঙ্গার রসের মধ্যে যে পরমোৎকর্ষতা রহিয়াছে তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগৃহীত আচার্য্যগণ বিবিধভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহার

পবিত্রতা এবং বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া বিশুদ্ধ ভগবৎ ভজনের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। শৃঙ্গার রসের হেয় অর্থ কখন ভগবৎস্বরূপে প্রযুক্ত হইতে পারেনা। ইহা সুগভীর প্রেমসমুদ্র হইতে উত্থিত বরামৃত স্বরূপ চিদানন্দ বিলাস। ইহা নিষ্কাম এবং নিরাবিল। জড়ীয় পদার্থের সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই। তাই ইহা সর্বোন্নত এবং সর্বোজ্জ্বল।

প্রেম নিরুপাধিক। প্রেম কর্ম, যোগ এবং জ্ঞান ভারাক্রান্ত নহে। ইহা অন্য নিরপেক্ষ। প্রেম মসৃণ, প্রেম সম্পূর্ণরূপে চিত্তকে স্নিগ্ধ এবং দ্রবীভূত করে। ইষ্টে অশেষ মমত্ব বুদ্ধি আনয়ন করে এবং এবং বিজাতীয় বিষয়ে অনাসক্তি জন্মাইয়া দেয়। প্রেম সম্বন্ধে ভক্তি রসামৃত সিন্ধুগ্রন্থের পূর্ব বিভাগে প্রেমভক্তি লহরীর প্রথম শ্লোক ;—

"সম্যঙ্মসৃণিত স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিত:।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমানিগদ্যতে॥"

ভাব যখন সান্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয় তখনই তাহা প্রেমরূপে নিগদিত হয়। ভাব এবং প্রেম একই পদার্থ তবে ভাব প্রেমের প্রাথমিক অপুষ্ট অবস্থা, প্রেমের অঙ্কুর স্বরূপ। একটী অগাঢ় অপরটী প্রগাঢ। একটী শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ, অপরটী বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ। একটী নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় অল্প প্রকাশক, অপরটী জ্যোতির্ময় সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশক। প্রেমের অভ্যুত্থানে মমতার আধিক্য, মদীয়তার প্রাচুর্য্য এবং সেবাকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য নিবন্ধন ইহা চিত্তের মসৃণত্ব এবং আদ্রত্ব সম্পাদক। এস্থলে 'ভাবঃ সান্দ্রাত্মা' প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ এবং চিত্তের 'মসৃণিত' 'স্বান্তো' এবং 'মমত্বাতিশয়াঙ্কিত' প্রেমের তটস্থ লক্ষণ। এভাব প্রেমের অনুরাগের পর কক্ষায় যে ভাব তাহা নহে। এ ভাব প্রেম বিকাশের প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ রতির উদ্গাম, এবং অনুরাগের পর কক্ষার ভাব প্রেমের সমুচ্চ অবস্থা।

প্রেম অহেতুক, স্বাভাবিক এবং অকৈতব। অহেতুকতা এবং অকৈতবতা প্রেমের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। প্রেমের স্বভাব এই যে প্রেমাস্পদের গুণ শ্রবণে প্রেম উচ্ছলিত হয় না এবং নিন্দা শ্রবণেও খণ্ডিত হয় না। প্রেমাবির্ভাবের কোন হেতু নির্দেশ করা চলে না। সে কারণ প্রেম স্বাভাবিক। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার বাসনা প্রেমের গণ্ডীর বাহির্ভূত। প্রেমাস্পদের সম্যক প্রীতিবিধান করিবার বাসনা ব্যতীত অপর কোন বাসনা চিত্তে লুক্কায়িত থাকেনা। প্রেম চায় আপনাকে বিলাইয়া দিতে এবং তদ্বারা নিজেকে বিস্তৃত করিতে।

নিজের ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নাম কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছার নাম

প্রেম। কাম এবং প্রেমে সুদূর ব্যাবধান। লৌহ এবং স্বর্ণ যেমন স্বরূপ বিলক্ষণ কাম অন্ধ তমঃ—প্রেম উজ্জ্বল ভাস্কর।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার কাম এবংপ্রেমের স্বভাববৈপরীতা দেখাইয়া লিখিয়াছেন :—

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপবিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য—হয় প্রেম ত প্রবল॥
* * *
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম—প্রেম উজ্জ্বল ভাস্কর॥"

প্রেম ধৌত স্বচ্ছ বস্ত্রের ন্যায় কালিমা বিহীন এবং নির্মল জ্যোতির্ময়। প্রেম কোন বাধা নিয়মের দ্বারা প্রতিহত হয় না। অনুরাগের বশবর্তী হইয়া উদ্দাম গতিতে চলিতে থাকে। অহি যেমন পূর্বত্বক পরিহার করিয়া নূতন ত্বক গ্রহণ করে সেইরূপ প্রেম পূর্বসত্তা পরিত্যাগ করাইয়া নূতন সত্তা আনয়ন করে। প্রেমের আবির্ভাবে মানবজীবনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

প্রেম বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয়ী। প্রেমে যেমন অপরিসীম আনন্দ আছে, তেমনি অপরিসীম দুঃখও আছে। আনন্দের মধ্যেও দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যেও আনন্দ জড়িত। তাই একত্রে বিষামৃতের মিলন সদৃশ।

বিদগ্ধ মাধব নাটকে কৃষ্ণপ্রেমের বক্র অথচ মধুর বিক্রম সম্বন্ধে লিখিত আছে, যথা ;—

পীড়াভিনব কালকূট কটুতা—গর্বস্য নির্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুমধুরিমাহঙ্কার-সংকোচন
প্রেমাসুন্দরি! নন্দ নন্দন পরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্র মধুরা স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥"

পৌর্ণমাসীদেবী নান্দীমুখীকে বলিলেন—'সুন্দরি! শ্রীনন্দনন্দন বিষয়ক প্রেম যাঁহার অন্তরে জাগ্রত হয়, তিনি কেবল এই প্রেমের বক্র অথচ মধুর বিক্রম সকল হৃদয়ে সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারেন। এই প্রেমের যাতনার তীব্রতা এতই বেশী যে

ইহা নূতন সর্প শাবকের বিষের গর্বকে হার মানাইয়া দেয় এবং মাধুর্য্য এতই বেশী যে ইহা অমৃত মাধুর্য্যের গর্বকে সংকুচিত করে। বাহিরে বিষ জ্বালার ন্যায় কষ্টদায়ক হইলেও মনে অতিশয় আনন্দদায়ক বলিয়া মনে হয়। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ;

'এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্বন
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন"

(চঃ চঃ)

প্রেমে যেমন ঔদার্য্য আছে তেমনি সংকীর্ণতাও আছে। সম্প্রসারণ এবং সংকোচন উভয় গুণই যুগপৎ বিদ্যমান্। প্রেম চায় তার প্রিয়তমকে সংকীর্ণগণ্ডীর মধ্যে আনিযা আপনার করিয়া লইতে। প্রেম যুক্তি তর্ক করে না, বিচার বিতর্ক মানে না। কার্য্যকারণের অপেক্ষা রাখে না, দোষ গুণের বিচার করে না। প্রিয়তমের সাধারণ এবং সার্বজনীন ব্যবহারও ভাল লাগে না। প্রেম চায় প্রিয়তমকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে নিবিড় ভাবে আপনার করিয়া লইতে। সে কারণ প্রেম যেমন একদিকে স্বপ্রকাশ, অপর দিকে কুটিল, বক্র এবং অন্ধ। প্রেমের গতি সর্বদাই কুটিল। প্রেম সরল পথে চলেনা, অহির ন্যায় বক্রভাবে গমন করে।

"অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলো ভবেৎ।"

প্রেমে গৌরব বুদ্ধি নাই, সংকোচ নাই, এমনকি ভগবত্তার জ্ঞান পর্য্যন্ত অবলুপ্ত হইয়া যায়। থাকে কেবল অসীমকে সীমার মধ্যে আনিযা তাঁহার অকৃত্রিম সেবা বিধান করা। তাই প্রেমের নিকটভগবান অসীম হইয়াও সসীম, নিরাকার হইয়াও সাকার নিষ্ক্রিয় হইযাও ক্রীড়াশীল, নির্বিকার হইয়াও চঞ্চল এবং মদন বিকারগ্রস্ত। অখণ্ড জ্ঞানসত্তা বা অখণ্ড ঘন বিগ্রহ হইয়াও অবোধ এবং বিমুগ্ধ। শ্রুতি স্মৃতি যাঁহার স্বরূপ গাহিযাছেন·

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে।।'

যিনি এই প্রকারে পূর্ণ. যিনি পূর্ণ হতেও পূর্ণতম, যাঁহার নিকট হইতে পূর্ণতা কাড়িয়া লইলেও অখণ্ড পূর্ণত্বই অবশিষ্ট থাকে, সেই পূর্ণতম ভগবান হন অপূর্ণ। ইহা সংঘটিত হয় কেবল মাত্র প্রেমের দায়ে। **ইহাই বৈষ্ণবীয় প্রেমের বিজয় বৈজয়ন্তী।**

প্রেমের পথ যেমন সরল এবং মসৃণ, তেমনি আবার কণ্টকাকীর্ণ এবং দুঃখসঙ্কুল। প্রেম সংঘটনে আছে বহু বাধা এবং বহু আয়াস। কখন মিলন ঘটে, কখন ঘটে না। মনে হয় যেন দৈবের ঘটন। ইহা পরকীয়া প্রেম। পরকীয়া অর্থে সর্বশ্রেষ্ঠই বটে।

কান্তা প্রেম সর্বদাই এক নায়ক এবং এক নায়িকা বিষয়ক। কিন্তু রসবৈচিত্রীর পুষ্টি সাধন করিবার জন্য, নিজেদের আস্বাদন এবং অপর সকলকে আস্বাদন করাইবার জন্য বহু পরিকর এবং বহু নায়িকার প্রয়োজন হইয়া থাকে। নতুবা প্রেমের বিস্তার এবং আস্বাদন চমৎকারিতা থাকে না। তাই শ্রুতি বলিলেন, 'সত্রকাকী নারমত'। লীলা কখন একাকী হয় না। লীলার সহচর বা পরিকরের প্রয়োজন। লীলা করিবার জন্য তাঁহার স্বরূপ শক্তির পরিণতি অনন্ত পরিকরগণ অনাদি কাল হইতে বিরাজিত।

প্রেম যেমন একদিকে মূক এবং গম্ভীর করিয়া দেয়, অপর দিকে তেমনি বিভ্রমের সৃষ্টি করে। প্রেমের পরিপাকে বৈপরীত্য এবং ভ্রমময় চেষ্টার উদ্ভব হয়। ভ্রমময় চেষ্টা, প্রলাপ এবং জল্পময়ী বাণী প্রেমের বিকার বৈচিত্রী।

প্রেম যখন বিভাব এবং অনুভাবাদির সহিত সংপৃক্ত হয়, তখনই রস রূপে পরিণত হয়। তখনই ইহা আস্বাদ্য হইয়া উঠে। প্রেমে স্তম্ভ, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক, বৈবর্ণ্য স্বরভঙ্গ এবং প্রলয় বা মূর্চ্ছা এই অষ্টবিধ সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ পায়। প্রেম নির্লিপ্ত কিংবা নির্বিকার হইয়া থাকিতে পারে না। প্রেমিকের অন্তরে বাহিরে নানাবিধ বিকারের সৃষ্টি করে। এই সাত্ত্বিক বিকারগুলি প্রেমের তটস্থ লক্ষণ।

প্রেমের এই যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল, সেই প্রেম কোথায়, এই গ্রন্থে তাহারই অনুসন্ধান করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

প্রেমবিকাশের স্তর।

প্রেম যদিও জন্য পদার্থ বা সাধ্য বস্তু নহে, তথাপি সাধন ভক্তির প্রভাবে প্রেমোদয় হয়। প্রেমোদয়ের নয়টী ক্রম আছে। প্রেমোদয়ের ক্রম সম্বন্ধে ভক্তি রসামৃত সিন্ধু লিখিয়াছেন।

"আদৌ শ্রদ্ধাততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন ক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্তথা ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥"

প্রথমে শ্রদ্ধা বা শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস আপনা আপনি আসে না। প্রাথমিক সাধুমুখে শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা জন্মে। কিম্বা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রাথমিক শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। সে কারণ শাস্ত্রও সাধুসঙ্গ রূপে পরিগণিত। তৎপরে পুনরায় সাধুসঙ্গ অর্থাৎ দ্বিতীয়তঃ সাধুসঙ্গ অর্থাৎ সাধুগণের সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয; যদ্দারা ভজন রীতির শিক্ষালাভ হয়। ভজন পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করিবার পর ভজন ক্রিয়া বা ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান চলে। ভজনানুষ্ঠানের ফলে অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া যায়। অনর্থ নিবৃত্তি হইলে নিষ্ঠা অর্থাৎ ভজনে ঐকান্তিকী স্থিতি লাভ হয়। নিষ্ঠার পর রুচি অর্থাৎ ভজনে বুদ্ধি পূর্বক অভিলাষ জন্মে। রুচির পর আসক্তি অর্থাৎ স্বাভাবিক অভিলাষ আসে। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ স্বাভাবিক অভিলাষকে 'স্বারসিকী' আখ্যা দিয়াছেন। আসক্তির পর ভাব বা রতি জন্মে এবং এই রতি হইতে প্রেমের অভ্যুদয় হয়। সাধকদিগের প্রেমাবির্ভাবের এই নয়টী ক্রম আছে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার পয়ার ছন্দে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন,—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্তে হয় সর্বানর্থ নিবর্তন ॥

অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্তে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈলে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজায়॥
রুচি হৈতে ভক্তে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণ প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হইলে ধরে প্রেমনাম।
সেই প্রেমপ্রয়োজন—সর্বানন্দ ধাম॥"

প্রেমোদয়ের যেমন নয়টী ক্রম আছে, তেমনি প্রেমবিকাশেরও নয়টী ক্রম আছে। প্রেম নয়টী কক্ষসমন্বিত সুরম্য অট্টালিকা বিশেষ। রতি ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাব রূপ নয়টীবিশেষ বিশেষ কক্ষায় উন্নীত হয়। ইহা প্রেমের ক্রম বর্ধমান বিকাশ। যেমন ইক্ষুবীজ হইতে ইক্ষুদণ্ড তাহা হইতে রস, তাহা হইতে গুড় তৎপরে খণ্ডগুড় শর্করা, সিতা (সাদা চিনি) মিশ্রি এবং সর্বশেষে ওলা (উত্তম মিশ্রি) হয়, তদ্রূপ রতি হইতে প্রেম এবং প্রেম হইতে ক্রমান্বয়ে ভাব এবং ভাবের পরাকষ্ঠা মহাভাবের বিকাশ হয়। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। এস্থলে অতি সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

প্রেম যখন গাঢ় হইয়া চিত্তকে স্নিগ্ধ এবং দ্রবীভূত করে তখন স্নেহ নামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। তৎপরে স্নেহ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়া নূতন নূতন মাধুর্য্য অনুভব করিয়া ভাব গোপন করতঃ নিজে অদাক্ষিন্য কৌটিল্য এবং বাম্য ভাব ধারণ করে। সেইজন্য বলা হয় প্রেমের গতি কুটিল—অহির ন্যায়। কিন্তু ইহা প্রণয়ভঙ্গ জনিত নহে, ইহা প্রেম রস বিবর্ধনকারী এবং প্রেমের একটা অদ্ভুত বৈচিত্রী। এই ভাবকে মান বলা হয়। ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যে ভাববন্ধন শ্লথ কিম্বা ভগ্ন হয় না তাহাই প্রেম নামে অভিহিত এবং মান সেই প্রেমপ্রবাহের একটী বিচিত্র তরঙ্গ। মান নন্দন কাননের সদ্য প্রস্ফুটিত পারিজাত কুসুম। মান প্রিয়জনকে আরও সুন্দর করিয়া তুলে এবং প্রেমিকেরও তাহা পরম আস্বাদ্য হয়। সর্বস্বধন এবং সর্ববিস্মারণ রূপে প্রগাঢ় প্রেম না থাকিলে মানের কোন সার্থকতা থাকে না এবং তাহা তিরস্কার লাঞ্ছনা বা গঞ্জনায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু সুদৃঢ় প্রেমের উপর যে মান প্রতিষ্ঠিত তাহার পরিণাম হয় নায়কের প্রেমবশ্যতা, চাটূক্তি, অনুরোধ এবং মিনতি প্রার্থনা।

মান সহেতুক এবং অহেতুক উভয়ই হইতে পারে। কারণ বিদ্যমান থাকিলে মান যেমন উদিত হয় তেমনি বিনা কারণেও সময়ে সময়ে উদিত হইতে পারে। অতএব ইহা স্বভাবজ। উজ্জ্বল নীলমণি বলিয়াছেন ঃ

"অহেরিবগতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলাভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনো মান উদঞ্চতি ॥

মান সম্বন্ধে এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে কিঞ্চিদধিক বর্ণিত হইয়াছে।

মান পরবর্তী কক্ষায় উন্নীত হইয়া যখন প্রিয়জনের সহিত নিজের প্রাণ মন, বুদ্ধি, দেহ এবং পরিচ্ছদাদির অভেদ মিলন করাইয়া দেয় তখন তাহা প্রণয় রূপে অভিহিত হয়। ইহাতে সম্ভ্রম শূন্যতা এবং বিশ্রম্ভ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ প্রণয়কে মানের পূর্বে স্থান দেন কারণ প্রণয় না হইলে মানের সার্থকতা থাকে না। প্রণয়ের ভিত্তির উপর মান সুপ্রতিষ্ঠিত। উজ্জ্বল নীলমণি বলিয়াছেন, গায় বিশ্বাস ধারণ করিলে উক্ত মানই প্রণয়রূপে কথিত হয়। অন্যত্র এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

এই প্রণয় যখন প্রিয়তমকে লাভ করিবার জন্য অতিশয় দুঃখকেও চিত্তে অতিশয় আনন্দ বলিয়া বোধ করায়, তখন তাহা রাগ নামে অভিহিত হয়।

এই রাগ নিত্য নূতন হইয়া যখন নবনবায়মানত্ব আনয়ন করে এবং প্রিয় জনকে সর্বদাই নূতন নূতন রূপে অনুভব করায়, মনে হয় যেন এ সৌন্দর্য্য আর কখন বা কোনদিন সে দেখে নাই, কখন অনুভব করে নাই, এমনকি চক্ষুর নিমিষকেও দর্শনের ব্যাঘাত করার জন্য নিন্দা করিতে ইচ্ছা হয় এবং দর্শন করিয়াও যুগপরিমাণ কালকেও কল্প পরিমিত বলিয়া বোধ করায় তখন এই প্রকার রাগকে অনুরাগ বলে।

অনুরাগ যখন বন্যার জলের ন্যায় বর্ধিত হইয়া নদীর কূল পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দেয় এবং নিজের হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া সুদীপ্ত সাত্ত্বিকাদি বিকার দ্বারা প্রকাশমান হয়, যখন আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া স্বগৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখনই তাহা ভাব নামে কথিত হয়। এই ভাব বিবর্জন প্রিয়তমের অপ্রাপ্তিজনিত যে দুঃখ তাহা প্রাণ বিসর্জনের দুঃখ অপেক্ষাও অতিশয় গভীর এবং মর্মন্তুদ। অপর পক্ষে ভাব প্রিয়জনকে পাইবার আশায় অশেষ দুঃখকেও অশেষ সুখ বলিয়া প্রতীয়মান করায়। উজ্জ্বল নীলমণি বলিয়াছেন, 'অনুরাগ নিজের অনুভাবাবস্থা প্রাপ্তি করতঃ প্রকাশিত হইয়া যদি সজাতীয় সিদ্ধ সাধক ভক্তগণেও ব্যাপ্তি করায় অর্থাৎ যাহার অনুভবে তাঁহারাও অনুরাগে বিবশ হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাহাকে বলে ভাব।

ভাবের পরাকাষ্ঠা মহাভাব। মহাভাবে প্রেমের যত প্রকার বৈচিত্রী থাকিতে পারে, তৎসমুদয়ের যুগপৎ মিলন এবং মিলনবৈচিত্রীর যুগপৎ এককালীন আস্বাদন। এই স্তরে তন্ময়তা এত নিবিড় যে বিলাসের উৎকর্ষে পারস্পরিক আত্মবিস্মৃতি,

আস্বাদ্য এবং আস্বাদকের বিষয় বিস্মৃত হইয়া কেবল বিলাস আস্বাদনের চমৎকারিত্বে পর্য্যবসান। এবম্প্রকার ভাব দশাকে উজ্জ্বল নীলমণি স্বসম্বেদ্য দশা এবং যাবদাশ্রয় বৃত্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীরাধার প্রেমমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা আছে।

উজ্জ্বল নীলমণি যদিও ভাব এবং মহাভাবের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বা সীমানা নির্দেশ করেন নাই এবং বলিয়াছেন প্রেমের একই অবস্থার দুইটী নাম ভাব এবং মহাভাব, তথাপি মহাভাবের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

মহাভাব অপার্থিব অমৃতের স্বরূপ-শক্তি-বিশিষ্ট এবং ঐ বরামৃত স্বরূপের প্রতি নিজের মনকে আকৃষ্ট করে অর্থাৎ নিজের সহিত ঐক্য প্রাপ্তি করায়। কবিরাজ মহাশয় তাহাই একটু বিস্তার করিয়া সরলভাবে ভাব এবং মহাভাবের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরাকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥"

মহাভাব রূঢ় এবং অধিরূঢ় ভাবে দ্বিবিধ। স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব বিকার যে স্থলে উদ্দীপ্ত হয় এবং অতি কষ্টেও গোপন করা যায় না, তাহাকে 'রূঢ়' বলে এবং যে স্থলে অনুভাব সকল রূঢ় মহাভাবে ব্যক্ত অনুভাব সমূহ হইতেও কোন এক অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অধিরূঢ় মহাভাব বলে।

অধিরূঢ় মহাভাব দুই প্রকার—মোদন এবং মাদন। মোদন এবং মাদন উভয়ই সম্ভোগকে বুঝায়। যে অধিরূঢ় মহাভাবে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—উভয়ের দেহে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাব সমূহের উদ্দীপ্তির আতিশয্য প্রকাশ পায় তাহাকে মোদন বলে। মোদন শ্রীরাধার যূথবৃন্দের মধ্যেই কেবল পরিদৃষ্ট হয়। চন্দ্রাবলী আদিতে দৃষ্ট হয় না। বিরহ দশায় মোদন মোহন নামে খ্যাত। তখন বিরহ-জনিত বিবশতা হেতু সাত্ত্বিক ভাব সমূহ সুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। স্তম্ভ, স্বেদ কম্প প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব সমুদয় সুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাতেই প্রায় এই মোহন ভাব দৃষ্ট হয়।

রত্যাদি মহাভাব ভেদের উচ্চতম অবস্থা যাহা অধিরূঢ় নামে অভিহিত হইয়াছে, মোদনে সে সকল ভাবের প্রাকট্য হইলেও, তদপেক্ষা মাদন অধিকতর উৎকর্ষ বিশিষ্ট এবং অত্যুৎকৃষ্ট। ইহা হ্লাদিনী নামক মহাশক্তির স্থিরাংশ। ইহা সর্বভাবোদ্গমল্লাসী। ইহা কেবল মাত্র শ্রীরাধিকাতে নিত্য বিরাজমান। সে কারণ শ্রীরাধা মাদনাখ্য মহাভাববতী। ললিতা সখীবৃন্দের মধ্যেও এই মাদন উদিত হয় না। মাদন শব্দের

অর্থ এই যে ইহা আপ্তকাম, আত্মারাম, স্বরাট, পূর্ণতম তত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও তীব্র আস্বাদন বাসনা জাগাইয়া দিয়া অপরিসীম মত্ততার সৃষ্টি করে।

অধিরূঢ় মহাভাবের দুইটী দিক—একটী বিরহ, অপরটী মিলন। যদিও মিলনই কাম্য, তথাপি বিরহ ব্যতীত মিলনের সমৃদ্ধি মান সম্ভোগ সম্পন্ন হয় না। উজ্জ্বল নীলমণি বলিয়াছেন,—

"নবিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান রাগোবিবর্দ্ধতে॥"

যেমন কষায়িত বস্ত্রাদিতে পুনর্বার রঞ্জন দিলে উত্তরোত্তর প্রচুরতর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার বিপ্রলম্ভের দ্বারা সম্ভোগের প্রচুরতর উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয়। বিরহ মিলনকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে। মাদনাখ্য মহাভাব যাহা প্রেমের চূড়ান্ত অবস্থা তাহা বিরহ বেদনা ব্যতীত সম্যক—স্ফুট হয় না। বিরহের মধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগ, তীব্র লালসা এবং প্রবল উৎকণ্ঠা প্রভৃতি অসীম বেদনাময় ভাব সুষমা নিহিত এবং তন্মধ্য দিয়া অন্তরস্থ ভাব সম্পদ সুদ্দীপ্ত এবং উল্লসিত হয়। সে কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিরহকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। কিন্তু বিরহের মর্মন্তুদ জ্বালার মধ্যেও থাকে মিলনানন্দের অপূর্ব স্ফূর্তি এবং তাহাই বিরহকে সঞ্জীবিত এবং প্রাণবন্ত করিয়া রাখে। যাহা হউক যে যে ভগবৎ স্বরূপে অবাধ এবং নিত্য মিলন বিদ্যমান এবং বিরহের স্থান নাই, সেই সেই ভগবৎ স্বরূপকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবগণ সমাদর করেন নাই।

তাই ভগবান নিজের হ্লাদিনী শক্তি রূপা স্বকান্তা গণ পরকীয়া রসে উপরঞ্জিত হইয়াছেন এবং সেইগুলি দিয়া বৈষ্ণব সাধনার এক নূতন এবং অভিনব পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বৈষ্ণবীয় প্রেম সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, প্রেমের স্তরগুলির উল্লেখ করার প্রয়োজন; নতুবা বিষয়বস্তু পরিস্ফুট হয় না। সে কারণ সংক্ষেপে স্তরগুলির দিগ্দর্শন করা হইল। বিস্তারিত ভাব জানিতে হইলে শ্রীশ্রী উজ্জ্বল নীলমণির শরণাপন্ন হইতে হইবে।

যে প্রেম সর্বোন্নত, সর্বোজ্জ্বল এবং যে প্রেমের মকরন্দ পান করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লুব্ধ, সেই প্রেমের বসতি কোথায়, পূর্ণতম অভিব্যক্তি কোথায়, তাহাই এ গ্রন্থে বিভিন্ন প্রেমরাজ্যের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া 'নেতি, নেতি' এই নীতি মুখে তাহাদের আপেক্ষিক ন্যূনতা প্রদর্শন করিয়া যে প্রেম সাধ্য শিরোমণি, সেই ভূমা প্রেমের অনুসন্ধান করা হইয়াছে।

২

তৃতীয় তরঙ্গ।

জীবে জীবে প্রেম।

জীব জগতে প্রেম একমাত্র বন্ধন। প্রেম প্রকৃত পক্ষে সর্ব বিষয়ে ঐক্য বিধান করিতে পারে। প্রেম না থাকিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লয় প্রাপ্ত হইত। যদিও আমরা জগতের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, খাদ্য খাদক সম্বন্ধ এবং বাঁচিবার জন্য অহর্নিশি সংগ্রাম দেখিতে পাই এবং সেগুলিকে জাগতিক নিয়ম বলিয়া থাকি, তথাপি প্রেম এবং মৈত্রীর বন্ধন যদি জগতে না থাকিত, তাহা হইলে জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত।

ডারউইন্ সাহেব সংগ্রামের মধ্য দিয়া জীব জগতের ক্রম পরিণতি (Theory of evolution) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জীব জগতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অহর্নিশি সংগ্রাম, ধস্তাধস্তি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে (Struggle for existence)। এক জাতিকে পরাভূত করিয়া অন্যজাতি গড়িয়া উঠিতেছে, এবম্প্রকারে জগতের ক্রমবিকাশ সাধিত হইতেছে, এসত্য তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্তর্জগতে সত্ব, রজঃ, তম এই তিনটি গুণের মধ্যে যে সংগ্রাম বা দ্বন্দ্ব চলিতেছে যদ্দ্বারা সত্ত্ব ও তমো গুণকে পরাভূত করিয়া কখন রজোগুণ প্রাধান্য লাভ করিতেছে, কখন সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, আবার কখনও তমো এবং রজোগুণ এই উভয় গুণকে পরাভূত করিয়া সত্বগুণের বিস্তার এবং আধিপত্য লাভ হইতেছে এবং সত্বগুণের আধিপত্য হইলে অখণ্ড প্রাণ প্রবাহের মধ্যে যে সাত্বিক প্রকাশ এবং আনন্দের উদ্ভব হয় এ সত্য তিনি লক্ষ্য করেন নাই।

আমাদের শ্রীমদ্ভাগবত গীতা সুস্পষ্ট রূপে এবং সুললিত ছন্দে এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি হইতে জগৎ প্রসবিনী শক্তি লাভ করিয়া প্রকৃতি দেবী এই গুণত্রয়ের অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া জগতের সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করিতেছেন এবং অশেষ বস্তু বৈশিষ্ট্য সৃজন করিতেছেন। জগতে যাহা কিছু আছে, হইতেছে এবং হইবে তাহা গুণময়ী প্রকৃতি হইতে জাত। অতএব যেখানে প্রকৃতি, সেইখানেই তাঁহার এই তিনটিগুণ বর্ত্তমান। কিন্তু সর্ব পদার্থের মধ্যে এই তিনটি গুণ সমভাবে নাই। এই তিনটিগুণের কোন একটি গুণের আধিক্য ন

ন্যূনতা রহিয়াছে। এই আধিক্য বা ন্যূনতা নিবন্ধন বস্তু ভেদ সংঘটিত হইতেছে। যদি এই তিনটি গুণ সমভাবে সর্ব পদার্থে থাকিত তাহা হইলে বস্তু বৈষম্য থাকিত না।

সত্ত্ব গুণের ধর্ম প্রকাশ। প্রকাশের সহিত জ্ঞান এবং আনন্দ অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। রজোগুণের ধর্ম লোভ, আকাঙ্ক্ষা এবং অপরিসীম কর্ম প্রবৃত্তি। তমোগুণের ধর্ম অপ্রকাশ, জড়তা, শৈথিল্য এবং অজ্ঞানতা। এই গুণত্রয় যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন জগতের সৃষ্টি হয় না। এই বিরোধাত্মক তিনটি গুণ যখন বিক্ষোভিত হইয়া কার্য্যকরী হইয়া উঠে তখন জগতের সৃষ্টি-কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই তিনটী গুণের মধ্যে যদি অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বা বিরোধ না থাকিত তাহা হইলে প্রকৃতি দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া নানা প্রকার বৈচিত্র্যসৃজন করিতে পারিতেন না। এই তিন গুণের ঘাত-প্রতিঘাতে জগতের সৃষ্টি। ইহা গুনমায়া।

এই তিনটী গুণ যেমন বহির্জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া জগতের সৃষ্টি কার্য্য সমাধা করিতেছে, অন্তর্জগতের মধ্যেও তাহাদের প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। কখন তমোগুণের ধর্ম আলস্য মোহ এবং জড়তাকে পরাভূত করিয়া অপরিসীম কর্মপ্রেরণা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ প্রভৃতি রজোগুণাত্মক ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, কখন আবার তমো এবং রজোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণের প্রকাশ বা আনন্দ বর্ধিত হইতেছে। এই প্রকারে কখন তমোগুণ সত্ত্ব এবং রজোগুণকে পরাভূত করিতেছে, কখন রজোগুণ তমঃ এবং সত্ত্বগুণকে এবং কখন সত্ত্বগুন রজঃ ও তমোগুণকে পরাভূত করিয়া বিজয়ী হইয়া উঠিতেছে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি-ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥

(শ্রীমদ্ভাগবত গীতা।)

পরিশেষে গীতা এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া কি প্রকারে গুণাতীত বা মায়াতীত হইতে পারা যায় এবং গুণাতীতের লক্ষণ কি তাহার সন্ধান দিয়া ক্রম-বিকাশের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

যিনি গুণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন না, প্রকাশ আসুক, প্রবৃত্তি আসুক কিম্বা মোহ আসুক, যিনি তাহাতে বিদ্বিষ্ট হন না এবং সমভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, তিনি গুণাতীত। গুণগুলি নিজ-নিজ কার্য্য করিয়া যাইতেছে, কিন্তু তিনি উদাসীন এবং অবিচলিত, এই ভাব যাঁহার মধ্যে স্থিতি-লাভ করিয়াছে তিনি গুণাতীত। গুণাতীত ব্যক্তি সুখ দুঃখ, মান অপমান, প্রিয় এবং অপ্রিয়, শত্রু এবং মিত্র প্রভৃতি সকল বিষয়ে সমভাবাপন্ন হইয়া থাকেন এবং অনন্য ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের ভজনা

করিয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন। গীতা গুণাতীতের এবম্প্রকার পরিচয় দান করিয়াছেন।

কিন্তু গুণাতীত হইবার পরেও ক্রমবিকাশের আরও কিছু বাকী থাকে। ক্রমবিকাশের চরম অবস্থা **প্রেমের অভ্যুদয়।** ভজন প্রভাবে রজস্তমোময়ী বৃত্তি অর্থাৎ অবিদ্যা নিরাকৃত হইলে কেবলমাত্র সত্ত্ব অর্থাৎ বিদ্যা অবশিষ্ট থাকে। সত্ত্বগুণের নির্মলত্ব এবং প্রকাশত্বধর্ম বিদ্যমান থাকায় তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইতে পারে। তখন বিদ্যারূপী মায়িক সত্ত্বগুণও বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রভাবে নিরাকৃত হয় এবং সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রেম প্রতিফলিত হইয়া রসস্বরূপ ভগবানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করাইয়া দেয়। সেই সম্বন্ধানুযায়ী তাহার অকৃত্রিম সেবা বিধান করিবার জন্য জীবকে প্রণোদিত করে। প্রেমের অভ্যুদয় জীবের ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত পরিণতি। ডার উইন সাহেব জীব জগতে যে সংঘর্ষ দেখিয়াছিলেন তাহা আমাদের ঋষি পুরুষদিগের নিকট অবিদিত ছিলনা। কিন্তু তাহারা অন্য পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে যে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহা বিশেষ ভাবে দেখাইয়াছিলেন। অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া তাহারা পরম তত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। আরও একটু অগ্রসর হইলে বুঝিতে পারা যায় যে ত্রিগুণাতীত হইবার পর যখন প্রেমের আবির্ভাব হয় এবং ভগবানের সঙ্গে মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তখন জীব অন্তরে অপ্রাকৃত নির্মল আনন্দ লাভ করে। "রস হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।' এই প্রেম যখন বিজয়ী হইয়া উঠে তখন উহা ব্যাপকত্বের মহিমা লাভ করিয়া বহির্জগতেও প্রকাশিত হয় এবং নিষ্ঠুর সংগ্রামের হাত হইতে জগৎকে বাঁচাইয়া রাখে। জীব তখনই শিবে পরিণত হয়। জীব তখনই প্রকৃত পক্ষে অমৃতের সন্তান পদবাচ্য হয়। ইহাই আমাদের ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত অবস্থা। ইহার দ্বারা ভারতের সভ্যতা গঠিত। এই সভ্যতা জগতে পরিব্যাপ্ত হইলে, হিংসা বিদ্বেষ দরীভূত হয়, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্প্রীতি সম্ভবপর হয় এবং মৈত্রীবন্ধনে সমগ্র বিশ্ব আবদ্ধ হয়।

যাহা হউক যে প্রেম এ গ্রন্থের লক্ষ্য বস্তু তাহা ত্রিগুণাতীত, উন্নত, উজ্জ্বল, পর প্রেম বিষয়ক। শৃঙ্গার রসে ভাবিত হইয়া যে প্রেম উজ্জ্বল এবং উন্নত হইয়া উঠে, তাহাই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। কবি সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকারগণের শৃঙ্গার রসোচিত প্রেম একমাত্র বিষয় বস্তু। যিনি এই প্রেমকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া উন্নতস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তাঁহারই সৃজনী শক্তির ভূয়সী প্রশংসা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাকৃত জগতে প্রেম ক্ষণস্থায়ী এবং ভঙ্গুর। সেখানে প্রেমের অপূর্ব বৈচিত্রী নাই, মাদকতা নাই, নব নবায়-মানত্ব নাই এবং মুহুর্মুহু বর্ধনশীলতা নাই।

সে কারণ জীবে জীবে প্রেম আস্বাদ্য হইতে পারে না। সেখানে স্বার্থ মূলক প্রেম বিনিময় থাকায় প্রেম উজ্জ্বল নহে।

কখন কখন দেখা যায় যে কোন কোন নর নারী অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া জাতি ধর্ম উল্লঙ্ঘন করতঃ অবাধ মিলন লাভে প্রয়াস পান। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতুল বৈভব, অসীম প্রভুত্ব এবং বিশাল রাজত্ব তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন না। পূর্বরাগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুখকর হয় না। সামান্য একটু বিপরীত হাওয়ার সংস্পর্শে আসিয়া, তাঁহাদের রঙীন্ ফানুষ ছিঁড়িয়া পড়ে। এই প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

কিন্তু প্রেমের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে ধ্বংসের সহস্র কারণ সত্য সত্য উপস্থিত হইলেও যুবক-যুবতীর যে ভাব বন্ধন কখন বিনষ্ট হয় না তাহাই প্রেম নামে পরিকীর্ত্তিত। কিন্তু ইহজগতে এই প্রকার ভাব বন্ধন কখন দৃষ্ট হয় না।

নরনারীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাহার হাত হইতে কেহ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। মস্তক মুণ্ডন করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেও তাহার প্রতিক্রিয়া রুদ্ধ হয় না। ইহার অনন্ত কাহিনী আমরা পুরাণাদি হইতে অবগত আছি। তথাপি প্রাকৃত শৃঙ্গার রসের মধ্য দিয়াও উন্নত ভাবের অভিব্যক্তি যে কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাও নহে। তাহাতে মনে হয় যে অপ্রাকৃত প্রেম রাজ্যের সামান্য একটু আভাস পাইয়া বিশ্ব জগত অপরূপ রং-এ রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, যদিও তাহা প্রকৃতির গুণ রাগে রঞ্জিত।

কবি জয়দেব বলিয়াছেন যে অপ্রাকৃত নায়ক নায়িকার মুখ সৌন্দর্য্য হইতে পঞ্চশ্রীর আহরণ করিয়া পুষ্পধন্বা অমিতবিক্রমে বিশ্বজয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আলঙ্কারিক গণ বলেন যে নায়ক-নায়কের মধ্যে কিংবা নায়িকা-নায়িকার মধ্যে প্রেম সম্ভবপর হয় না। কেবল নায়ক নায়িকার মধ্যে প্রেম নিবদ্ধ। তাহার কারণ রসশাস্ত্রগণ শৃঙ্গার রসকে পরমোজ্জ্বল রস বলিয়াছেন। শৃঙ্গার রসের মধ্য দিয়া প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় এবং বিভিন্ন বিলাস বৈচিত্রী পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু জাগতিক প্রেম স্বসুখ প্রণোদিত এবং স্বার্থ-বিনিময় হওয়ায় পঙ্কিল হইয়া পড়ে এবং বিশুদ্ধ হয় না। সে কারণ জীবে জীবে প্রেম কখন উন্নত কক্ষায় আরোহণ করিতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেম ভগবানে অর্পিত না হয়, ততক্ষণ্ পর্য্যন্ত তাহা প্রেম নামে পরিগণিত হয় না। ভগবৎ প্রীতিই প্রেম পদ বাচ্য। জীবনিষ্ঠ ভালবাসা যখন ভগবৎ নিষ্ঠায় পরিণত হয়, তখনই তাহা প্রেম। কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি

চণ্ডীদাস, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি সাধকগণের জীবনী হইতে জানা যায় যে তাঁহারা নারীর প্রেমকে অবলম্বন করিয়া ভগবৎ-প্রেম রাজ্যে উন্নীত হইয়াছিলেন।

এস্থলে যে প্রেম মৃগ্য, যাহা সর্বোন্নত এবং সর্ব্বোজ্জ্বল এবং যাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র কালিমা নাই, বলা বাহুল্য সে প্রকার প্রেম মর্ত্তজগতে নরনারীর মধ্যে সম্ভব হইতে পারে না। তবে **সে প্রেম কোথায়?**

চতুর্থ তরঙ্গ।

জীবে ঈশ্বরে প্রেম।

জীব যখন ঈশ্বরের সহিত প্রেমে আবদ্ধ হয়, তখনই প্রেম পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। যিনি শুদ্ধ প্রেমময়, তাহার সহিত প্রেম করা যুক্তি সঙ্গত। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রতাপকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের উদ্দেশ্যে বলিলেন— যেখানে প্রেমে আবিলতা নাই, হ্রাস নাই, আছে কেবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, যেখানে প্রণয়ে কীট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রেম অনন্ত এবং প্রেমে অনন্ত সুখ, সেই স্থানেই প্রেমের সার্থকতা। তাই তিনি শৈবলিনীর মাধ্যমে জাগতিক প্রেমের ব্যর্থতা দেখাইয়া প্রতাপকে সেই উদ্ধতম প্রেম লোকে যাইবার নির্দেশ দিলেন।

কবি আক্ষেপের সুরে গাহিলেন :—

"পৃথিবীর কেউ ভালতো বাসে না
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানেনা ;
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা।"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে প্রেম মর্ত্ত লোকের বস্তু নহে। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে জীবে প্রেম থাকিতে পারে না। প্রেম থাকে ভগবানের স্বরূপ শক্তির মধ্যে। বহিরঙ্গা মায়া শক্তির পরিণতি জগতের কথা তো দূরে, তটস্থা শক্তি জীবের মধ্যেও নাই। অন্ততঃ যে প্রেম দ্বারা ভগবান বশীভূত হন এবং যে প্রেম তাঁহার আস্বাদ্য সেজাতীয় প্রেম জীবের মধ্যে নাই।

প্রেম জন্য পদার্থ নহে, সে কারণ চিত্তে উৎপন্ন হইতে পারে না। জীবের মধ্যে প্রেমের অভাব বশতঃ উদ্বুদ্ধও হইতে পারে না। সে কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'প্রেমদ' বলা হইয়াছে। তিনি তাঁহার লীলাস্থলী বৃন্দাবনের তৃণ, গুল্ম, লতা, বৃক্ষ, পশু পক্ষী প্রভৃতি সকলকে স্বীয় প্রেমে পরিসিক্তিত করিয়া এবং তৎপরে তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া উৎফুল্ল হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলাতেও আমরা তাহার পরিচয় পাই। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জীবকে কলসী কলসী প্রেম দান করিয়াছেন বলা হয়।

ইহা নিছক কবির উৎপ্রেক্ষা নহে। যে জিনিষ আমাদের নাই, সেই জিনিষের দান প্রকৃত দান রূপে গণ্য হয়। এবং যিনি তাহা দেন তিনিই প্রকৃত দাতা।

কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছেন,

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥"

সাধন ভক্তি প্রভাবে যখন সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হয় এবং অবিদ্যা অর্থাৎ রজস্তমোময় গুণ-নিরাকৃত হইয়া প্রাকৃত সত্ত্ব গুণ অর্থাৎ বিদ্যা কেবল মাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং সেই সত্ত্বগুণও যখন উত্তরোত্তর শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের প্রভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া চিত্তকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে, তখন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রেম শুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিফলিত হইয়া অশেষ বিশেষ বৈচিত্রী সৃজন করে। ভক্ত হৃদয়ে নিপতিত সেই প্রেম পুনরায় গ্রহণ করিবার জন্য ভগবান লালায়িত হন।

যেমন সূর্যের উত্তাপে সমুদ্রের জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পাকারে উর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং ক্রমে তাহা মেঘরূপে পরিণত হয় এবং সেই মেঘ বর্ষিত বারি জলধি পুনরায় গ্রহণ করিয়া রত্নালয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার কৃষ্ণ প্রেম ভক্ত হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়া শুদ্ধ সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় এবং প্রেমের অপূর্ব বৈচিত্রী সম্পাদন করে। সত্ত্ব গুণ মায়িক হইলেও তাহার স্নিগ্ধত্ব এবং প্রকাশত্ব ধর্ম থাকায় ভজন প্রভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্তির যোগ্যতা রাখে। ভাববিভাবাদির সহিত সংপৃক্ত হইয়া সেই প্রেম তখন রসে পরিণত হয়। তখনই ভক্ত হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত স্বকীয় প্রেমরসপান করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লুব্ধ হন এবং জীবও সেই প্রেম লাভ করিয়া ভগবানের অকৃত্রিম সেবা বিধান করিয়া আনন্দী হইয়া উঠে। ইহাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মত বিবেক।

গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সাধ্য সাধন তত্ত্বাদির আলোচনা হইয়াছিল, শ্রীকবিরাজ গোস্বামি মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্য লীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে ভূমিকা স্বরূপে লিখিয়াছেন ;—

"সঞ্চার্য্য রামাভিদ ভক্ত মেঘে
স্বভক্তি সিদ্ধান্ত চয়া মৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈ রমুনা বিতীর্ণৈ
স্তজ্জ্ঞত্ব রত্নালয়তাং প্রয়াতি॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ সমুদ্র ভক্ত রামানন্দরূপ মেঘে স্ব-বিষয়ক ভক্তি সিদ্ধান্তরূপ অমৃত

সঞ্চার করিয়া পুনরায় সেই রামানন্দ রূপ মেঘ কর্তৃক বর্ষিত সেইসেই সিদ্ধান্ত রূপ অমৃত দ্বারা সিদ্ধান্তের অনুভব রূপ রত্নসমূহের আলয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কথিত আছে যে স্বাতী নক্ষত্রের জল সমুদ্রে না পড়িলে সমুদ্রে শুক্তি এবং শঙ্খাদিতে রত্ন জন্মে না। বৃষ্টির জল পড়িলেই সমুদ্রে রত্নাদির উদ্ভব হয়। সমুদ্র সর্ব প্রথমে বাষ্পরূপে নিজের জল মেঘে সঞ্চারিত করে এবং সেই মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে স্বাতী নক্ষত্রের সেই জল সমুদ্রে পতিত হইলে তাহাতে রত্নাদি জন্মে এবং সেই সকল রত্ন ধারণ করিয়া সমুদ্র তখন রত্নাকর নামে পরিচিত হয়।

এস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সমুদ্রের সহিত ভক্ত রায় রামানন্দকে মেঘের সহিত, স্ববিষয়ক ভক্তি সিদ্ধান্তসমূহকে অমৃতরূপ বারির সহিত এবং রায় রামানন্দের মুখে ঐ সকল সিদ্ধান্ত শুনিয়া তাহাদের বিশেষ উপলব্ধিকে রত্নের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্ত রামানন্দের চিত্তে স্ববিষয়ক ভক্তি সিদ্ধান্ত সঞ্চারিত করিলেন এবং পরে তাঁহা হইতে অর্থাৎ রামানন্দ হইতে যখন সেই সকল অমৃত রূপ সিদ্ধান্ত নামিয়া আসিল তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু যেন সেই সেই সিদ্ধান্তের অনুভব রূপ রত্ন সমূহের আলয়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। "তজ্জন্য রত্নালয়তা" শব্দের ইহাই অর্থ।

অতএব ভগবৎ প্রেম যখন তাহা হইতে বিস্ফুরিত হইয়া ভক্ত হৃদয়ে পতিত হয়, তখন সেই প্রেমের অপরিসীম মাধুর্য্য দেখিয়া তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত ভগবানের লোভ জন্মে।

বলা বাহুল্য, এই প্রেমের মধ্যে যে আনন্দ নিহিত আছে এবং ভক্তগণ যাহা উপভোগ করেন, তাহা সত্ত্ব গুণজাত আনন্দ নহে। ইহা জ্ঞানমার্গের সাধকদিগের ব্রহ্মানুভব জনিত আনন্দ নহে, কিম্বা যোগীগণের আত্মা-পরমাত্মার মিলনজনিত আনন্দ নহে। এই আনন্দ ভগবানের স্বরূপ শক্তির বৃত্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া বিশুদ্ধ এবং চিন্ময়।

আনন্দ স্বরূপ ভগবানের সহিত জীবের অনাদিকাল হইতে নিত্য সম্বন্ধ। ভগবান এবং জীব উভয়েই নিত্য এবং অনাদি। জীব, ঈশ্বর এবং তাঁহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ জগতের সর্ব্বশাস্ত্রের মূলপ্রতিপাদ্য বিষয়। আমি এবং তুমি অর্থাৎ তৎ পদার্থের (ভগবৎ তত্ত্বের) জ্ঞান ত্বম্ পদার্থের (অর্থাৎ জীব স্বরূপের) জ্ঞান এবং উভয়ের সম্বন্ধজ্ঞান সর্বদর্শনের মূল গবেষণার বস্তু।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে ভগবান এবং জীবের মধ্যে নিত্য মধুর সম্বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু জীব তাহার স্বরূপের কথা ভুলিয়া গিয়া সাংসারিক সুখ দুঃখে

অভিভূত হয়। সাধু গুরুর কৃপায় সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফুরিত হইলে এবং সম্বন্ধানুযায়ী প্রেমের দ্বারা তাঁহার অকৃত্রিম সেবা বিধান করিলে, জীব আনন্দী হইয়া উঠে। আনন্দঘন বিগ্রহকে না পাইলে জীবের চিরন্তনী সুখ বাসনার চরম পরিতৃপ্তি লাভ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" রস স্বরূপ ভগবানকে পাইলে জীব শাশ্বত আনন্দ লাভ করে।

অপরপক্ষে ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি অর্থাৎ 'প্রেমলক্ষণাভক্তি' যখন তাঁহা হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া ভক্ত হৃদয়ে নামিয়া আসে এবং নূতন নূতন রসের সৃজন করে তখন ভগবানও সেই ভক্ত হৃদয়ের প্রেম রস আস্বাদন করিবার জন্য লোলুপ হন। অতএব উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে। কবিগুরু লিখিয়াছেন, "আমার মাঝে তোমার লীলা হবে, তাইতো আমি এসেছি এ ভবে।"

কিন্তু তাহা হইলেও জীব হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত প্রেমের জন্য তিনি যে সর্বদা লোলুপ তাহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ এ প্রেম সজাতীয় না হওয়ায় ভূমা হইতে পারে না। **জীব ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি নহে।** বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রহ্মের অনন্তশক্তি স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে তিনটি কোঠায় বিভক্ত করিয়াছেন,—

বিষ্ণুশক্তি পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥"

একটি শক্তি তাঁহার চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, পরা বা অন্তরঙ্গা শক্তি। দ্বিতীয়টি তাঁহার জীবশক্তি, তটস্থা বা ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি। তৃতীয়টি তাঁহার বহিরঙ্গা মায়া শক্তি। স্বরূপ শক্তির তিনটি বৃত্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী। এই তিনটি শক্তি 'সচ্চিদানন্দ' 'ঘন বিগ্রহ কৃষ্ণ স্বরূপের প্রকাশ বৈচিত্রী। ইহা নরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বরূপের সূচক। 'সৎ' অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম সন্ধিনী। সন্ধিনীর সার অংশের নাম শুদ্ধসত্ত্ব। এই শক্তি দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সত্তা রক্ষা করেন। তাঁহার ধাম, গৃহ, পিতা মাতা পরিবার প্রভৃতি সকলি তাঁহার 'সন্ধিনীর সারভূত শুদ্ধসত্ত্বের বিকার।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন নাই। অন্ততঃ ব্রহ্মের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহাও অস্বীকার করিয়া তিনি ব্রহ্মকে শূন্যত্বের পর্যায়ে ফেলিয়া দিয়াছেন, অপরপক্ষে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি এবং প্রত্যেক শক্তির অনন্ত বৈচিত্রী প্রদর্শন করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন।

'চিৎ' অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম 'সম্বিত'। এই শক্তির দ্বারা ভগবান নিজেকেও জানেন এবং অপরকেও জানান। শ্রী কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, 'কৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞান সম্বিতের সার। ব্রহ্ম জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥"। **ব্রহ্মজ্ঞান এবং অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপের জ্ঞান সকলি শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।**

সর্বোপরি আনন্দাংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম **'হ্লাদিনী'**। এই শক্তির দ্বারা ভগবান নিজে আনন্দ উপভোগ করেন এবং ভক্তগণকেও আনন্দ অনুভব করান। হ্লাদিনী শক্তি মূলশক্তি, সর্বশ্রেষ্ঠা শক্তি। যেমন শান্তাদি রতি চতুষ্টয়ের গুণ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া পরিশেষেমধুরে গিয়া প্রবেশ করে, সেই প্রকার সন্ধিনীর গুণ সংবিতে এবং সংবিতের গুণ হ্লাদিনীতে অবস্থিতি করে। এই তিনটি শক্তি অবিচ্ছেদ্যা, একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেকটি সম্বিৎশক্তির যোগে চিন্ময় এবং হ্লাদিনী শক্তি যোগে আনন্দোৎপাদিকা। এই শক্তিত্রয়ের নাম—চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা পরা শক্তি।

পূর্বে বলা হইয়াছে, হ্লাদিনী শক্তি মূল শক্তি। এই শক্তি প্রত্যেক শক্তির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরব্রহ্ম নরলীল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্ধন করে এবং ইহা বিক্ষিপ্ত হইয়া অপরকেও আনন্দ দান করে। ইহা মূল শক্তি হওয়ায় **বিশেষ্য পদ বাচ্য**। শ্রীজীব গোস্বামি পাদ লিখিয়াছেন, **"আনন্দমাত্রং বিশেষ্যম্। সমস্তাশক্তয়ঃ বিশেষণানি।"**

আনন্দমাত্র বিশেষ্যপদ, অপরাপর শক্তিবর্গ তাহার বিশেষণ। অতএব স্বরূপের আনন্দ, সন্ধিনী শক্তিযোগে সৎ, নিত্য এবং শাশ্বত। সম্বিৎ শক্তি যোগে চিদ্রূপ অর্থাৎ জড় বিরোধী। ইহাই হ্লাদিনী শক্তিরূপা মহাশক্তি। প্রেম হ্লাদিনী শক্তির পরিণতি। সে কারণ প্রেম জন্য পদার্থ নহে। হ্লাদিনী শক্তি চিদ্রূপা হওয়ায় সক্রিয়। সে কারণ ইহা পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে নানাবিধ লীলা করিবার জন্য প্রণোদিত করে। ইহার আলোচনা স্থানে স্থানে বিশেষতঃ দ্বিতীয় খণ্ডে কিঞ্চিদধিক করা হইয়াছে।

মায়া শক্তি তাঁহার স্বরূপের বহির্দেশে থাকে বলিয়া ইহা তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি। তাঁহার লীলাস্থলীর মধ্যে মায়ার প্রবেশাধিকার নাই। মায়া যেন লজ্জিতা হইয়া সে স্থলে যাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন। প্রাকৃত জগত তাঁহার বহিরঙ্গা মায়া শক্তির পরিণতি।

তৎপরে ব্রহ্মের ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি বা জীব শক্তি কি তাহার আলোচনা করা হইতেছে।

স্বরূপ শক্তিবিশিষ্ট পর ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ জীব নহে। অথচ মায়াশক্তি বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশও জীব নহে। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রুতিগণের শ্রীকৃষ্ণ স্তুতির অন্তর্গত ভাগবতের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "অংশকৃতমংশ মিত্যর্থঃ অখিল শক্তিধৃতঃ সর্ব্বশক্তিধরস্যেতি বিশেষণং **জীব শক্তি বিশিষ্টস্যৈব তব জীবোঽংশ নতুশুদ্ধস্যেতি।**" ইহার তাৎপর্য্য হইল এই যে জীব শক্তি বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব বা জীবাত্মা। শুদ্ধশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তি বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ জীব নহে। সমূদ্রের তটকে যেমন সমুদ্র বলা যায় না অথচ উপরিস্থিত ভূখণ্ড বলাও চলে না, তদ্রূপ জীব ব্রহ্মও নহে মায়াও নহে। এই দুই এর মধ্যভাগে অবস্থিত। সমুদ্রের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ যেমন তটের অর্থাগম হয়, সেই প্রকার শ্রীভগবানের সহিত জীবের প্রীতি সম্বন্ধ বশতঃ জীবের জীবত্ব সিদ্ধ হয়। ভগবানের সহিত জীবের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকা সত্বেও জীব তাহার দুরদৃষ্ট বশতঃ মায়িক ভোগৈশ্বর্যে আকৃষ্ট হইয়া মায়াকে অঙ্গীকার করে। স্বরূপের বিস্মৃতি নিবন্ধন দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করে এবং মায়িক ভোগবিলাসে রত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে।

মায়ার সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা যে সুখ ভোগ করে তাহা 'হ্লাদ তাপকরী মিশ্রা' অর্থাৎ সে সুখ প্রকৃতি গুণজাত বলিয়া দুঃখের সহিত মিশ্রিত থাকে এবং পরিণামে দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়. ইহা হইল আত্ম বিস্মৃত বদ্ধ জীবের দশা।

যদিও ভগবান এককূলে এবং জীব আর এক কূলে অবস্থিত এবং তন্মধ্যে এক ভীষণ তরঙ্গসংকুলা বিরজা নাম্নী নদী প্রবাহমানা, তথাপি তিনি জীবের দুঃখে করুণা পরবশ হইয়া মধুর মুরলীরবে জীবকে আহ্বান করেন। যথা কবির ভাষায় "ওগো তোরা কে যাবি পারে। আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে॥" কিন্তু তাঁহার মধুর আহ্বান বিষয়াসক্ত জীবের কর্ণে আসিয়া পৌছায় না, কিম্বা কোনসময়ে যদি বা পৌছায়, তথাপি জীব তাহাতে সাড়া দেয়না। বিষয়াসক্তি নিবন্ধন তাহাদের হৃদয় দুয়ার রুদ্ধ থাকে বলিয়া তিনি আসিয়াও ফিরিয়া যান।

কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর জীব আছেন যাঁহারা নিত্য ভগবদুন্মুখ। তাঁহারা তাঁহার ডাক শুনিতে পান এবং সাড়াও দেন। তাঁহারা স্বরূপ শক্তি বিলাসের দ্বারা অনুগৃহীত অতএব মায়ার কবল হইতে মুক্ত। তাঁহাদের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে হ্লাদিনীর সার প্রেম নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহারা প্রেমানন্দে বিভোর হন, এবং ভগবদ্ পার্ষদত্ব লাভ করিয়া নিরন্তর ভগবৎ সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিত্য মুক্ত শুদ্ধ জীব। তাঁহাদিগকে লীলায় সেবা দিয়া এবং লীলায় তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন।

কিন্তু লীলারস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র তাঁহার স্বরূপ শক্তির উপর নির্ভর করেন। ইহাই তাঁহার স্বরূপশক্ত্যানন্দ। জীবশক্তির উপর তিনি নির্ভর করেন না।

জীব ব্রহ্মের বিভিন্নাংশ, অতিক্ষুদ্র। একটি কেশের অগ্রভাগকে শতধা বিভক্ত করিয়া তাহার একটি অংশকেও পুনরায় শতধা বিভক্ত করিলে যাহা হয় সেই প্রকার ক্ষুদ্রতম অংশ জীব। চিদংশে ব্রহ্ম এবং জীব অভিন্ন হইলেও পরিমাণ গত পার্থক্য রহিয়াছে। জীব অণুচৈতন্য, ব্রহ্মবিভুচৈতন্য, জীব স্বল্পজ্ঞ, ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, জীব নিয়ম্য ব্রহ্ম নিয়ামক, জীব সৃষ্ট, ব্রহ্ম স্রষ্টা। অতএব জীব বিভু প্রেমের যোগ্য আধার হইতে পারেনা। অগ্নি হইতে যে প্রকার স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হয়, তদ্রূপ বিভু প্রেমের কতিপয় স্ফুলিঙ্গ শুদ্ধ মুক্ত জীব স্বরূপে বিচ্ছুরিত হয়। যেমন লৌহ অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া অগ্নির ধর্ম কিঞ্চিৎ মাত্র প্রকাশ করিতে পারে, সম্যকরূপে পারে না, জীব হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত প্রেম সেই প্রকার। উপরন্তু ভগবৎ প্রেম যখন তাঁহা হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া বাহিরে নামিয়া আসে, তখন তাহার অপরিসীম শক্তি এবং গুরুভার স্বয়ং ভগবানও বহন করিতে পারেন না। জীবের সম্বন্ধে আর কী কথা? তাই কবিগুরু যথার্থই বলিয়াছেন, "তোমার প্রেম যে বহিতে পারি এমন্ সাধ্য নাই।"

তাহা হইলে সে প্রেম কোথায়—যে প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও নিজের ভগবত্তা ভুলিয়া গিয়া কেবল সেই প্রেমরসে মাতোয়ারা হন এবং নিয়ন্তর কুঞ্জ ক্রীড়ার অভিলাষ করেন?

পঞ্চম তরঙ্গ।

ভগবন্মহিমা সূচক প্রেম

শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমা সর্বত্র কীর্ত্তিত। সমগ্র গীতা শাস্ত্রের মধ্যে বিশেষতঃ নবম অধ্যায় হইতে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভগবানের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তিনি সর্বগ, অনন্তবিভু, সর্ব শক্তিমান, সর্কাশ্রয় এবং সর্বযোনি। জ্যোতিষ্কের মধ্যে তিনি সূর্য্য, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং প্রাণীগণের মধ্যে চেতনা ইত্যাদি। তিনি জগতের পিতা, মাতা, ধাতা পিতামহ। তিনিই জ্ঞাতব্য বিষয়, সাক্ষী, আশ্রয়, উৎপত্তি, লয় এবং অব্যয় বীজ। জগতের সৃষ্টি বৈচিত্রীর মূলে তিনিই কেবল বিদ্যমান।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতা আরও বলিলেন,

> "যদাদিত্য গতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
> যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌতত্তেজোবিদ্ধিমামকম্।
> গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারযাম্যহমোজসা
> পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাসোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।।"

শ্রীভগবান বলিলেন, সূর্য্যের যে তেজ সমগ্র জগতকে প্রকাশিত করে এবং যে তেজ চন্দ্র এবং অগ্নিতে আছে সে তেজ আমারি জানিও। আমারই শক্তি পৃথিবীতে প্রবেশ করাইয়া আমি প্রাণীগণকে ধারণ করিয়া থাকি এবং রসোৎপাদনকারী চন্দ্ররূপে সকল বনস্পতি-পোষণ করিয়া থাকি।

ভগবানের অশেষ বিধ মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া গীতা উপসংহারে বলিলেন,

> "অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেনতবার্জ্জুন!
> বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেনস্থিতো জগৎ।"

অথবা হে অর্জ্জুন বিস্তার পূর্বক আমার অনন্ত মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া তোমার আর কি হইবে? এক কথায় ইহা জানিয়া রাখ আমার কেবলমাত্র এক অংশদ্বারা আমি সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া আছি।

সাধারণ ভাবে বুঝিতে গেলে যদি আমরা অগণিত নক্ষত্র মণ্ডিত নভোমণ্ডলের দিকে কিম্বা বিশাল জলধির দিকে কিম্বা উত্তুঙ্গ পর্বত শ্রেণীর দিকে স্থির নয়নে

নিরীক্ষণ করি, তাহা হইলে তাঁহার বিরাটত্বের অসীমত্বের এবং আনন্ত্যের সামান্য অনুভূতি লাভ করিতে পারি। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনন্ত মহিমার বিষয় চিন্তা করিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাই। যদি কেহ পরমাণুর গণনা করিতে পারেন, আকাশের হিমকন এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর কিরণ কন নির্ণয় করিতে পারেন, তথাপি ভগবানের মহিমার কেহই অন্ত পান না।

তাঁহার মহিমার স্তুতিজ্ঞান সর্ববিশ্বে রণিত। যাঁহাদের যথার্থ কর্ণ আছে, তাঁহারই কেবল বিশ্বের মধুর সংগীত শ্রবণ করিতে পারেন। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি দেবী হইতে আরম্ভ করিয়া দেব, মানব সকলেই তাঁহার বন্দনা গান করিতেছেন।

বিশ্বকবি গাহিলেন,

(তাঁরে) আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেব মানব বন্দে চরণ
নিখিল সেই বিশ্ব শরণ
তাঁর জগত মন্দিরে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি;
কতই বরণ কতই গন্ধ
কত গীত কত ছন্দরে।।"

শ্রীজীব গোস্বামি পাদ তাঁহার ভাগবৎসন্দর্ভে লিখিলেন,

"প্রকৃত্যা গুণরূপিণ্যারূপিণ্যা পর্যুপাসতে।"

প্রকৃতি দেবী অপরূপ সাজে সজ্জিতা হইয়া তাঁহার নিরন্তর উপাসনা করিতেছেন। তাঁহার রচিত বিশ্ব তাঁহার মহিমা গানে সতত মুখর। তিনি রূপে, রসে, গন্ধে গানে সমগ্র বিশ্বে বিলসিত হইয়া বিরাজমান। প্রকৃতি দেবী মূর্তিমতী হইয়া নৈবেদ্যের ডালি সাজাইয়া বিশ্ব সুন্দরের চরণে অর্ঘ প্রদান করিতেছেন।

ব্রহ্মা, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ দিব্য স্তবের দ্বারা তাঁহার গুণগান করিতেছেন। সামবেদীরা অঙ্গ, পদ, ক্রম উপনিষদের সহিত তাঁহার স্বরূপ গান করিতেছেন। যোগীরা ধ্যানাবস্থায় তদ্গতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত পান না সেই দেবকে প্রণাম করি।

"যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্রো রুদ্র মরুতস্তবন্তি দিব্যৈস্তবৈ
বেদৈ সাঙ্গ পদ ক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তংনবিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈনমঃ॥"

ব্রহ্ম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—যাঁহার প্রভার প্রভা হইতে কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে. এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তবর্ত্তি কোটী পৃথিবীও ভিন্ন ভিন্নভাবে বস্তু কোটীর সহিত অবস্থিতি করিতেছে, সেই অশেষ জীবের অন্তরাত্মা, অপরিসীম, নিষ্কল. আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি
ষ৲শেষ-বসুধাদি বিভূতি ভিন্নং।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমশেষ ভূতম্
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥"

স্বরাট ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সব্ব বেদের প্রতি পাদ্য বস্তু। তিনি অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব—সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদ শূন্য পরম পুরুষার্থ বস্তু। তিনি সর্বকারণের কারণ। অবতারের অবতারী। তিনি মূলতঃ সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কর্তা। তিনি দণ্ড দাতা এবং অভয় দাতা। তিনি রুদ্র এবং মঙ্গলময়। তিনি আপ, জ্যোতিঃ, রস, অমৃত। তিনি সত্যস্বরূপ এবং সর্ব শক্তির অধীশ্বর। তিনি সৎ এবং অসৎ এতদুভয়ের অতীততম বস্তু। তাহার সমান এবং উর্দ্ধে কেহ নাই। তিনি পুরুষোত্তম অর্থাৎ সর্বগুণ মণ্ডিত পরিপূর্ণ সত্তা।

তাহার গুণাবলী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক ভীষণ, অপরটি মধুর। তিনি জগতের স্রষ্টা এবং নিয়ামক। তাহার কঠোর শাসনে বিশ্বের প্রতিটি কার্য্য সুসমঞ্জস এবং সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হইতেছে। তজ্জন্য শ্রুতি তাহাকে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" বলিয়াছেন। (কঠোপনিষদ) উদ্যত বজ্রের ন্যায় অতি ভীষণ ব্রহ্মের ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে, সূর্য্য আলোক দিতেছে, মেঘবারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। (বৃহদারণ্যকউপনিষদ্)। তাঁহার কঠোর শাসনে ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ ভয়ে কম্পিত. ভয় স্বয়ং তাহা হইতে ভীত হইয়া পলায়ণ করে। "ভয়ং ভয়ানাম্।" একদিকে তিনি ঈদৃশ ভীষণ অপর দিকে তিনি কোমল গুণাবলীরও আকর। তিনি পরম করুণাময়, ত্রাতা ভক্ত বৎসল এবং মুক্তি দাতা। তিনি আনন্দ-নিলয় এবং নিখিল সৌন্দর্য্যের আকর।

তাঁহার অশেষ গুণের মধ্যে আমাদের নিকট তাহার কারুণ্য এবং দাতৃত্বগুণের সমাদর অধিক। তিনি ন্যায়দণ্ড ধরিয়া রাজাধীশ রূপে বিচার করিলেও এবং নিখিল ক্ষমতা এবং বিভূতির অধিকারী হইলেও যদি তিনি কারুণ্য গুণ রহিত হইতেন, তাহা হইলে আমরা তাহাকে ভগবান রূপে বরণ করিয়া লইতে পরিতাম না। কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় চারিটি বিশেষণের দ্বারা তাঁহার দাতৃত্বের এবং কারুণ্যের স্বরূপ বর্ণনা

করিয়াছেন। তিনি ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ এবং বদান্য। এই চারিটি গুণ দাতৃত্বের এবং কারুণ্যের পরিচায়ক। তিনি অন্তর্যামীরূপে আমাদের চিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের বাসনা জানিতে পারেন তাই তিনি কৃতজ্ঞ। সেই সকল বাসনা পূর্ণ করিবার অবাধ শক্তিও তাঁহার আছে তাই তিনি সমর্থ। কর্ত্তুমকর্ত্তুং যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ। তিনি করিতে পারেন না এমন কিছু নাই। যাহা ইচ্ছা তাহাই অবাধে করিতে পারেন। তথাপি তিনি ভক্ত বৎসল, বদান্য এবং দাতাশিরোমণি। তাই তিনি ভক্তের মনোরথ পূরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট অন্তরের সহিত যাহা চাওয়া যায় তাহাই তিনি দান করিয়া থাকেন।

কিন্তু এই প্রকারে তাঁহাকে কেবলমাত্র মহামহিমান্বিত, ষড়ৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ এবং দাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা রূপে ভজন করিলে নিষ্কাম ভজন হয় না। তদ্দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে কিছু প্রাপ্তির আশা থাকিয়া যায়। কারণ তিনি অতি বদান্য, দয়ালু এবং সমর্থ। আমাদের বাসনা সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিয়া দিতে পারেন। তৎপরে যখন আমাদের প্রার্থিত বস্তু লাভ হয় তখন তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ প্রায় লোপ পাইয়া যায়। অর্থাৎ তাঁহার সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে সে জ্ঞান তিরোহিত হয়। কিন্তু প্রেমের সাধনা তাহা নহে। প্রেম তাঁহাকে একেবারে নিজের করিয়া লইতে চায়। যেখানে তাঁহাকে নিজের করিয়া লইবার ইচ্ছা থাকে সেখানে আবার নিজের জন্য চাওয়ারই বা অবকাশ কোথায়? প্রেম সর্ব প্রকার মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া সর্ব প্রকার বিভেদ ভুলাইয়া দেয়। প্রেম তাহার প্রিয়জনকে সবপ্রকারে সুখী করিবার ইচ্ছা পোষণ করে এবং নিজের সুখকে আহুতি দিয়া সদর্পে প্রেমিকের পূজারী হয়।

অতএব দেখা যায় যে মহিমার এবং ঐশ্বর্য্যের দিক দিয়া কেবলমাত্র ভগবানকে দেখিলে ঠিক ঠিক প্রেমের দ্বারা তাহার পূজা হয় না। প্রেম সেখানে সন্ত্রস্ত এবং সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। তাঁহার অশেষ গুণাবলী এবং মহিমা অবগত হইয়া আত্মহারা হইয়া স্বতঃই তাহার চরণে ভক্তি বিনম্র হৃদয়ে মস্তক অবনত করা যায় সত্য কিন্তু তাঁহার অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অভিভূত হইয়া চিত্ত ত্রস্ত এবং সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং সরল প্রেমের দ্বারা অবাধে তাঁহার প্রীতি বিধান করা যায় না। সমগ্র ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর যিনি তাহাকে আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া কি প্রকারে তুষ্ট করিব? তাই কোন এক ভক্ত ভগবানের ঐশ্বর্য্যে অভিভূত হইয়া বলিলেন,—

"কিমাসনন্তে গরুড়াসনায় কিংভূষণং কৌস্তভ ভূষণায়
লক্ষ্মী কলত্রায়কিং দেয়মস্তি বাগীশ কিং তে বচনীয়মস্তি ॥"

(বৃহদ্ভাগবতামৃতম্।)

গরুড় যাঁহার আসন তাঁহাকে আমরা আবার কি আসন দিব? কৌস্তভমণি যাহার আভরণ তাঁহাকে কি অলঙ্কার দিয়া সাজাইব? লক্ষ্মী দেবী যাঁহার বক্ষাসীনা তাঁহাকে আমরা কি সম্পদ দিব? যিনি বাগীশ্বর তাঁহাকে কোন্ বাক্যের দ্বারা স্তুতি করিব?

অতএব যেখানে বিরাট ব্যবধান, সেখানে প্রেমের বিকাশ কিরূপে সম্ভবে? সেখানে প্রেমশিথিল. চঞ্চল এবং অস্থায়ী এবং ভগবত্ত্বার উত্তাপে প্রেম পরিশুষ্ক হয়। তাহাতে সংকোচ, কুণ্ঠা এবং ভয় বিজড়িত থাকায় প্রেম উজ্জ্বল এবং মহীয়ান হইতে পারে না।

চৈতন্য চরিতামৃতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥ (১।৩।১৪)

তাহা হইলে সংকোচ হীন, সর্বপ্রকার বাধা হীন, নিরাবিল প্রেমের উৎস কোথায়?

ষষ্ঠ তরঙ্গ

মর্য্যাদাজড়িত প্রেম

মূল অবতারী শ্রীকৃষ্ণ যখন যে যে ভগবৎ স্বরূপে লীলা করিতে থাকেন, তাঁহার অনপায়িনী শক্তি ও সেই সেই ভাবের আনুকূল্যবিধান করেন।

অযোধ্যা লীলায় দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীরামচন্দ্র যখন পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য বনগমন করিলেন, তখন অযোধ্যা নগরীর সমগ্র জনবাসী তাঁহাব বিরহে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। সমস্ত শহর শোকে মুহ্যমান হইল। তরুলতা পশুপক্ষী পর্য্যন্ত 'হা রাম, হা রাম'! বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাজা দশরথ পুত্রশোকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। সত্যসংকল্প শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় দৈত্য নিধন করিয়া প্রাণপ্রিয়া সীতাদেবীকে উদ্ধার করিলেন, এবং চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস করিবার পর অযোধ্যা নগরীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন মৃতপুরী সঞ্জীবিত হইল। সমগ্র জনপদ পুনরায় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তরু মুঞ্জরিত হইল, শুষ্ক নদ নদী জলে ভরিয়া উঠিল। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

জনরঞ্জন রামচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া রাজকীয় মর্য্যাদায় সমাসীন হইলেন। রাজকীয় মর্য্যাদার কোন অংশে ত্রুটি নাই। কর্ত্তব্যের অবহেলা নাই। প্রজাগণের সুখবিধান করাই তাঁহার জীবনের মহাব্রত। এ লীলায় ভগবান **মর্য্যাদাপুরুষোত্তম।** দৈত্যকুল নিধন করিয়া ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রজাগণের প্রীতি সম্পাদন তাঁহার একমাত্র ব্রত। কোনও স্থলে রাজকীয় ন্যায়ের এবং মর্য্যাদার বিচ্যুতি ঘটে নাই। এমন কি একটি নীচজাতীয় কোন এক প্রজার মিথ্যা এবং নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া অহেতুক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া জনগণের সন্তুষ্টির জন্য মর্য্যাদা পুরুষোত্তম রাম তাঁহার সতীসাধ্বী পতিব্রতা প্রাণপ্রিয়া সীতাদেবীকে বনবাস দিলেন।

জনরঞ্জন করাও কি সহজ কাজ? তাহাতেই বা তাঁহার শান্তি কোথায়? পুনরায় বনবাস হইতে সীতাদেবীকে আনয়ন করিয়াও গ্রহণ করিতে পারিলেন না। পুনরায় প্রজাগণের প্রীত্যর্থে অগ্নি পরীক্ষা হইল। রাজকীয় মর্য্যাদার কঠোর আঘাতে পরিশেষে সীতাদেবীকে পাতালে প্রবেশ করিতে হইল। এইরূপে অযোধ্যালীলায় দেখিতে পাওয়া যায় যে রাজকীয় মর্য্যাদার যূপকাষ্ঠে কান্তাপ্রেমের আত্ম-বলিদান।

তাহা হইলে ভগবানের এ লীলাতেও যদি আমরা মধুর ভাবোচিত প্রেম না পাই তাহা হইলে সে প্রেম কোথায়?

সপ্তম তরঙ্গ

সাধারণী রতিজাত প্রেম

উজ্জ্বল নীলমণি সাধারণী রতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"নাতি সান্দ্রাহরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাৎ দর্শন সম্ভবা।
সম্ভোগেচ্ছা নিদানেহয়ং রতিঃ সাধারণী মতা।।"

(স্থায়ীভাব প্রঃ ৪৫)

যে রতি সান্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয় না এবং যাহা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দর্শন হইতে সমুদ্ভূত এবং যাহার মূলে নিজের সম্ভোগেচ্ছা বলবতী থাকে, সেই রতিকে সাধারণী রতি বলা হয়। রতি শব্দের অর্থ কৃষ্ণ সুখ বাঞ্ছা, ইহার দ্বারা স্বসুখ বাসনা বুঝায় না। আত্মসুখ বাঞ্ছা কামের নামান্তর। তাহা হইলে বৈষ্ণবেরা ইহাকে রতি বলিলেন কেন? তাহার উত্তর এই যে যদিও সাধারণী রতির মধ্যে নিজেরই সুখ বাসনা প্রাধান্য লাভ করে, তথাপি তাহার মধ্য দিয়া সময়ে সময়ে কৃষ্ণপ্রীতি বাঞ্ছাও জাগরূক হইয়া উঠে এবং কৃষ্ণকে সামান্য একটু ভালবাসিবার ইচ্ছা আছে বলিয়া ইহাকে রতি বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুব্জার প্রেমকে সাধারণী রতি বলে। কুব্জা যখন শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের অসামান্য রূপমাধুর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং মনে করিলেন যদি তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবন যৌবন সফল হয়। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার এই যে ভালবাসা, তাহার মূলে একমাত্র সম্ভোগেচ্ছা। সুতরাং এই ভালবাসা কামের পর্য্যায়ে পড়ে। তবে কখন কখন একথাও তাঁহার মনে উদিত হয় যে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া নয়নানন্দ দান করেন, তখন তিনিই বা কেন ক্ষণকাল তাঁহার অঙ্গদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী না করিবেন। এই যে কৃষ্ণকে প্রীত করিবার জন্য ক্ষণিক বাসনা, এই সামান্য বাসনার উদয় হওয়া নিবন্ধন ইহাকে রতি পর্য্যায়ে আনা হইয়াছে। কিন্তু এই রতি স্বসুখ বাসনার সহিত জড়িত। স্বসুখ বাসনা প্রবল হইলে এ রতি প্রবল হয়, স্বসুখ বাসনা প্রশমিত হইলে এ-রতি অন্তর্হিত হয়। অতএব ইহা অতিশয় চঞ্চল, অস্থায়ী এবং ভঙ্গুর। সে কারণ কখন

সান্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয় না। এ-রতি নিজসম্ভোগেচ্ছা দ্বারা সম্যকরূপে ভেদ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বিরংস প্রধান রতি বলা হয়। বলা বাহুল্য, এ রতির দ্বারা কৃষ্ণকে প্রীত করা যায় না।

অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে এই সাধারণী রতির নীতি অনুসৃত হইয়াছে। যে সকল শাস্ত্র ভগবানকে সবিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং আনন্দ স্বরূপ বা আনন্দঘনবিগ্রহ বলিয়াছেন, তাঁহারা কেবল কি করিয়া সেই ভগবানের নিকট হইতে আনন্দ লাভ করা যায়, তাহার বিভিন্ন উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কি করিয়া তাঁহাকে প্রীত করা যায় সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

বৈষ্ণবগণের মতে ভগবানের নিকট হইতে নিজের জন্য আনন্দ আদায় করাও সাধারণী রতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ কুব্জা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে পাইয়া নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবেন এই বাসনা যদিও মুখ্য ছিল তথাপি সেই স্বসুখ বাসনার অন্তরালে কখন কখন গৌণভাবে নিজ অঙ্গ দান করিয়া, তাঁহার সেবাবিধান করতঃ তাঁহাকে প্রীত করিবার ইচ্ছাও উদিত হইত। সে কারণে, যে সব শাস্ত্রে ব্রহ্মানুভবজনিত কেবলমাত্র নিজের জন্য সাত্ত্বিক আনন্দ লাভ করিবার উপায় নির্ধারিত আছে, কিম্বা তাঁহাকে পূজা করিয়া কিছু পাইবার বাসনা লুক্কায়িত আছে, তাঁহাকে প্রীত করিবার কোন উপায় নির্ধারিত হয় নাই, তাহাদের স্থান সাধারণী রতি হইতেও নিম্নস্তরে। বৈষ্ণবদিগের মতে ইহা স্বার্থদুষ্ট।

বৈষ্ণব সাধকেরা রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ভগবানকে সেবা করিয়া তাঁহাকে প্রীত করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহাদের যাহা কিছু বলিতে আছে সেই সমুদয় চির নবীন এবং চির কিশোর প্রেমিকের জন্য উৎসর্গ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইহা হইল প্রেমের সাধন। সেখানে স্বসুখ বাসনা রূপ কালিমার স্থান নাই। শ্রীভগবানের অকৃত্রিম সেবা বিধান করিয়া এবং ভগবানকে সম্যকরূপে প্রীত করিয়া এবং ভগবান প্রীত হইয়াছেন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া, তাঁহারা স্বতঃস্ফূর্ত্তরূপে যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহাই বিশুদ্ধ আনন্দ। এ আনন্দ জাতিতে এবং পরিমাণে ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এখানে এই বিরোধ দেখা যায় যে তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে কিছুই চান না, যাহা চান তাহা তাঁহার প্রীত্যর্থে, কিন্তু তাঁহার সেবা করিয়া যে আনন্দ তাঁহারা স্বাভাবিকভাবে পাইয়া থাকেন তাহা শত কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিয়াছেন—

"প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥
নিরুপাধিপ্রেম যাহা তাহা এই রীতি।
প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥" (১।৪।১৬৯-১৭০)

যাহা হউক, সাধারণী রতির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নাই, যদ্দ্বারা আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার মত প্রেম কোথায়?

সাধারণী রতি কেবলমাত্র প্রথম সোপান অর্থাৎ প্রেমের সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

"আদ্যা প্রেমান্তি মাম্।" (উঃ নীঃ ১৪।২৩২)

অষ্টম তরঙ্গ

সমঞ্জসা রতিজাত প্রেম

শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি নিম্নোক্ত শ্লোকের দ্বারা সমঞ্জসা রতির লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন—

"পত্নীভাবাভিমানাত্মা-গুণাদি শ্রবণাদিজা
ক্বচিৎ ভেদিত সম্ভোগ তৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা ।।" (স্থায়ী ভাব পৃঃ ৪৮)

যে রতিতে পত্নীত্বের অভিমান জন্মায় এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ ইত্যাদি শ্রবণের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং যাহা ক্বচিৎ স্বসুখ বাসনার দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয় অথচ যাহা সান্দ্র এবং গাঢ় সেই রতিকে সমঞ্জসা রতি বলে।

কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্য্যময়ী সেবা দ্বারাই প্রেমের স্বরূপ গঠিত। সেখানে নিজের কোন সম্ভোগেচ্ছা থাকে না, থাকে কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা আর এই বাঞ্ছা উত্তরোত্তর যতই বর্ধিত হইতে থাকে, প্রেম ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হয় এবং ততই তাহা শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদ্য হইয়া উঠে।

দ্বারকা লীলায় রুক্মিণ্যাদি পট্ট মহিষীদিগের মধ্যে কান্তা প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সে প্রেম সাধারণা রতিমতী কুব্জার ন্যায় অপরিণত এবং চপল নহে। সে প্রেম সান্দ্র এবং গাঢ়। শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণলীলাদির কথা শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী দেবিগণের প্রেম উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। যদিও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কান্তা, কিন্তু লীলার অনুরোধে সে ভাব প্রচ্ছন্ন থাকায় শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা তাঁহাকে সম্যক প্রীতি বিধান করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।

তথাপি যৌবনের ধর্মবশতঃ হউক, আর যে কারণেই হউক এই কৃষ্ণ প্রীতির অন্তরালে কখন কখন নিজসম্ভোগেচ্ছা উদিত হইত। এই সম্ভোগেচ্ছা যখন উদিত হইত, তখন কৃষ্ণপ্রীতি ভেদ প্রাপ্ত হইত এবং কৃষ্ণপ্রেম শিথিল হইয়া পড়িত। তখন আর কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া রাখিবার তাঁহাদের সামর্থ্য থাকিত না।

কিন্তু তাহা হইলেও সাধারণী রতির মধ্যে যে সম্ভোগেচ্ছা দৃষ্ট হয়, পট্ট মহিষী-

দিগের সম্ভোগেচ্ছা সে জাতীয় নহে। মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের কান্ত বলিয়া অভিমান করিতেন এবং তাঁহাকে পতি হিসাবে সুখী করিবার অভিলাষ প্রাধান্য লাভ করিত। এবং এই অভিমানের মধ্য দিয়া কখন কখন পত্নীত্বসুলভ স্বসুখ বাসনার উদয় হইত। সে সময়েও যে কৃষ্ণ-সুখ বাঞ্ছা একেবারে তিরোহিত হইত তাহা নহে। সমঞ্জসা রতিতে কৃষ্ণ সুখ বাঞ্ছা মুখ্য, স্বসুখ বাসনা গৌণ। এই প্রকারে উভয় বাসনাই যুগপৎ বিদ্যমান থাকিত। কিন্তু সাধারণী রতির মধ্যে নিজের সম্ভোগেচ্ছা মুখ্য এবং কৃষ্ণ প্রীতি বাঞ্ছা গৌণ।

তাহা হইলেও সমঞ্জসা রতিজাত প্রেমে দেখিতে পাওয়া যায় যে সময় সময় আত্মসুখ বাঞ্ছা উদয় হওয়া নিবন্ধন কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্য্যময়ী সেবা বাধিত হইত এবং সে কারণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্যকরূপে আবদ্ধ করিতে পারিতেন না।

সমঞ্জসা রতিজাত প্রেমে ভগবত্ত্বের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণকে তাঁহারা ভগবান বলিয়া অনুভব করিতেন এবং কৃষ্ণও যখন তাঁহাদের নিকট তাঁহার ঐশ্বরিক স্বরূপের কথা উত্থাপন করিতেন, তখন ভয় এবং কুণ্ঠা আসিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করিত এবং তাহাতে তাহাদের প্রেম শিথিল হইয়া পড়িত। তখন তাঁহারা বুঝিতেন যে **কৃষ্ণ ভগবান অতএব তিনি দেহ, গেহ প্রভৃতি সকল বিষয়ে উদাসীন**। তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন কেবলমাত্র ধর্ম পালনের জন্য, তাঁহাদিগের প্রতি মমতাধিক্যে নয়। যিনি উদাসীন তাঁহার আবার মমতা কোথায়?

অপর দিকে এই প্রেমের উৎপত্তি বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে কৃষ্ণের রূপ, গুণ এবং লীলাদির বিষয় অবগত হইয়া পট্ট মহিষীদিগের প্রেম উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। অতএব এই প্রকার প্রেম সহেতুক কিন্তু প্রেমের বিশ্লেষণে বলা হইয়াছে যে প্রেম **অহেতুক, অন্যনিরপেক্ষ এবং স্বয়ংসিদ্ধ**। কোন কিছুর অপেক্ষা না করিয়া প্রেম স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

সমঞ্জসা রতির মধ্যে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাতে বিরহের অসহ্য যাতনা নাই, বিরহের সাত্ত্বিক ভাবাদির উদ্দাম নাই, প্রেমিকের জন্য সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি নাই, ধর্ম, স্বজন, আর্য্য পথ প্রভৃতির উল্লঙ্ঘন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের স্বকান্তা। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিধি অনুযায়ী বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার পরিণীতা স্ত্রী। সেকারণ মিলনের উদ্দামতা নাই। **স্বধর্মের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া অর্থাৎ নিজ ধর্ম বিসর্জন না দিয়া এ রতির বিকাশ। সে কারণ ইহাকে সমঞ্জসা রতি বলে।**

অতএব এ রতির মধ্যে প্রেমের বহুমুখী অভিব্যক্তি নাই এবং সেকারণ কৃষ্ণকে সম্যক বন্ধন করিবার সামর্থ্য নাই। এ রতিজাত প্রেমে অপ্রতিহত গতি নাই।

তাহা হইলে যে প্রেম জাতিতে পরিমাণে এবং রস বৈচিত্রীতে চরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে সে প্রেমের বসতি কোথায় ?

সমঞ্জসা রতি প্রেম অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বর্ধিত হয় অর্থাৎ প্রেমের সপ্তম সোপানের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। "তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা।" (ইতি উঃ নীঃ ৯৪।২৩২)

নবম তরঙ্গ

ব্রজ প্রেম

যে প্রেমে আমিত্ব সুগন্ধ নাই, সুখ বাসনারূপ কালিমার রেখা নাই, যাহা কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যাময়ী সেবায় কেন্দ্রীভূত এবং যাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মহাভাবের শেষ সীমায় গিয়া পৌছায় এবং যে প্রেমায় শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া যান, সেই প্রেমই সাধ্যবস্তু। পূর্ব পূর্ব আলোচনা প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে যে এ জাতীয় প্রেম জীবের মধ্যে সম্ভবপর হইতে পারে না। এ প্রকার প্রেম ভগবানের মহিমা বা তত্ত্ব জ্ঞান প্রসূত জ্ঞান মিশ্র প্রেমের বিষয়ীভূত নহে। এমন কি ঐশ্বর্য্য প্রধান বৈকুণ্ঠ ধামে এ জাতীয় প্রেম পরিদৃষ্ট হয় না। অযোধ্যা লীলায় কান্তা প্রেম মর্য্যাদার আবরণে এক প্রকার অমূর্ত এবং অবিকশিত। মথুরাধামের লীলার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের স্বাতন্ত্র্য থাকায় প্রেম মহিমোজ্জ্বল হয় না। দ্বারকা লীলায় প্রেমের কথঞ্চিৎ বিকাশ লক্ষিত হইলেও কখন কখন স্বসম্ভোগেচ্ছা দ্বারা বিভেদ প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রেম গৌরবমণ্ডিত হয় না এবং অশেষ-বিশেষ রসবৈচিত্রী সৃজন করিতে পারে না। তাহা হইলে সেই মহিমোজ্জ্বল প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ কোথায়?

এজাতীয় প্রেমের বসতি স্থল কেবলমাত্র ব্রজধাম। ব্রজধামেই প্রেমের পূর্ণতম অভিব্যক্তি। ব্রজধামের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই চতুর্ব্বিধ রতির কোনটির মধ্যে স্বসুখ বাসনারূপ কালিমার স্থান নাই। তাই এ ধামের প্রেম উন্নত এবং উজ্জ্বল এবং এই চারিটী রতির প্রত্যেকটি শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণে সমর্থ। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণে প্রত্যেক রতির সামর্থ্য সমানভাবে না থাকিলেও তাহাদের কোনটাই স্বসম্ভোগেচ্ছা দ্বারা বিভেদ প্রাপ্ত হয় না। কৃষ্ণকে 'আপনার' করিয়া লইয়া সেবা করিবার অভিলাষ সর্ব সময়েই বলবৎ থাকে। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের দ্বারা কখন সঙ্কুচিত হয় না। এ ধামে **মদীয়তাময় ভাবের প্রাধান্য**। এই সকল রতিতে **'তদীয়তাময়' ভাব না থাকায়** স্বসুখ বাসনা লুক্কায়িত থাকে না। এ ধামে 'কৃষ্ণ আমার' এই জ্ঞান সর্ব সময়ে এবং সকলকার মধ্যে পূর্ণ বিরাজিত। অবশ্য দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য প্রেমের মধ্যে **সম্বন্ধানুগা** সেবা বিদ্যমান কিন্তু কোনটি

সেবার মধ্যে আবিলতা বা কৃত্রিমতা নাই। পরিশেষে সর্বোপরি সর্বোন্নত এবং সর্বোজ্জ্বল মধুরা রতির সেবা একমাত্র ব্রজধামেই পরিলক্ষিত হয়। মধুরারতির সেবা কামানুগা, সম্বন্ধানুগা নহে। তাই এই রতির সেবা অপেক্ষাশূন্য, সম্বন্ধশূন্য, নিরুপাধি প্রেম হইতে সমুদ্ভূত। তাই এ সেবা সর্ব প্রকার বাঁধন হারা সেবা।

ধর্মাধর্ম, স্বজন, আর্য্যপথ প্রভৃতি সর্ব প্রকার বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া একমাত্র প্রিয়তম জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে আপন করিয়া লইয়া অসংকোচে এবং স্বাভাবিক সরল হৃদয়ে সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা এবং অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া অশেষ বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার অভিলাষ এই রতির মধ্যে নিহিত। এই প্রেমার মধ্য দিয়া যে অমৃত নিঃসন্দী রস প্রবাহিত হয়, সেই রস পান করিবার জন্য অসীম শক্তিধর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম এবং আপ্তকাম হইয়াও তাঁহার লোভ এবং আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

শ্রুতি বলিয়াছেন, 'রসোবৈসঃ'। বিভিন্ন বৈদান্তিকগণ স্ব স্ব সম্প্রদায় অনুসারে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা বৈষ্ণবীয় প্রেমের সূচনার মধ্যে ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি রস স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ। "আনন্দোব্রহ্মেতিব্যাজানাৎ" (ইতি শ্রুতিঃ।) তিনি অখিল রসামৃত সিন্ধু। তাঁহার স্বরূপে আনন্দ ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। এই অনাবিল আনন্দ পাইবার নিমিত্ত শাস্ত্রে বহুবিধ পথের নির্দেশ আছে।

কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগৃহীত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জগতে প্রচার করিলেন, তিনি যে কেবলমাত্র রস স্বরূপে কিম্বা স্বরূপানন্দেই থাকেন, কিম্বা রসরূপে আস্বাদ্য হইয়া থাকেন তাহা নহে। তিনি আবার রসিক এবং রসিকেন্দ্রশিরোমণি। তিনি রসিকরূপে আস্বাদক, তিনি প্রেমিক। তিনি আত্মারাম এবং আপ্তকাম হইতে পারেন, কিন্তু স্বকীয় প্রেমের উদ্দণ্ড তাড়নায় তিনি উন্মত্ত। তিনি প্রেমরস পান করিবার জন্য লালায়িত এবং তৃষিত। তাঁহার মধ্যে কোন অভাব নাই বটে কিন্তু তাঁহার প্রেমই অভাব ঘটাইয়া দেয়। তিনি সর্বস্থলে দাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখানে তিনি গ্রহীতা, প্রেমফলভোক্তা। তিনি প্রেমের জন্য কাঙাল, প্রেমের একান্ত বশীভূত।

ভগবানের এই নিগূঢ় পরিচয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগৃহীত বৈষ্ণবগণ ব্যতীত অপর কেহই দিতে পারেন নাই। জগতের অপর কোন শাস্ত্রে ইহার বিশেষ পরিচয় নাই। তাঁহারাই কেবল জানাইলেন যে তিনি "লীলাপুরুষোত্তম"। প্রেমের লীলাই তাঁহার একমাত্র লীলা! প্রেমের খেলাই তাঁহার একমাত্র খেলা। তিনি দেব নিয়ত ক্রীড়াশীল। দিব্ ধাতু ক্রীড়ার্থবাচক। তিনি প্রেমরস আস্বাদক। যাঁহার

মধ্যে যে জাতীয় এবং যে পরিমাণ প্রেম আছে, তিনি সেই প্রেমের ততটুকু বশীভূত।

তিনি যে জাতীয় সুখ আস্বাদন করিতে চান, তাহা তাঁহার স্বরূপেরই আনন্দ, বিজাতীয় বস্তু নহে। কিন্তু প্রেমের বিষয়রূপে তিনি যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহার চরমোৎকর্ষতা প্রাপ্তি ঘটে না। যাঁহারা তাঁহার প্রেমের আশ্রয়, যাঁহারা তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির পরিণতি, তাঁহাদের প্রেমরস পান করিবার জন্য তিনি লোলুপ। তাঁহার প্রেম যোগ্য আধারে পতিত হইয়া রসের অনন্ত বৈচিত্রীসৃজন করে এবং সেই রস বৈচিত্রীই তখন তাঁহার আস্বাদ্য হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে জলধি তখনই রত্নালয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, যখন তাহার বারি সূর্য্যের উত্তাপে বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া নবাম্বুদে পরিণত হয় এবং যখন সেই বারি সুস্বাদু হইয়া পুনরায় তাহার উপর নামিয়া আসে। সেই প্রকার ভগবান তখনই প্রেমিক হন, যখন তাঁহার প্রেম বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিফলিত হইয়া অশেষবিধ রস বৈচিত্রী সৃজন করে এবং তখনই তিনি সেই প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য আকৃষ্ট হন। নতুবা তিনি আত্মারাম, আপ্তকাম, নির্ব্বিকার এবং নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। গীতার মধ্যে আমরা যে ত্রিগুণের বিস্তার দেখি তাহা শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির। এই মায়াশক্তির দ্বারা জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য চলিতেছে। তৎপরে জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি। তৎপরে সর্বোপরি তাঁহার স্বরূপশক্তি। এই স্বরূপশক্তিকেও তাঁহারা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী। এই তিন শক্তি তাঁহার চিচ্ছক্তি বা পরাশক্তি। এই তিন শক্তির দ্বারা তাঁহার স্বরূপ গঠিত। পূর্বেও এ সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। এই ত্রিশক্তি অভিন্না। এই শক্তি তাঁহার সচ্চিদানন্দ-ময়ত্বের প্রকাশক।

এখন দেখিতে হইবে, এই ত্রিশক্তির চরম পরিণতি কোথায়? যে স্থলে তাঁহার এই তিন স্বরূপ শক্তির পূর্ণতম অভিব্যক্তি, তাহাই তাঁহার পরম ধাম এবং তাহাই তাঁহার লোভনীয় ক্রীড়ার স্থান।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরলীল। নররূপে তিনি যে লীলা করেন তাহাই তাহার সর্ব্বোত্তম লীলা। চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,

"কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নর বপু তাঁহারি স্বরূপ।

গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥" (২।২১।৮৩-৮৪)

কিন্তু নরলীলা বলিতে ইহা বুঝায় না যে ইহা **প্রাকৃত লীলা** বা প্রকৃতির গুণত্রয়-এ অনুরঞ্জিত। ইহা সম্বিদ শক্তিযোগে সচেতন এবং হ্লাদিনী শক্তিযোগে অশেষ বিশেষরূপে রস আস্বাদন। নরলীলা করিতে হইলে ধামের প্রয়োজন, পিতামাতার প্রয়োজন, সুহৃদবর্গের প্রয়োজন এবং সর্ব্বোপরি কান্তাগণের প্রয়োজন। ধাম, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন তাঁহার **সন্ধিনী শক্তির** পরিণতি। তাই তিনি 'সৎ' অর্থাৎ তদ্দ্বারাই তিনি তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা সকলেই চিন্ময় প্রেমরসে বিভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদ্য হইয়া আছেন। আর তাঁহারাও কৃষ্ণকে প্রেমরস আস্বাদন করাইয়া তাঁহার মাধুর্য্য নিজেরাও আস্বাদন করিতেছেন।

এই ত্রিশক্তির পরিণতি আমরা কেবল ব্রজধামেই দেখিতে পাই। এই ত্রিশক্তি সম্বলিত লীলা তাঁহার স্বরূপের লীলা এবং এই লীলার নিকেতন শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী শক্তির পরিণতি বৃন্দাবন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নরলীলা করিতে হইলে ধামের প্রয়োজন, পিতামাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রয়োজন। এই ধাম চিদাত্মক, সে কারণ সম্বিদশক্তির বা চেতনশক্তির যোগে বৃন্দাবন স্বপ্রকাশ।

বৈষ্ণবভক্ত কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবনের মাধুর্য্য বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসংহিতার বচন, বৃন্দাবন ধাম জড় বস্তু নহে। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত থাকিয়াও বৃন্দাবন সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। এখানকার ভূমি চিন্তামণি। এখানকার বৃক্ষগণ কল্পবৃক্ষ। এখানকার জল অমৃতময়। এখানকার বাক্যসমূহ সুমধুর গান। গমন মাত্রই নাট্য। এখানকার বংশী প্রিয়সখী এবং ইহা চিদানন্দ জ্যোতিঃ। অর্থাৎ এখানকার চন্দ্র, সূর্য্য, রূপরস-গন্ধস্পর্শশব্দাদি বিষয় সকল চিদাত্মক। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এখানকার **পরম পুরুষ** এবং এখানকার মহালক্ষ্মীগণ তাঁহার **কান্তা**।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমাঃ, ভূমিশ্চিন্তামণি গণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং, নাট্যং গমনমপি, বংশীপ্রিয়সখী
চিদানন্দ জ্যোতিঃ পরমপি-তদাস্বাদ্যমপি চ ॥"

বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ্ সিন্ধু।
দ্বারকা বৈকুণ্ঠ সম্পদ্ তার একবিন্দু॥

পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবন ধাম॥
চিন্তামণি ভূমি, চিন্তামণি ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী-চরণ ভূষণ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন
পুষ্প ফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন॥
অনন্ত কাম ধেনু যাঁহা ফিরে বনে বনে।
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অন্য ধনে॥
সহজে লোকের কথা, যাঁহা দিব্যগীত।
সহজ গমন করে নৃত্য পরতীত॥
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান॥
লক্ষ্মীজিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রিয় সখী কাজ॥" (চৈঃ চঃ ২।১৪।২০৬-২১২)

এখানকার সুরভীগণ ক্ষীর দুগ্ধ ধারা ক্ষরিত করিয়া রাধাগোবিন্দের সেবা করেন। গিরি গোবর্ধন ফল, মূল, তৃণ, গুল্ম, শষ্প প্রভৃতি ধারণ করিয়া বৃন্দাবনের সেবা করেন। এখানকার মেঘসকল প্রয়োজনানুসারে শ্রীকৃষ্ণের ছত্র ধারণ করেন। এখানকার তরু, লতা, গুল্ম, পশু-পক্ষী, বন-উপবন সমুদয় রাধামাধবের লীলার উপকরণ প্রস্তুত করেন। এখানকার যমুনাদেবী লীলার মাধুর্য্য বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমমত্তে এবং কর্ণানন্দি অস্ফুটরবে উজান বহিয়া যান। রাধাগোবিন্দের লীলার জন্য অগণিত নিকুঞ্জবন পত্র, পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়া বৃন্দারণ্যের সৌন্দর্য্য বর্ধন করেন। এই সকল নিকুঞ্জবন রাধাগোবিন্দের লীলা নিকেতন, সুতরাং লীলার দ্বারা পরিসেবিত হইয়া পবিত্র এবং উজ্জ্বল। নভোমণ্ডলে চন্দ্রমার অলৌকিক আলোকসম্পাতে বৃন্দাবন সমুদ্ভাসিত। এই ধাম নিত্য নবীন, চিরসুন্দর এবং অপ্রাকৃত। কেবলমাত্র ব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণের লোভনীয় লীলার স্থান। এই ধামের রজঃ পাইবার নিমিত্ত দেবতাগণও অভিলাষী।

এই স্থানের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধ। সম্বন্ধ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্যকরূপে বন্ধন। এই স্থানে সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ। হস্তীকে যেরূপ লৌহশৃঙ্খল দ্বারা বাঁধিয়া রাখা যায়, সেইরূপ এখানে প্রমত্ত মাতঙ্গরূপী শ্রীকৃষ্ণ সুদৃঢ় প্রেম শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া আমি এক পাও যাইব না, শুধু তাহা নহে। বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার সামর্থ্যও ভগবানের নাই।

ব্রজধাম অশেষ বিশেষ মাধুর্য্যমণ্ডিত। এখানকার ভগবান চিরসুন্দর, চিরমধুর এবং চির নবীন। তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া ব্রজবাসিগণ যেমন আত্মহারা, তিনিও তেমনি তাঁহাদের প্রেমের জন্য কাঙাল। এখানে ভগবত্তার ঝাঁজ নাই, প্রেমের সংকোচ নাই, দ্বিধা নাই, ত্রাস নাই, আছে কেবল প্রাণভরা ভালবাসা।

ব্রজে যে ঐশ্বর্য্য নাই তাহা নহে। ব্রজের ঐশ্বর্য্য অপরাপর ধামের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ যখন ছয় দিনের শিশু তখন তিনি পুতনা নামক রাক্ষসীর স্তন চুষিতে চুষিতে তাহাকে নিধন করিলেন। তিনি যখন এক বৎসরের বালক তখন তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে বালকের ন্যায় গলা জড়াইয়া ধরিয়া তৃণাবর্ত্তকে বধ করিলেন। গোষ্ঠ ক্রীড়ায় রত অবস্থায় বকাসুর এবং বৎসাসুরকে নিধন করিলেন। যমুনার জলে ঝম্পপ্রদান করিয়া বিষানলউদ্গারী কালীয় নাগকে দমন করিলেন। বাল্য বয়সে আরও কত কিযে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটন করিলেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এই সকল ঘটনা সম্পাদিত হইল অতিশয় অলৌকিক ভাবে। এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য এবং অসাধারণ কার্য্য করিতে গিয়া তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইল না। সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইল না এবং বহু বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চালাইতে হইল না। তড়িতের ন্যায় এক একটী ঘটনা অসাধারণরূপে সম্পাদিত হইল। কিন্তু এই সমুদয় প্রতিকূল ঘটনা তাঁহাকে প্রেমরস আস্বাদন হইতে বিরত করিতে পারিল না। অধিকন্তর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাঁহাদের প্রেমরস তিনি আস্বাদন করিতেছিলেন, তাঁহাদের মনেও কোন ভগবত্তাব বোধ জাগাইয়া দিয়া তিনি তাঁহাদের প্রেমকে শিথিল করিয়া দিতে পারিলেন না। যাঁহারা তাঁহার প্রেমের আশ্রয়, তাঁহাদের নিকট তিনি অবোধ বালকরূপেই প্রতীয়মান হইলেন। সেকারণ চৈতন্য-চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন, দৈত্য নিধন স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে, তাঁহার মধ্য হইতে বিষ্ণুশক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া অসুর মারণরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন করেন।

যাহা হউক ব্রজধামে দেখা যায় যে **ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যের পূর্ণতম অভিব্যক্তি**। অবশ্য ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য দ্বারাই ভগবানের স্বরূপ গঠিত। কিন্তু অন্য কোন ভগবৎ স্বরূপের লীলার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের এমনতম মাধুর্য্যের আনুগত্য নাই। ব্রজধামের **ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য দ্বারা পরিসিঞ্চিত এবং পরিনিষিক্ত**। এখানকার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য বিমণ্ডিত। এখানকার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অন্তরালে থাকিয়া প্রয়োজনানুসারে মাধুর্য্যের সেবা বিধান করে। কোন সময়ে নিজের স্বতন্ত্র আধিপত্য

বিস্তার করে না। তাই এই প্রকার ঐশ্বর্য্যে ভীতি নাই, ত্রাস নাই এবং সঙ্কোচ নাই। ইহা মধুর রসলীলার পুষ্টি বিধায়ক এবং মাধুর্য্য দ্বারা কবলিত।

এখানকার সকলেই কৃষ্ণগত প্রাণ। কৃষ্ণ ছাড়া তাঁহারা আর কিছুই জানেন না। অতএব এখানকার চতুর্বিধা রতিই পরম বৈশিষ্ট্য ধারণ করিয়াছে। কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে। প্রত্যেকটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম আস্বাদ্য হইয়া আছে।

দশম তরঙ্গ।

দাস্য প্রেম

ব্রজধামের দাসগণের সেবা অতীব মধুর। রক্তক পত্রকাদি দাসগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে সুগন্ধ দ্রব্যাদিপূর্ণ তৈলাদি মর্দন করেন, পানীয় ও স্নানের জল প্রস্তুত রাখেন। বসন-ভূষণ পরিধান করাইয়া দেন এবং অলকা তিলকাদি দ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করেন। তাঁহাদের সেবার বিরাম নাই, ত্রুটি নাই এবং বিশ্রাম নাই। ক্ষণ-পরিমিত কালও তাঁহারা কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে ব্যয় করিতে চাহেন না। পরিশ্রম বশতঃ ক্লেশ বা ক্লান্তিও অনুভব করেন না। যাহা কিছু করেন সকলই কৃষ্ণের প্রতি মমতাধিক্যে, প্রভুর প্রীত্যর্থে, নিজেদের প্রীতি বাসনা নিবন্ধন নহে। গৌরবজনিত বুদ্ধি বা প্রভুদাসের সম্বন্ধ আছে বটে কিন্তু ভগবদ্বুদ্ধি নাই। সে কারণ তাঁহাদের সেবার মধ্যে গৌরব বুদ্ধি ব্যতীত অপর কোন সংকোচ নাই।

এদিকে প্রভুও তাহার আচার ব্যবহার দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি অশেষবিধ সদ্গুণের দ্বারা দাসগণকে এমনিভাবে কৃতার্থ করেন যে তাঁহারা তাঁহার সেবা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত অপর কিছুই করিতে চাহেন না এবং প্রভুও তাঁহাদের দাস্য প্রেম আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হন।

ব্রজের দাস্য প্রেমের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় এই ব্রজধামের দাস্য প্রেম সম্পূর্ণ গৌরববুদ্ধি প্রসূত নাও হইতে পারে। কারণ রক্তক পত্রকাদি দাসগণ শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎভাবে গৌরব বুদ্ধি পোষণ করিতেন না। তাঁহারা নন্দ মহারাজকেই প্রভু বলিয়া জানিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রভুপুত্ররূপে গণ্য করিতেন এবং সেবা করিতেন। দাসগণের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ তাঁহারা তাঁহাকে কথঞ্চিৎ বাৎসল্যভাবের দ্বারা পরিচর্য্যা করিতেন এবং যাঁহারা তাঁহার সম, তাঁহারা তাঁহাকে সখ্যভাবে সেবা করিতেন। এই হিসাবে ব্রজের দাস্য প্রেমেও কথঞ্চিৎ সংকোচহীন সেবা বিদ্যমান থাকিত এবং ব্রজের দাস্য প্রেম কথঞ্চিত বাৎসল্য এবং কথঞ্চিত সখ্যভাবে প্রতিভাবিত। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সেবা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইতেন। গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর বালভৃত্যগণের মধ্যে কেহ কেহ গোখুরোত্থিত রজঃরাশি তাঁহার অঙ্গ হইতে বিদূরিত করিতেন। কেহ কেহ তাঁহার গাত্র মার্জনা করিতেন এবং

কেহ কেহ শৃঙ্গ, বেণু, যষ্টি অপসারণ করিতেন। কেহ কেহ কঙ্কতিকা দ্বারা তাঁহ কেশকলাপ সংবদ্ধ করিয়া দিতেন। কেহ কেহ নিজ নিজ ভাবে বিভোর হইয়া বসনভূষণ পরিধান করাইয়া কটিদেশে স্বর্ণপটিকা যোজনা করিতেন। ইহা ব্রজ-ধামের ভাবানুকূল সেবা সম্ভোগের একটী মনোরম চিত্র। এ প্রকার চিত্র কোথাও দৃষ্ট হয় নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার পরিকর ভৃত্য ঈশানেরও দাস্যভাব বাৎসল্য রসের দ্বারা পরিসিঞ্চিত ছিল। তিনিও মহাপ্রভুকে তাঁহার প্রভু জগন্নাথ মিশ্র এবং প্রভুপত্নী শচীদেবীর পুত্র হিসাবে মমত্ব বুদ্ধির আশ্রয়ে সেবা করিতেন। তাঁহার সেবার মধ্যে গৌরব বুদ্ধিজনিত সংকোচ এবং দ্বিধা আন্তরিক সেবার প্রতিকূলতা করিতে পারিত না। সেখানেও সংকোচহীন সেবা এবং আন্তরিক স্নেহ বিদ্যমান থাকিত।

প্রেমের ধর্ম্ম সেবা—অকৃত্রিম সেবা। সে কারণ দাস্যভাব আদিভাব। দাস্যভাব অপরাপর রতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেই সেই রতির বর্ণে রঞ্জিত হয়। তৎপরে সেই রতির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই রতির ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা বিধান করে। অতএব যেখানে রতির উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে দাস্য ভাবেরও উৎকর্ষ আছে। যেখানে দাস্যের অপকর্ষ, সেখানে রতিরও অপকর্ষ সাধিত হয়। দাস্য ভাবকে কেবল গৌরবজনিত বলিয়া সীমিত করিয়া দেখিলে তত্ত্বের ঠিক্‌ঠিক্ সমাধান হয় না। প্রসঙ্গতঃ এ বিষয় স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত বংশে প্রভু দাসের সম্বন্ধ এত নিবিড় এবং মধুর ছিল যে প্রভুরা তাঁহাদের দাস দাসীগণকে নিজ নিজ পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। দাস দাসীগণের মর্য্যাদাও বড় কম ছিল না। প্রভুদের সন্তানগণ দাস দাসীদিগের সঙ্গে খেলা করিতেন। তাহাদিগকে মধুর সম্ভাষণ করিতেন। তাঁহারা বড় হইয়া উচ্চ পদ লাভ করিলেও তাহাদের পূর্ব্ব ভাব অন্তর্হিত হইত না। গৌরব বুদ্ধির অন্তরালে দাস দাসীগণ শুধু কর্ত্তব্যানুরোধে নয়, প্রাণের আবেগে এবং মমত্ব বুদ্ধির আশ্রয়ে নিজেদের প্রাণ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতেন। এই প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ধাত্রীপান্নার কথা সকলের নিকট সুবিদিত। প্রাণের আবেগে, মমত্ব বুদ্ধির আশ্রয়ে নিজ পুত্রকে উৎসর্গ করিয়া তিনি যে ভাবে প্রভু পুত্রের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই অকৃত্রিম কর্ত্তব্যপরায়ণতা তাঁহাকে জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

যাহা হউক, ব্রজধাম ব্যতীত অন্যত্র দাস্য প্রেমের এবম্প্রকার মাধুর্য্য বিদিত

হওয়া যায় না। প্রত্যেক রাজ্যেই দাস্যভাব আছে কিন্তু সেখানকার দাস্যভাব বিধি পূর্ব্বক হইয়া থাকে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে। ষড়ৈশ্বর্য্যে পূর্ণ ভগবানের নিকট উপনীত হওয়া তো অতীব দুরূহ। তাঁহার দাসগণের যে প্রকার ঐশ্বর্য্য তাহা দেখিয়াই আমরা স্তম্ভিত এবং বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি। স্বয়ং ভগবানের নিকট পৌছান তো দূরের কথা। অধিক কথা কি, আমাদের রাষ্ট্রপতির দাসগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

মর্ত্তলোকের দাসভাব উত্তরোত্তর যে প্রকার কলুষিত হইয়া পড়িতেছে তাহা সকলের চক্ষেই পড়ে। আজকাল প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ যে প্রকার বিকৃত এবং অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, কর্মকর্ত্তাগণ এবং শ্রমিকগণের মধ্যে এমন একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে যে আমরা প্রত্যেক দিনই তাহার পরিচয় পাইয়া থাকি।

প্রভুদের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই অসন্তোষ প্রকাশ। প্রভুগণও যেমন নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, দাসগণও ঠিক সেই প্রকার নিজ নিজ পাওনা গণ্ডার হিসাব লইয়া ব্যস্ত। ফলে, পথে মাঠে সর্ব্বত্রই পতাকা হস্তে প্রভুদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন। রেলওয়ে কলকারখানায়, প্রধান প্রধান কার্য্যালয়ে ধর্মঘট প্রায় লাগিয়াই আছে। যেখানে স্বার্থের পূতিগন্ধময় ভাব থাকিবে এবং মদীয়তাময়ভাব থাকিবে না, সেইখানেই বহুবিধ অসামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকিবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন বৈষ্ণবদিগের ধর্মভাববিলাসিতার ধর্ম। দেশব্রতী এবং কর্মযোগিদিগের জন্য এ ধর্ম নহে। এক দিক দিয়া বিবেচনা করিলে হয়তো কিছু সত্য থাকিতে পারে, কারণ বৃন্দাবনের ভজন সাধারণের জন্য নহে, স্বল্প লোকের জন্য। কিন্তু তাহা হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে বৃন্দাবনের ভজন, রাগমার্গের ভজন, মমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করতঃ ভজন। তদনুসারে দেশব্রতীগণ যদি তাঁহাদের অকৃত্রিম আচরণের দ্বারা দেশবাসীগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন যে এ দেশ আমাদের এবং আমাদের বলিয়া এ দেশের সেবা আমাদের করিতে হইবে, তাহা হইলে মনে হয়, অসন্তোষ এবং বিক্ষোভের অবসান ঘটিতে পারে। অন্যথা যদি তাঁহারা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া এবং মমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় না লইয়া কার্য করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দেশ সেবা আত্মসেবায় পর্য্যবসিত হইবে এবং সে কারণ অশান্তি এবং বিক্ষোভের অন্ত রহিবে না।

অসন্তোষের মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে অসামঞ্জস্য। মনুষ্যকৃত অসামঞ্জস্য স্বসুখ-বাসনা হইতে প্রসূত। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে যখন আমরা মনে-প্রাণে বুঝিতে পারিব যে এদেশের সঙ্গে আমাদের সকলেরই সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে, তখনই আমাদের

ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ দূরীভূত হইবে, জাতীয় সম্পদ উন্নয়নের জন্য সকলেরই প্রবৃত্তি আসিবে এবং মমত্ববুদ্ধির আশ্রয়ে সর্ব কর্ম সরল এবং স্বাভাবিক হইবে।

প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে দাস্যভাব বিদ্যমান। দাস্যভাব সর্ব ধর্মের অঙ্গী। কি খ্রীষ্টীয় ধর্ম, কি মুসলমান ধর্ম, কি হিন্দু ধর্ম সকল ধর্মে 'জীব ভগবানের দাস বা সেবকরূপে অভিহিত।' খ্রীষ্টীয় ধর্মে পোপের উপাধি 'Servus servorum Dei' অর্থাৎ ভগবানের দাসানুদাস। খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণ এই প্রকারে তাঁহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া থাকেন। গৌরমতাবলম্বী বৈষ্ণবগণও তদ্রূপ নিজদিগকে চিহ্নিত করেন। কিন্তু তাঁহাদের দাস্যভাব অপরাপর দাস্য ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁহারা ভগবত্তাকে প্রাধান্য দিয়া সেবা করেন না। তাঁহারা ভগবানকেই সেবা করেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্বোধে নয়। কারণ ভগবানকে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণরূপে সেবা করিলে কোন না কোন স্বসুখ বাসনারূপ কালিমা থাকিয়া যায়। ফলে অকৃত্রিম এবং নিষ্কামভাবে ভজন করিতে পারা যায় না। তাই অন্যান্য ধর্মে যে দাস্যভাব দেখা যায় তাহা প্রভুর নিকট হইতে নিজেদের জন্য কোন না কোন বাসনা পরি-পূরণের প্রার্থনা। তাঁহাকে সুখী করিবার নিমিত্ত নহে, নিজদিগকে সুখী করিবার নিমিত্ত। ব্রজের দাস্যভাব, দাস্য প্রেমের উপরে স্থাপিত। প্রেমের সহিত স্বসুখ বাসনার লুকোচুরি খেলা নাই। প্রেমের স্বভাব প্রেমাস্পদকে মদীয়তা জ্ঞানে সেবা করা।

অতএব বৈষ্ণবীয় দাস্য প্রেমে প্রাপ্তির কোন স্থান নাই। বৈষ্ণব সেবকগণ কেবল তাঁহাদের প্রভুকে আপনার জ্ঞানে সম্যক প্রীতি বিধান করেন। প্রভুকে সন্তুষ্ট করা ব্যতীত অন্য কোন বাসনা তাঁহাদের হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে না। ইহার সহিত স্বসুখ বাসনা এমনকি মুক্তি বাঞ্ছা পর্য্যন্ত জড়িত নাই। **ইহার উৎপত্তি এবং প্রেরণা কেবলমাত্র লৌল্য।** অকৃত্রিম সেবাদির দ্বারা প্রভুর আনন্দবিধান করাই দাসের কাম্য। কোন প্রকার স্বার্থের দ্বারা এ প্রেম পঙ্কিল নহে। **ব্রজের দাস্য প্রেম নিষ্কাম স্বচ্ছ এবং নির্মল।** চৈতন্য চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন :—

"কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥" (২।১৯।১৩২)

ব্রজের দাস্য প্রেম প্রেমবিকাশের রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠস্তর অর্থাৎ রাগ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

একাদশ তরঙ্গ।

সখ্য প্রেম

ব্রজের সখ্য প্রেম অতীব মাধুর্য্য মণ্ডিত। গোপ বালকগণ কৃষ্ণকে প্রাণের সখা বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার সহিত খেলা করিতে এবং গোচারণে যাইতে ভালবাসিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণ কানাইকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। প্রিয় সখার যাহাতে সুখ বিধান হয় তাহাই তাঁহাদের লক্ষ্য। এদিকে রাজনন্দন হইয়াও কৃষ্ণের গোপ অভিমান কেবল সখ্য প্রেমরস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত। মা যশোমতী যদিও তাঁহাকে মণিমাণিক্যাদি খচিত দিব্য আভরণে সজ্জিত করিয়া রাখিতেন, তথাপি চঞ্চল গোপাল সে সকল কোথায় ফেলিয়া দিয়া, পল্লব এবং কুসুমের আভরণের দ্বারা সজ্জিত থাকিতে ভালবাসিতেন। গোপ বালকদিগের সহিত খেলিতে হইবে অতএব রাজবেশের প্রয়োজন কি? তাই তাঁহার কর্ণযুগলে কর্ণিকা কুসুমের অবতংস, শিরে শিখিপুচ্ছ, বাহুতে পল্লবের অঙ্গদ, গলে গুঞ্জাহার, পদে নূপুর।

বালক কৃষ্ণ শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সখাদের লইয়া দণ্ড শৃঙ্গ, বেত্র, বেণু লইয়া গোচারণে যাইতেন। কৃষ্ণের শয্যা হইতে উঠিতে দেরী হইলে গোপ বালকগণ প্রভাতে কৃষ্ণের শয়ন কক্ষে আসিয়া প্রাণ কানাইকে ডাকিতেন;

> "কানাই এ কি ভাই প্রভাতে রইলি অচৈতন্য।
> উঠলো ভানু ও নীল তনু যায় না ধেনু বেনু ভিন্ন॥"
>
> (৺দাশরথী রায়ের পাঁচালী।)

সখাদের সঙ্গে গোচারণে গিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেন। উড্ডীয়মান বিহঙ্গগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেন। তাহাদের শব্দের অনুকরণ করিতেন। কখন সখাদের সঙ্গে কৃত্রিম যুদ্ধ করিতেন। যদি তিনি জিতিতেন তাহা হইলে তিনি সখাদের স্কন্ধে চড়িতেন এবং যদি তিনি হারিতেন তাহা হইলে তিনি সখাদিগকে স্কন্ধে বহন করিতেন। কোন প্রকার কৃত্রিমতা নাই, সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক বাল্য-ভাব। কে বলিবে এ কৃষ্ণ ভগবান এবং সর্ব্বাধীশ্বর।

অপরের কী কথা! কৃষ্ণের এতাদৃশী বাল্যলীলা দেখিয়া স্বয়ং ব্রহ্মারও মনে ভ্রান্তি উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন যে নরশিশু তাঁহার সম্মুখে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, সে কখন ভগবান হইতে পারে না। ব্রহ্মা পরীক্ষা করিবার জন্ম কৃষ্ণের সমস্ত গোবৎস এবং গোপ বালকগণকে অপহরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন। এদিকে সর্বান্তর্যামী, সর্বযজ্ঞেশ্বর হরি তাহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার নিজের কলেবর হইতে সেই সেই গোবৎস এবং গোপ বালকগণকে প্রকটিত করিয়া খেলায় মত্ত রহিলেন। এত বড় বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিল তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। ফলে এই মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল যে গোপ গোপীগণ এই সকল গোবৎস এবং গোপ বালকগণকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সেবা যত্ন এবং আদর করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারাই যেন গোপ গোপীগণের প্রিয় হইতে প্রিয়তর বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না যে এই গোবৎস এবং গোপবালকগণের প্রতি তাঁহাদের এখন এত মমতাধিক্য কেন হইল? শ্রীবলরামেরও মনে সংশয় উপস্থিত হইল ইহা কি বিষ্ণুমায়া? কিন্তু পরে উপলব্ধি করিলেন যে ইহা বিষ্ণুমায়া নহে, ইহা কৃষ্ণমায়া।

এদিকে ব্রহ্মা দেখেন যে কৃষ্ণ ঠিক সেই সেই ভাবেই পূর্ববৎ গোবৎস ও গোবালকগণকে সঙ্গে করিয়া ক্রীড়ায় মত্ত রহিয়াছেন, কোন প্রকার ভাব বৈলক্ষণ্য নাই। এমন একটা অঘটন ঘটন সংঘটিত হইল তাহা কাহারও বোধ নাই। তখন ব্রহ্মার মোহ দূরীভূত হইল। পরম গুরু, বুদ্ধির প্রেরক, সর্বান্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে যেমন তাঁহার হৃদয়ে বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই প্রকার চৈত্ত্যগুরুরূপে ব্রহ্মার মোহ বিদূরিত করিলেন। ব্রহ্মাও তাঁহার কৃতকর্মের নিমিত্ত অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া বহু প্রকার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে এতই অশ্রুপাত হইতে লাগিল যে তদ্ধারা বৃন্দাবনে এক কুণ্ড সৃষ্ট হইল। তাহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড এবং এই লীলার নাম 'ব্রহ্মমোহন' লীলা।

সখারা যদি সুমিষ্ট ফল পাইতেন এবং তাহা খাইয়া যদি মিষ্ট লাগিত তাহা হইলে অর্ধেক খাইয়া প্রাণ কানাইকে দিয়া বলিতেন, "ভাই কানাই, কি সুমিষ্ট ফল, তুই একটু খা"। এই বলিয়া অর্ধভুক্ত ফল কৃষ্ণের মুখে তুলিয়া দিতেন। তাহাতেই তাঁহাদের কত আনন্দ। বনে অনেক প্রকার ফল থাকিত এবং বিষাক্ত ফলও থাকিতে পারে, তাই তাঁহারা পূর্বে না খাইয়া কৃষ্ণকে দিতে পারিতেন না, কারণ তাহাতে যদি তাঁহাদের প্রিয়সখা কৃষ্ণের কোন বিপদ হয়। নিজেদের জীবনের প্রতি তাঁহাদের কোন ভ্রূক্ষেপ থাকিত না। কৃষ্ণই তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন ছিলেন।

তাঁহাদের গোষ্ঠ গমনের ক্রম হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা কি ভাবে কৃষ্ণকে ভালবাসিতেন। পাছে কৃষ্ণের কোন অমঙ্গল হয় এই আশঙ্কায় তাঁহারা কৃষ্ণকে মধ্যে রাখিয়া চলিতেন আর সম্মুখে থাকিতেন অমিততেজা; পরম শক্তিশালী দাদা বলরাম। যদি তাঁহারা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হন, তাহা হইলে দাদা বলরাম তাঁহার অমিত বিক্রমের দ্বারা তাহা প্রতিহত করিতে পারিবেন। কৃষ্ণের দুই পার্শ্বে ও পশ্চাতে অগণিত গোপ বালক আছেন, তাঁহারাও তাহা প্রতিহত করিতে পারিবেন। কৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা এই প্রকার বুাহ রচনা করিয়া গোষ্ঠে গমন করিতেন।

এখানে সখাদের বিশ্রম্ভ ময়ভাব। কোন সংকোচ নাই, কোন গৌরব বুদ্ধি নাই, সকলেই এক মন এক প্রাণ। ছোট বড় কোন বিভেদ নাই। ভগবদ্বুদ্ধি তো দূরের কথা। তাই কবি গুরু রবীন্দ্র নাথ ব্রজের সখ্য প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া সেই ভাব পাইবার লোভে তাঁহার অতুলনীয় কবিতা ঝঙ্কারে 'ব্রজের রাখাল বালক' হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

বহু প্রকার আশ্চর্য্য ঘটনা যে তাঁহারা দেখেন নাই তাহা নহে, কিন্তু সে গুলি যে তাঁহাদের সখা কৃষ্ণের কার্য্য একথা কোন সময়ে মনে হইলেও তাহা তাঁহাদের সখ্য প্রেমকে শিথিল করিতে পারিত না। অঘাসুর বধ, বকাসুর বধ প্রভৃতি কৃষ্ণের ঐশ্বরিক ক্ষমতার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাইলেও তাঁহারা সংকুচিত হইতেন না। গোবর্ধন ধারণ করিবার পর ক্রীড়ারঙ্গে সখারা বলিতেন, "হারে কৃষ্ণ, তুই তো বাম করের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা কন্দুকের ন্যায় গিরি গোবর্ধন ধারণ করেছিলি, তারা নাকি তোকে সকলে 'গিরধারী' বলিয়া ডাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কি তুই মনে করিস্ যে তুই আমাদের চেয়ে বেশী শক্তিমান। আমরাও ওসব কাজ করিতে পারিতাম, কিন্তু করি নাই কেন জানিস্, তাহ'লে তোর জয়ধ্বনি হইত না সেই কারণে। কিন্তু এখন আয় দেখি তুই আমাদের সঙ্গে বাহু যুদ্ধে, দেখি কে হারে?" অমনি বাহু যুদ্ধ আরম্ভ হইল কিন্তু কী আশ্চর্য্য! কৃষ্ণ ভগবান হইয়াও এবং সর্বত্র অপরাজেয়, অজিত এবং অচ্যুত হইয়াও সখাদিগের নিকট পরাজিত হইলেন। ধন্য ব্রজের সখ্য প্রেম! এসখ্য প্রেমের মনোরম চিত্র বৈষ্ণবগণ ব্যতীত অপর কেহই অঙ্কিত করিতে পারেন নাই।

অপর দিকে কৃষ্ণ অর্জুনের সখ্য প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহার সারথ্যাদির কার্য্য করিয়াছিলেন। আহারে, বিহারে, শয়নে জাগরণে সকল সময়েই এক সঙ্গে থাকিতেন। অর্জুনও তাঁহাকে সখারূপে ভালবাসিতেন। কিন্তু যেই অর্জ্জুন

বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন, অমনি ভগবত্তার ঝাঁজে তাঁহার সখ্য প্রেম সংকুচিত হইল। তখন তিনি কৃষ্ণকে ভগবানরূপে জানিতে পারিয়া বহু প্রকার স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। নতশিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে সর্ব্ব দিক হইতেই তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। একত্রে ভোজন, একত্রে শয়ন এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপে যে সকল হাস্য পরিহাস করিয়াছিলেন সেজন্য অপরাধ মনে করিয়া কৃতাপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

অর্জুনের তখন মনে হইল তিনি যে কৃষ্ণকে 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন বা তাঁহার সহিত হাস্য পরিহাস করিয়াছেন, একত্রে খাওয়া, বসা, শোয়া ইত্যাদি সমভাবাপন্ন হইয়া যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা তাঁহার ভ্রান্তি এবং অপরাধ ব্যতীত আর কিছু নহে, তাহা অবিবেক বশতঃই হইয়াছে। কারণ তখন তিনি জানিতে পারেন নাই যে কৃষ্ণ সকল জগতের পিতা, পূজ্য এবং গরীয়ান। তাঁহার সমান বা ঊর্দ্ধে কেহ নাই। অতএব এখন ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাবে প্রেম যে কত দূর সরিয়া যায় এবং সেবা কার্য্যের বিঘ্ন ঘটায়, গীতার একাদশ অধ্যায় তাহার প্রমাণ।

বলা বাহুল্য ইহলোকের সখ্য প্রেম স্বার্থ পঙ্কিল। তবে লৌকিক জগতেও যে উন্নত ধরণের সখ্যভাব দেখা যায় না তাহা নহে। যদি বা সে ভাব কোন স্থলে কিঞ্চিৎ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহা ব্রজপ্রেমের আভাস। কিন্তু ব্রজধামের প্রেম জগতে নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহা প্রকৃতির রজস্তমোময়ী গুনরাগে রঞ্জিত হইয়া যায়।

ব্রজের সখ্য রতি প্রেমবিকাশের সপ্তম স্তর অর্থাৎ অনুরাগের প্রথম সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

দ্বাদশ তরঙ্গ।

বাৎসল্য প্রেম।

মহারাজ নন্দ এবং মহারাণী যশোদা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সন্তান বলিয়া মনে করিতেন। বাৎসল্য রসে পরিসিঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে নিজেদের সন্তান ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া তাঁহারা ধারণা করিতে পারিতেন না। সন্তানের কিসে মঙ্গল হয় এবং সন্তানকে কি প্রকারে প্রতিপালন করিতে পারা যায়, তাহাই তাঁহাদের অহর্নিশি চিন্তার বিষয়। অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণও সেই বাৎসল্য রসে অভিভূত হইয়া নিজের ভগবত্তা ভুলিয়া গেলেন। নন্দ মহারাজের পাদুকা লইয়া যেমন শিশুরা খেলা করে, সেই প্রকার তিনি মস্তকে বহন করিতেন। মা যশোমতীর স্তন পান করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন। গোপালের কত প্রকার আব্দার, সেই সব আব্দার, পূর্ণ করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। তাহাতে তাঁহাদের যে পরিমান আনন্দ জন্মিত, তাহার তুলনায় ব্রহ্মানন্দ অতীব তুচ্ছ বলিয় মনে হইত।

গোপাল একটু বড় হইয়াছেন, মা যশোমতী পুত্রকে ভালভাবে ভোজন করাইবার জন্য বহুবিধ ভোজ্য দ্রব্যের আয়োজন করিতেন। দুর্ব্বাসা ঋষির মুখে তিনি শুনিয়া ছিলেন যে শ্রীরাধিকার হস্তে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিলে তাঁহার পুত্রের আয়ুঃ বর্ধিত হইবে। তাই তিনি প্রতিদিন শ্রীমতীকে নিজ গৃহে আনয়ন করাইয়া তাঁহার দ্বারা পাক কার্য্য সমাধা করাইতেন।

এবম্প্রকারে ব্রজের বাৎসল্য প্রেম মধুর এবং উজ্জল হইয়া উঠিত। এখানেও যে পিতা নন্দ মহারাজ এবং মা যশোমতী শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ ঐশ্বর্য্য দেখেন নাই তাহা নহে। পুতন‌বধ, অঘাসুর, বকাসুর বধ, কালীয়দমন, মৃদভক্ষন লীলা, গিরি গোবর্ধন ধারণ প্রভৃতি যে সব অলৌকিক ঘটনাগুলি চক্ষের নিমিষে অত্যাশ্চর্য্য ভাবে সম্পাদিত হইল, তাহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন কিন্তু সেগুলি যে তাঁহাদের গোপালের কার্য্য সে জ্ঞান তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন, 'যাক্, আমাদের গোপালের কোনরূপে প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য।" তাই তাঁহারা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন যাহাতে তাঁহাদের

পুত্রের কোন প্রকার অনিষ্ট না হয়। সে কারণ মা যশোমতী কৃষ্ণের বাহুতে রক্ষা কবচ বাঁধিয়া দিতেন। পুত্র গোচারণে যাইবেন, তাঁহার ক্ষুধা পাইবে বলিয়া অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য বাঁধিয়া দিতেন এবং বলিতেন, বাবা ক্ষুধা পাইলে এসব খাস্। আর গোষ্ঠে বহু প্রকার বন্য জন্তু আছে, তুই তোর বলাই দাদাকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার পশ্চৎ পশ্চাৎ যাস্। দুরন্ত গোপ বালকদের সঙ্গে লড়াই করিস্ না। দুরন্ত গাভী হইতে সতর্ক থাকিস্। এই প্রকারে তাঁহাদের স্বাভাবিক বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বদা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

ব্রজের ঐশ্বর্য্যও আবার কি প্রকার মধুর। অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে দৈত্যকুল নিধন করিতে কত সমরায়োজনের প্রয়োজন হয়। কত সৈন্য সামন্ত গড়িয়া তুলিতে হয়। কিন্তু ব্রজধামের দৈত্য সংহার এক অভিনব ব্যাপার। চক্ষুর ইঙ্গিতেই যেন সমস্ত অসম্ভব ব্যাপার তড়িতের ন্যায় সম্পন্ন হইয়া গেল। এত বড় ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কিন্তু সব কিছুই যেন মাধুর্য্য মণ্ডিত। এসব যে তাহাদের শিশু-গোপালের কার্য্য তাহা কে বলিবে? কখন কখন এরূপ মনে হইত বটে, কিন্তু মাধুর্য্যের এমনি শক্তি যে তখনই তাঁহারা সব ভুলিয়া যাইতেন। তাঁহারা বলিলেন, 'যা হোক্ আর তা হোক্ কৃষ্ণ আমাদের পুত্র, পুত্র ব্যতীত সে আমাদের আর কিছুই হইতে পারে না।'

গর্গাচার্য্য আসিয়া যখন তাঁহাদের পুত্রের নামকরণ করিলেন, "কৃষ্ণ" তখন তিনি নন্দ যশোদাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "যে পুত্রটীকে তোমরা পাইয়াছ, তিনি সামান্য পুত্র নহেন, 'তিনি নারায়ণসমো গুণৈঃ' তিনি স্বয়ং ভগবান। তিনি পূর্ব্বে শুক্ল, রক্ত পীত প্রভৃতি বহু বর্ণে এবং বহু নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন তিনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তিনি কাহারও পুত্র হইতে পারেন না।" কিন্তু নন্দ যশোদা তাহাতে কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তর করিলেন, "আপনাদের কাছে কৃষ্ণ যা হোক্ আর তা হোক্, সে আমাদের কাছে পুত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাহার কিসে মঙ্গল হয় তাহা কেবল মাত্র আমরা জানি, অপর কেহ জানে না। তাহার কিসে মঙ্গল হয় এ জ্ঞান তাহারও নাই।" তাই মৃদ্ ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন।

মৃদ ভক্ষণ।

মৃদ্ ভক্ষণ লীলা, বাৎসল্য প্রেমের নিকট ভগবানের ঐশ্বর্য্য কিরূপে প্রতিহত হয় তাহারই নিদর্শন।

এক সময় বালক শ্রীকৃষ্ণ মৃদ্ ভক্ষণ করিলে মা যশোমতী তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়া তাড়ন ভৎ'সনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ সভয়ে উত্তর দিলেন,—'না মা, আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই।' তখন মা তাঁহাকে মুখ ব্যাদান করিতে বলিলেন। মুখ ব্যাদান করিলে মা যশোমতী শ্রীকৃষ্ণেব মুখে বিশ্ব চবাচর, ব্রজধাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং নিজেকেও তথায় দেখিলেন। এই প্রকার দর্শন করিয়া তাঁহার মনোমধ্যে সাময়িকভাবে প্রশ্ন জাগিল—একি কৃষ্ণের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য, না বিষ্ণুমায়া? তাহাতে সাময়িকভাবে তিনি অভিভূতা হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের লীলা শক্তি দেখিলেন যে যদি শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য রস আস্বাদন করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সে কারণ তিনি ঐশ্বর্য্য জ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করাইয়া মায়ের মনে ভাবান্তর আনাইয়া দিলেন। মা যশোমতী তখন বাৎসল্য প্রেমে আত্মহারা হইয়া এবং তৎসমুদয় ভুলিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনের সখ্য প্রেম শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন, ব্রজের কোন প্রেমে কি দাস্য, কি সখ্য কি বাৎসল্য, কি মধুব কোন স্থলে ঐশ্বর্য্যশক্তি স্বয়ং আবিভূর্ত হইয়া লীলারসকে ক্ষুন্ন করিতে পারে নাই। ইহাই ব্রজপ্রেমের বৈশিষ্ট্য।

সখাদেরও সেই প্রকার অভিমান ছিল যে কৃষ্ণ তাঁহাদের সখা ছাড়া আর কিছুই নয়। একদিন মধুমঙ্গল মা যশোমতীকে বলিলেন—"মা তোমার কৃষ্ণ কি একাই গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিল, সে কি একাই গোবর্দ্ধনধারী? আমরা যদি লাঠি সোটা লইয়া তাহাকে সাহায্য না করিতাম, তাহা হইতে সে কি একাকীই গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে পারিত?" "মা যশোমতী উত্তর দিতেন—"বাবা তোরা ঠিক বলেছিস্, গোপাল যে অতি দুর্ব্বল, সে কি কা..য়া গোবর্দ্ধন ধাবণ কবিতে পারে? ব্রজের দেবতা দয়া পরবশ হইয়া আমাদের রক্ষার্থ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন।" কিন্তু লোকে তা শুনিবে কেন? ব্রজের দেবতা কেবল মাত্র কৃষ্ণ, তিনিই গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি গিরিধারীলাল।

এইরূপে ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের '.অন্তরালে থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেন। মাধুর্য্যকে পরাভূত করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিতেন না। অবশ্য ভগবানের স্বরূপ ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য সম্বলিত, কিন্তু ঐশ্বর্য্য প্রকাশের বিচিত্র মধুর ভঙ্গি কেবল মাত্র ব্রজধামে লক্ষিত। এখানে ঐশ্বর্য্যের কোন বিভীষিকা নাই।

দাম বন্ধন।

মা যশোমতী দেখিলেন তাঁহার পুত্র দুষ্ট হইয়া পড়িতেছে, অতএব তাহাকে তাড়ন র্ভৎসন করিতে হইবে। তাঁহারা ব্যতীত তাহাকে আর কে দেখিবে? তাই মা যশোমতী পুত্রকে দণ্ডদ্বারা তাড়ন ভর্ৎসন এবং শেষ পর্য্যন্ত রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারিতেছেন না। যতবার বন্ধন করিতে যান, ততবাব রজ্জু দুই অঙ্গুলি ছোট হইয়া পড়ে। বাঁধিবার সময় গোপাল যেন কত ভীত এবং কত সন্ত্রস্ত হন। কিন্তু যেই রজ্জু দুই অঙ্গুলি ছোট হইয়া যায়, অমনি একটু আড় চোখে তাকাইয়া মুচকি হাসেন। মায়ের এমনি প্রগাঢ় অভিলাষ এবং অধ্যবসায় যে কৃষ্ণকে বাঁধিতেই হইবে, তাহাতে যত রজ্জু লাগে লাগুক্ না কেন। ব্রজে যেখানে যত রজ্জু ছিল, সব একত্র করা হইল। কিন্তু গোপাল আব বঁধা পডিতেছেন না। গো'পীগণ দামবন্ধন আগ্রহ ভরে দেখিতেছেন কিন্তু এত বড় আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছে, সে বিষয়ে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। কার্য্য কারণ নির্ণয় করিবাব অবকাশ মা যশোমতীরও নাই। তাঁহার একমাত্র আগ্রহ গোপালকে বাঁধা, তাহা যে প্রকারেই হউক না কেন।

কিন্তু কৃষ্ণকে যখন তিনি কোন প্রকারেই বাঁধিতে পারিলেন না, যখন তাঁহার সর্ব্ব কলেবর ঘর্ম্মাক্ত, দেহ ক্লান্ত, কেশদাম আলুলায়িত হইয়া পড়িল, তখন গোপালেব ভক্তবাৎসল্য গুণ আবির্ভূত হইল। মাধুর্য্য প্রকাশিত হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্য লুক্কা'য়িত হইল। তখন মা যশোমতী তাঁহার উদরে স্বীয় কুন্তলের সূক্ষ্ম রেশমী সূতার দ্বারা বন্ধন করিতে সমর্থা হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পূর্ব্বে যাঁহাকে বহুবিধ সুদৃঢ় রজ্জুব দ্বারা বন্ধন করিতে পারেন নাই, এখন তাঁহার কেশ বাঁধা সামান্য ফিতার দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং এমনি ভাবে তাহার সহিত একটী উদুখল সংযুক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিলেন যে গোপাল যাহাতে তাহা খুলিয়া ফেলিতে না পারে। সে কারণ তাঁহার নাম হইল দামোদর।

যোগীরা যাঁহাকে ধ্যানে আনয়ন করিতে পারেন না, মুনি ঋষিরা কঠিন তপস্যা করিয়া যাঁহার বৈভবের অন্ত পান না, শ্রুতিগণ যাঁহার দুর্বিজ্ঞেয় তত্ত্বের সন্ধান দিতে পারেন না, সেই কৃষ্ণ ভগবান হইয়াও মা যশোমতীর বাৎসল্য রস আস্বাদন করিবার জন্য উদুখলে বদ্ধ হইলেন এবং সেই বন্ধনের মধ্য দিয়া যমলার্জ্জুন ভঙ্গ এবং সেই বৃক্ষের মধ্য হইতে কুবের তনয় 'নলকুবর' এবং 'মনিগ্রীব' নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তি নিবন্ধন স্তব স্তুতিরূপ যে সব অলৌকিক কাণ্ড সংঘটিত হইল, তাহাতে কাহারও ভাব বৈলক্ষণ্য দেখা দিল না।

রজ্জু দুই অঙ্গুলি ব্যবধানের কারণ।

প্রত্যেকবার রজ্জু দুই অঙ্গুলি ব্যবধান হইবার কারণ সম্বন্ধে টীকাকারগণ পারমার্থিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভগবানকে পাইতে হইলে একদিকে চাই সাধকের আত্মশক্তি, অপরিসীম ধৈর্য্য উদ্যম অধ্যবসায়, প্রবল উৎকণ্ঠা এবং প্রগাঢ় অভিলাষ। অপরদিকে চাই ভগবানের কৃপাশক্তি। এতদুভয়ের সম্মেলনে ভগবৎপ্রাপ্তি সুলভ হয়। যেমন নৌকাকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে গেলে একদিকে দাঁড়টানার প্রয়োজন, অপরদিকে অনুকূল বায়ুরও প্রয়োজন। কিন্তু যখন স্বকৃত চেষ্টা সর্বপ্রকারে ব্যর্থ হইয়া যায় এবং নৈরাশ্যের ঘন কালোছায়া ঘিরিয়া আসে, তখন তাঁহার কৃপাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। তখন তাঁহার চরণে বিলাপ এবং আত্মজ্ঞাপন করিতে হইবে। কাতর কণ্ঠে দৈন্যসহকারে মর্ম্মান্তক বেদনায় ক্রন্দন করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে। অর্থাৎ সাধককে এই সকল ভক্তি অঙ্গের যাজন করিয়া উর্ধ্বে উঠিতে হইবে। ভক্তের দুঃখ এবং কষ্ট যখন ভগবানের কর্ণে গিয়া পৌঁছাইবে এবং তাঁহার হৃদয় বিগলিত করিতে পারিবে, তখন তাঁহার করুণাধারা আপনা হইতে ভক্তের উপর নামিয়া আসিবে। অর্থাৎ তিনিও তাঁহার উচ্চ সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিবেন। এই প্রকারে ভক্তের উঠা এবং ভগবানের নামা নিবন্ধন উভয়ের যোগসূত্র স্থাপিত হইবে।

রাসে পরিত্যক্তা ব্রজবধূগণ যখন তীব্র বিরহানলে দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে বৃন্দারণ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যাহাদিগকে সম্মুখে দেখিতেন, তাহাদিগকে ব্যাকুল হৃদয়ে প্রশ্ন করিতেন, "তোমরা কি বলিতে পার কৃষ্ণ কোথায়, তিনি কি এই পথ দিয়া গিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে দেখিয়াছ কি ?" এই প্রকারে অশ্বত্থ, বট, বকুল, আম কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষ রাজী হইতে আরম্ভ করিয়া লতা, গুল্ম, ওষধি পশু-পক্ষী প্রভৃত সকলকেই এই প্রশ্ন করিতেন— 'কৃষ্ণ কোথায় তোমরা তাঁহার সন্ধান দিতে পার কি ? কিন্তু যখন তাঁহারা তাহাদের নিকট হইতে কোন সাড়া পাইতেন না, তখন তাঁহারা তদ্গত চিত্তা হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় সুগভীর প্রেমের স্বভাবে তাঁহার লীলানুকরণ করিতে থাকিতেন। তাহাতেও কোন ফল হয় না দেখিয়া, নানাবিধ প্রলাপ বাক্য বলিতে থাকিতেন এবং এবং তৎপরে সমবেত কণ্ঠে সুস্বরে গভীর আবেগে যমুনা পুলিনে তাহার যশোগান করিতে করিতে এমনি ভাবে উচ্চরোলে ক্রন্দন করিতে থাকিতেন যাহাতে সমগ্রবনানী শোকে অভিাহত হইয়া পড়িত।

ভগবানকি তখন ধরা না দিয়া থাকিতে পারেন ? অমনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিনীত

ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার ভঙ্গী লইয়া, তাঁহার পীত বসনের অগ্রভাগ-কণ্ঠে ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রদত্ত বনমালা যাহা তখনও ম্লান হয় নাই, সেই মাল্যে বিভূষিত থাকিয়া স্মিতবদনে মদনমোহন রূপ প্রকটন করিয়া গোপী মণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"তাসা মাবির্ভূচ্ছৌরীঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বর ধরঃ গ্রগ্বীসাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩২।২)

রাসলীলার এই ঘটনা প্রতিপন্ন করে যে ভগবান তাঁহার ভক্তগণকে ক্ষণিকের জন্য দর্শন দান করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হন। তাঁহাদের যত্নশীলতা, তৎপরতা এবং উৎকণ্ঠা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত। গৃহস্থগণ যেমন তাহাদের হারান নিধি ব্যাকুল হৃদয়ে অন্বেষণ করে, সেই প্রকার ভক্তগণ তীব্র উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হন। গভীর বিরহানলে দগ্ধ হইয়া আর্তি এবং বিলাপের দ্বারা তাঁহার হৃদয় আর্দ্র করিতে থাকেন, যাহাতে তাঁহার করুণা ধারা তাঁহাদের উপর নামিয়া আসে। ভক্তিপ্রভাবে ভক্ত যখন উচ্চস্তরে আরোহন করেন তখন ভক্তবৎসল ভগবানও উচ্চশিক্ষা হইতে অবতরণ করিয়া ভক্তকে কৃপা করিয়া অঙ্গীকার করেন।

অতএব একদিকে ভক্তের ঐকান্তিক আগ্রহ অপর দিকে ভগবানের মহতীকৃপা এতদুভয়ের যুগপৎ সম্মেলনে ভক্তের সহিত ভগবানের মিলন ঘটে। রজ্জুর দুই অঙ্গুলি ব্যবধানের ইহাই মূলীভূত কারণ। অবশ্য ভগবানের কৃপাশক্তিই প্রধান। কারণ যাঁহাকে তিনি বরণ করিয়া লন, তাঁহারই তিনি লাল্য এবং পাল্য হন। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" (মণ্ডুক শ্রুতি।) শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি—'পোষণং' অর্থাৎ তদনুগ্রহ।

কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার কৃপাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চাই সাধকের প্রগাঢ় অভিলাষ এবং তীব্র উৎকণ্ঠা।

দাম বন্ধন লীলার মধ্যে শ্রীভগবানের অপূর্ব ভক্তাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। মা যশোমতীর হস্তে ধৃত হইয়া তিনি অবশেষে তাঁহার সূক্ষ্ম কেশদামের দ্বারা উদরে বন্ধন স্বীকার করিলেন। মা যশোমতীর অপূর্ব বাৎসল্য প্রেম বিভু ভগবানকে বাঁধিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাৎসল্য প্রেমে অভিভূত হইয়া ভগবান তখন তাঁহার লাল্য এবং পাল্য হন। তিনি যে সর্বধারক এবং সর্বপালক একথা সর্বশাস্ত্রে গীত, কিন্তু সেই ভগবান সর্বধারক এবং সর্ব্ব পালক হইয়া যে লাল্য এবং পোষ্য হন একথা ভাগবত ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমন্মাহাপ্রভুর অনুগৃহীত বৈষ্ণবগণ যেভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা

অপর কেহই বিশেষভাবে বলিতে পারেন নাই। যিনি অনন্ত এবং বিভু তিনি প্রেমের নিকট হন ক্ষুদ্র। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"অনোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"

রসবিচারের দিক হইতে অর্থ

"স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়াঃ বিস্রস্ত কবরস্রজঃ
দৃষ্টা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥" (ভাঃ ১০।৯।১৮)

শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকের শ্রুত্যর্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার এবম্প্রকার অবস্থা দেখিয়া পরিশেষে কৃপা করিয়া তাঁহার হস্তে বন্ধন স্বীকার করিলেন। ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেহ তাঁহাকে বাধিতে পারে না। তাঁহার কৃপাশক্তিই তাঁহাকে বন্ধন করিবার মূল কারণ। এ সম্বন্ধে পূর্বে বিশদভাবে অনুশীলন করা হইল। তত্ত্বের দিক হইতে ইহা সত্য কিন্তু লীলার দিক হইতে ইহা রসগ্রাহ্য নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণরস নির্য্যাস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত ব্রজলীলার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। ভগবত্তার আশ্রয় লইয়া ব্রজরস আস্বাদন করিলে তাহা রসপুষ্টির অনুকূল হয় না। সে কারণ বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইলেও তাহা লীলাস্বাদনের ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না বরং লীলারস পুষ্টির অনুকূল হয়।

সে কারণ রসতত্ত্ববিদ্‌গণ বিচার করিয়া দেখিলেন যে কৃষ্ণের কৃপাশক্তি যদি বন্ধনের একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে বাৎসল্য রসক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে মাতৃত্বের আসনে বসাইয়াছেন, তাঁহার আসননিশ্চয়ই কৃষ্ণ অপেক্ষা উর্দ্ধে থাকিবে। নতুবা লীলারস মাধুর্য্য লাঘব হইয়া পড়িবে। রসের দিক দিয়া তাঁহারা অর্থ করিলেন যে যশোদা স্বয়ং কৃপা করিয়া পুত্রের কল্যানার্থ তাহাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাহার উদর রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন। কৃপয়া শব্দটির মোর ঘুরাইয়া দিয়া 'তস্যাঃ কৃপয়া' (অর্থাৎ মায়ের কৃপার দ্বারা) এইরূপ অর্থ করিয়া তাঁহারা মাতৃত্বের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিলেন এবং তদ্দ্বারা বাৎসল্য রসের পুষ্টি বিধান করিলেন।

তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাতৃভাব এবং পুত্রভাব একত্র সম্মিলিত না হইতেছিল। অর্থাৎ যতক্ষন পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যের আভা বাৎসল্য রতিকে কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন করিতেছিল অথবা মায়ের গোপালকে বাঁধিবার আগ্রহ এবং গোপালেরও বন্ধন-সুখ-লাভের আগ্রহ প্রবল হইতে প্রবলতর না হইতেছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বন্ধনও দুই অঙ্গুলি করিয়া শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু যখন উভয়কার পারস্পরিক সম্বন্ধবোধ (মাতৃবোধ এবং পুত্রবোধ) সুদৃঢ় হইল, তখন মায়ের কবরীবন্ধের সূক্ষ্ম এবং

ক্ষীণ রেশমী ফিতা কৃষ্ণের উদরকে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিল। রসজ্ঞ বিচারকগণ-এই প্রকার অর্থ করিয়া বাৎসল্য প্রেমের মহিমোজ্জলতা প্রদর্শন করিলেন।

এতদ্বারা প্রমানিত হইল যে কৃষ্ণ মাতৃবৎসল এবং প্রকারান্তরে ভক্ত বৎসল। ভগবত্তাব প্রাধান্য দিয়া যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহাদিগের নিকট ভগবৎকৃপা মুখ্য এবং লীলা কাহিনী গৌণ। কিন্তু রসের দিক দিয়া যাঁহারা দেখেন, তাহাদের নিকট মাতৃবৎসল্য মুখ্য এবং তাত্ত্বিক বিচার গৌণ। আচার্যগণ লীলাকে প্রথম স্থান দিয়াছেন এবং তদনুকূলে তাত্ত্বিক বিচার করিয়াছেন। ভগবত্তাব দ্বারা রসের বিচার হয় না। আর যাঁহারা লীলাকে রূপক বলে মনে করেন, তাঁহারা লীলা রসপানে বঞ্চিত হইয়া শুষ্ক জ্ঞান আহরণ করেন।

পরিশেষে মনে হয় যদি 'কৃপয়া' শব্দের অর্থ 'অনায়াসেন' করিতে পারা যায়, তাহা হইলে হয়তো সব বিরোধ মিটিয়া যায়। তখন তাহার অর্থ দাঁড়ায় যে যখন পারস্পরিক সম্বন্ধ জ্ঞান যথাযথ ভাবে অনুভূত হইল তখন বন্ধন অনায়াসে সিদ্ধ হইল। যাহা হউক, উপরের অর্থ কষ্ট কল্পিত অর্থ বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু রসাস্বাদনে ইহার বিশেষ মূল্য আছে।

রাধা দামোদর

পক্ষান্তরে ভবিষ্যোত্তর পুরাণে বর্ণিত আছে যে শ্রীরাধা তাঁহার প্রিয়তম অচ্যুত তাঁহার নিকট হইতে প্রায়ই চ্যুত হন বলিয়া প্রনয় রোষে ভ্রুকুটি ভঙ্গি সহকারে তাঁহার নীবিবন্ধ হইতে স্বর্ণ যাঞ্চি অপসারিত করিয়া তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদর বন্ধন করিয়াছিলেন। সে কারণ তাঁহার অপর নাম রাধা দামোদর। ইহাও কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যাঁহারা মধুর রসের উপাসক তাহারা রাধা দামোদর ধ্যান করেন।

এখানকার আরও বিশেষত্ব এই যে শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে গিয়া মা যশোমতীর রজ্জু যেমন প্রত্যেকবার দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইতে লাগিল, রাধার কাঞ্চিদাম কিন্তু একটুও ন্যূন হয় নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে শ্রীরাধার হস্তে বন্ধন স্বীকার করিলেন। ইহা শ্রীরাধার মধুরারতিজাত বিভু প্রেমের অদ্ভুত মহাশক্তি। শ্রীরাধার বিভুপ্রেমের সম্মুখে বিভু ভগবানের ঐশ্বর্য্য স্তম্ভিত হইয়া যায়, কোন প্রকার প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহার বহু বহু নিদর্শন আছে। এতদ্বারা মধুরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

মহারাজ পরীক্ষিত নন্দ যশোদার ভাগ্যাতিশয্য দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং মনে করিলেন, নন্দ মহারাজ এবং যশোদামাতা কি করিয়া বিভুতত্ত্ব ভগবানকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন। তাই তিনি বিস্ময় সহকারে শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিলেন ;—

"নন্দ কি মকরোদ্ ব্রহ্মণ! শ্রেয় এব মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাস্তনং হরিঃ॥" (ভাঃ ২'৮।১৫)

হে মুনে! নন্দ মহারাজ এমন কি পুণ্য কর্ম করিয়াছিলেন, যদ্বারা তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন? আর মহাভাগা যশোদাই বা এমন কি মঙ্গলজনক কর্ম করিয়াছিলেন, যাহার ফলে শ্রীহরি তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া স্তন্য পান করিয়াছিলেন?

ধরা দ্রোণউপাখ্যান

মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বিশেষ সন্তুষ্ট হন নাই। সে কারণ তিনি কিঞ্চিৎ ঔদাসীণ্যপ্রকাশ করিয়া ধরা দ্রোণউপাখ্যানটি বিবৃত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে অষ্টবসুর মধ্যে শ্রেষ্ঠবসু দ্রোণ এবং তৎপত্নী ধরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য উগ্রতপস্যা করিয়াছিলেন এবং প্রকারান্তরে ব্রহ্মার নিকট সেই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহারা ব্রজধামে নন্দ যশোদা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রকার উপাখ্যান সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহা যথার্থ উত্তর নহে। যেরূপ পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করিয়াছিলেন সেই প্রকার উত্তর তিনি দিয়াছিলেন।

নন্দ মহারাজা এবং যশোদা মাতা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পরিকর। সাধন সিদ্ধ নহে। বাৎসল্য রস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ গত সন্ধিনী শক্তি নন্দ যশোদারূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া অনাদি কাল হইতে বিরাজিত। ভগবানকে ধারণ করিতে পারে একমাত্র তাঁহার সন্ধিনীশক্তি। মা যশোমতী এবং বাবা নন্দ তাঁহারাই কেবল রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী এবং তৎপ্রভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্য রসে অভিষিক্ত করিতে পারেন। তাঁহাদের অনাদিকালসিদ্ধ অভিমান যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জনক জননী। কোন সুকৃতির ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পান নাই।

সে কারণ পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাহা নাকচ করিয়া দিয়া দাম বন্ধনলীলার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন ;—

"নেমং বিরিঞ্চো-ন ভবো শ্রীরপ্যঙ্গ-সংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥" (ভাঃ ২।৮।১৬)

বিমুক্তি দাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে গোপী যশোদা যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, সে প্রসাদ ব্রহ্মা লাভ করিতে পারেন নাই, শঙ্কর লাভ করেন নাই, এমন কি তাঁহার বক্ষঃ বিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মী দেবীও পান নাই। ইহা নন্দ যশোদার সৌভাগ্যাতিশয্য।

তাহা হইলে, ব্রহ্মা স্বয়ং যে প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই, সে প্রকার বর দিবার মত তাঁহার সামর্থ্য কোথায়?

সাধারণের ধারণা ধরা দ্রোণ উগ্র তপস্যা করিয়া ব্রজে নন্দ যশোদা রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যেমন বসুদেব দেবকী পূর্বজন্মে তপস্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্য প্রেম নিত্য বর্তমান থাকে, ইহা সাধন লভ্য নহে! তবে ধরা দ্রোণ উপাখ্যানের মীমাংসা বৈষ্ণবগণ এই প্রকারে করিয়াছেন যে ধরা এবং দ্রোণ বাৎসল্য রসে অভিভূত ছিলেন। সে কারণ দ্রোণ বাৎসল্য রসের আধার নন্দ মহারাজার অংশ এবং ধরা শ্রীমতী যশোদা মাতার অংশ। নন্দ যশোদা যখন ব্রজধামে স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তাঁহাদের অংশ ধরা এবং দ্রোণ স্বরূপ শক্তি বিলাসের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া তাঁহাদের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তন্মধ্য দিয়া শুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমরস আস্বাদন করিয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম, পিতামাতা তাঁহার সন্ধিনী শক্তির বিকার।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য। (শ্রীকৃষ্ণনন্দন এবং যশোদানন্দন।)

অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণ যখন কংস কারাগারে দেবকী গর্ভে জন্মলীলার অভিনয় করিলেন, তখন তিনি শঙ্খ, চক্র গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজাকৃতি ঐশ্বর্য্যাত্মক মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া নারায়ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐ প্রকার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিয়া দেবকী বসুদেব মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহাদের পুত্রকে ভগবদ্‌জ্ঞানে অশেষ বিশেষ স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। কোথায় রহিল লাল্য লালক সম্বন্ধ। বাৎসল্যপ্রীতি ঐশ্বর্য্যের কবলে কবলিত। তাঁহারা তাঁহাকে বাৎসল্য রসের দ্বারা পরিপুষ্ট করিতে পারিলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পূর্ব পরিচয় এবং তাঁহাদের সাধনার কথাও জানাইয়া দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন, 'তোমরা কংস ভয়ে ভীত হইয়াছ এবং আমাকে ভগবান বলিয়া জানিতে পারিয়াছ। অতএব অবিলম্বে আমাকে গোকুলে লইয়া গিয়া মা যশোদার প্রসূতি গৃহে রাখিয়া আইস। সেখানে দেখিবে আমার এক অনুজা ভগিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহাকে এইস্থানে লইয়া আইস, আর আমাকে মা যশোমতীর ক্রোড়ে স্থাপন কর। তোমরা আমাকে ধরিয়া রাখিয়া প্রীতিলাভ করিবে না এবং আমাকেও প্রীত করিতে পারিবে না, যেহেতু তোমরা আমাকে ভগবান বলিয়া জানিয়াছ। সম্ভ্রম এবং

সঙ্কোচের দ্বারা কখন পুত্রকে লালন পালন করিতে পারা যায় না। আমি মা যশোমতীর স্তন্য পান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি।" বসুদেব এবং দেবকীও পূর্বজন্মে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য আরাধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ভগবানকে পুত্ররূপেই পাইয়াছিলেন তবে ঐশ্বর্য্যাত্মক রূপে। সে কারণ ভগবত্তা জ্ঞানের আতিশয্যে তাঁহারা তাঁহাকে লালন পালন করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ পূর্বক পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া নিজেকে 'যদুনন্দন' বা 'দেবকীনন্দন' বলিয়া জগতে পরিচিত করাইলেন। ইহাই তাঁহাদের তপস্যার ফল। বসুদেবের আর এক সৌভাগ্য এই যে তিনি ভগবানকে স্বীয় অঙ্কে বহন করিয়া গোকুলে লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

হরি বংশ হইতে জানিতে পারা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ যখন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে কংস কারাগারে আবির্ভূত হইলেন ঠিক সেই সময়ে তিনি নন্দালয়েও যশোদা মাতার অষ্টমগর্ভে অষ্টমীতিথির শেষভাগে দ্বিভুজ নররূপে জন্ম প্রকটন করিয়াছিলেন। পুত্র-সন্তান হইবার পর মা যশোমতী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। তখন নন্দালয়ের সকলেই গভীর যোগ নিদ্রায় অভিভূত। কাহারও কোন প্রকার সংজ্ঞা ছিল না। তৎপরে নবমী তিথিতে মা যশোদা একটী কন্যা প্রসব করিলেন। তিনি ভগবতী মহামায়া।

মা যশোমতী এতই অচৈতন্য অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার একটী কন্যা হইয়াছে এ জ্ঞান তাঁহাব ছিল না। বসুদেব যখন নন্দালয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পুত্রকে মা যশোদাব গৃহে স্থাপন করিতে যান, তখন অলক্ষিতে যশোদানন্দন অচিন্ত্য শক্তি বলে তাঁহাব বিলা: মূর্ত্তি দেবকী নন্দনকে আত্মসাৎ করিয়া দ্বিভুজ মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত করিলেন। অংশ অংশীর সহিত মিশিয়া গেলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ মা যশোমতীর পালিত পুত্র নহেন কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

"নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গায়।
সেই কৃষ্ণ নদীয়ার চৈতন্য গোঁসাই॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণ নন্দসুত এবং নন্দ' ম্ন'। শ্রীচৈতন্য দেব যখন নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন তখন শ্রীবল্লভাচার্য্য নামক এক দার্শনিক পণ্ডিত—নিজ পাণ্ডিত্য প্রভাবে কৃষ্ণনামের বহু অর্থ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তাহাতে ঈষৎ রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন. যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ;—

"শ্রীকৃষ্ণনামের বহু অর্থ আমি নাহি মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি॥" (৩।৭।৭০)

শ্রীকৃষ্ণ রূঢ়ার্থে শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন। অপরাপর অর্থ অস্বীকার্য্য। এখানে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে এই সকল বচনানুসারে—শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি লুক্কায়িত করিয়া দ্বিভুজ মূর্ত্তি হইলেন, সে সম্বন্ধে তিনটী চলিত মতবাদ আছে। (১)কাহারও কাহারও মতে দেবকী বসুদেব যখন ভগবানের ঐশ্বর্য্যাত্মকরূপ সহ্য করিতে না পারিয়া বিবিধ স্তব স্তুতির মধ্য দিয়া তাঁহাকে ঐশ্বরিক রূপ সংবরণ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি দ্বিভুজ মূর্ত্তি প্রকটিত করিলেন। যেমন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে মানুষী রূপ গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই প্রকার। (২)অপর পক্ষের মতে, বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া যমুনা পার হইতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ যমুনাকে কৃপা করিবার ছলে যমুনার জলে নিপতিত হইয়াছিলেন এবং বসুদেব যখন তাঁহাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি দেখেন তাঁহার দ্বিভুজ মূর্ত্তি। অবশ্য একথা বলিতে পারা যায় যে গোকুলে বা বৃন্দাবনে ভগবানের ঐশ্বরিক রূপ আবৃত থাকে। বৃন্দাবন শুদ্ধ মাধুর্যময়, সে কারণ বৃন্দাবনে উপনীত হইবার প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণের অপর দুইখানি হস্ত অন্তর্হিত হইয়াছিল। (৩) আর এক পক্ষ বলেন, বসুদেব যখন নন্দালয়ে গিয়াছিলেন তখন শিশু কৃষ্ণ তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ভুজরূপী নারায়ণকে আত্মসাৎ করিয়া দ্বিভুজ মূর্ত্তিতেই বিরাজিত রহিলেন।

যাহা হউক ব্রজের বাৎসল্য রতি এবম্প্রকার যে তাহা ভগবানের ঐশ্বর্য্যের উত্তাপে শুষ্ক হয় না। তাঁহারা তাঁহাকে আপনার করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারেন। তাড়ন ভর্ৎসন এবং রজ্জুর দ্বারা বন্ধন, সন্ধিনী শক্তি রূপা মা যশোদার দ্বারা কেবল সম্ভব হয়। তাই বৈষ্ণবভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে—**নন্দদুলাল** বা **যশোদাদুলাল** বলিয়া সম্বোধন করিয়া যে প্রকার আনন্দ লাভ করিতে পারেন অন্যপ্রকার সম্বোধনে সে প্রকার আনন্দ লাভ করিতে পারেন না। এখানে আর একটী কথা বলিবার আছে। মা যশোদার আর একটী নাম ছিল **দেবকী** এবং নাম সাম্যে তাঁহার সহিত বসুদেব পত্নী দেবকীর মিতালী ছিল। সে কারণ শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীনন্দন বলিলেও যশোদা নন্দনকেই বুঝায়। বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গোবিন্দভাষ্যে লিখিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ যশোদাস্তনন্ধয়ত্ব স্বভাব কুত্রাপি পরিহার করিতে পারেন না। এ স্বভাব তাঁহার নিত্য।

উপসংহার

উপসংহারে এই কথাই বলিতে হয় যে অপ্রাকৃত বাৎসল্য প্রেমের এক কণিকা

জগতে পতিত হইয়া অপত্য স্নেহে পরিণত হইয়াছে। তাই মাতৃস্তনে দুগ্ধ ধারা ক্ষরিত হইয়া শিশু সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ, পিতার ভালবাসা অপ্রাকৃত লোকের আভাস। প্রত্যক্ষবাদি দার্শনিকগণ মনে করেন যে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কেবলমাত্র সত্য, অপ্রাকৃত লোক বলিয়া কিছু নাই; ইহা কল্পনা মাত্র এবং যদিই বা কিছু থাকে তাহা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। কিন্তু তত্ত্বান্বেষী পণ্ডিতগণ ইহার বিপরীত ধারণা পোষণ করেন। এমনকি কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত এজগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা বলেন, এ জগৎ নশ্বর হইতে পারে কিন্তু মিথ্যা নহে, সত্য, এবং তাহার সত্যতা অপ্রাকৃত জগতের উপর নির্ভরশীল।

ভগবানকে পিতৃমাতৃরূপে আরাধনা করা স্বাভাবিক এবং প্রায় সর্ব ধর্মের মধ্যেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুত্ররূপে তাঁহাকে ভজনা করা অতীব বিচিত্র এবং অভিনব। ইহা কেবল ভাগবৎ ধর্মের মধ্যে নিহিত। একমাত্র বৈষ্ণবগণ ব্রজানুগতি লাভ করিয়া স্বীয় ভাবানুকূল্যে ভগবানকে পুত্ররূপে ভজনা করেন। স্নেহ সর্বদা নিম্নগামী। পুত্রের উপর পিতামাতার যে প্রকার স্বাভাবিক স্নেহ থাকে, পুত্রের পিতামাতার উপর সে প্রকার প্রগাঢ় স্নেহ থাকিতে পারে না। সে কারণ প্রগাঢ় স্নেহভরে ফল কামনা পরিত্যাগ পূর্বক, যদি ভগবানকে বাৎসল্য রসে ভজনা করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সন্ধিনীশক্তিরূপা নন্দযশোদার বাৎসল্যপ্রেমের অনুগত হইয়া বালগোপালরূপে ভজনা করা বিধেয় এবং তাহাই নিষ্কাম ভজন। এ সাধনায় ভগবান হন দুর্বল এবং প্রেমিক ভক্ত হন সবল। দুর্বলের সেবার মধ্যে কোন স্বার্থ গন্ধ থাকিতে পারে না। তাই এ প্রকার ভজন নিষ্কাম এবং উন্নত। এ ভজনে একমাত্র স্নেহ ও মমতার আধিক্য।

এ প্রকার ভাব গ্রহণ করাও সুদুষ্কর। সে কারণ বৈষ্ণব সাধনা তাঁহাদেরই শোভা পায়, যাঁহাদের চিত্তে প্রেমভক্তির উদয় হইয়াছে। সাধনার প্রভাবে মনের সর্বপ্রকার মলিনতা দূরীভূত হইয়া চিত্ত উজ্জ্বল এবং নির্মল হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বের সহিত যখন তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় তখনই বৈষ্ণবসাধনা সম্ভব। বৈষ্ণবসাধনার মূল ভিত্তি প্রেম। প্রেম লক্ষণা ভক্তি লাভ করা সুদুষ্কর। কর্ম যোগ এবং জ্ঞানে যে ভক্তি মিশ্রিতা থাকে তাহা সুলভ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তিলাভ জন্মজন্মান্তর সাধনা করিয়াও মিলে না। ভক্তি রসামৃত সিন্ধু বলিয়াছেন,—'হরিভক্তি সুদুর্লভা।' হরিভক্তি অর্থে, প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে বুঝায়। ইহা বহু সাধনা করিয়াও পাওয়া যায় না অথচ কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহা অনায়াস লভ্য হইয়াছে।

ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, মনে হয় ইহার একমাত্র কারণ তাঁহার অহৈতুকী-কৃপা। জীবের জীবত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইলেও স্বরূপ শক্তির কৃপা ব্যতীত কেহ ব্রজানুগতি লাভ করিতে পারেন না। তবে জীবের একান্ত প্রযত্নশীলতা এবং অনুরাগের প্রয়োজন। উভয়ের সংমিশ্রনে সচ্চিদানন্দ ঘন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দাম বন্ধন লীলা হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ কবি।

ব্রজের বাৎসল্য প্রেম রতি বিকাশেব সপ্তম স্তরের অর্থাৎ অনুরাগেব শেষ সীমা পর্য্যন্ত বর্ধিত হয়।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

মধুরা রতিজাত প্রেম

বা

সমর্থা রতিজাত প্রেম

ব্রজের পূর্ব্বোক্ত রতি-সমূহের আলোচনা করিলে দেখা যায় যদিও প্রত্যেকটি রতির মধ্যে কৃষ্ণবশীকরণ ক্ষমতা রহিয়াছে, তথাপি সকল রতির মধ্যে বশীকরণ সামর্থ্য সম পরিমানে নাই। পূর্ব্বোক্ত রতি তিনটি সম্বন্ধানুগা। সে কারণ তাঁহারা নিজ নিজ সম্বন্ধানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া থাকেন। কোন সময়ে স্বীয় সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণকে আনন্দ দান করিতে পারেন না। দাস্য প্রেমের মধ্যে গৌরব, শঙ্কা এবং কুণ্ঠা বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক। সখ্য প্রেমের মধ্যে সম ভাবাপন্ন বিশ্রম্ভময় সেবা আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণকে তাড়ন ভর্ৎসন করিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা গুরুজন নহেন। বাৎসল্য প্রেমের মধ্যে উক্তপ্রকার অভাব তিরোহিত। উপরন্তু বাৎসল্য প্রেমের স্বভাবের মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহা পূর্ব্বোক্ত রতিদ্বয়ের মধ্যে নাই। ইহাদের প্রত্যেকটি কৃষ্ণ যাহাতে সুখী হন সেই প্রকার বুঝিয়া সুঝিয়া কৃষ্ণকে সেবা করেন। কিন্তু বাৎসল্য প্রেম এমনি উন্নত স্তরে প্রতিষ্ঠিত যে কৃষ্ণ সুখী হউক আর নাই হউক, কৃষ্ণ তুষ্ট হউক আর রুষ্ট হউক সে সব বিবেচনা বাৎসল্য রতির মধ্যে নাই। কারণ তাঁহারা মনে করেন কৃষ্ণ অবোধ বালক, তাহার ভাল মন্দের জ্ঞান কি করিয়া থাকিতে পারে? আমরাই কেবল তাহার কিসে শুভ হয় এবং কিসে অশুভ হয় তাহা সম্যকরূপে জানি। সে কারণ তাঁহারা কৃষ্ণকে কখন তাড়নভর্ৎসন এবং কখন দৌরাত্ম্যের জন্য উদূখলে বন্ধন করিয়া থাকেন। ব্রজের বাৎসল্য রস পান করিবার জন্য ভগবান হন যশোদা দুলাল বা নন্দ দুলাল।

ক্রম বিকাশের স্তরের মধ্যে দেখা যে দাস্য প্রেম রাগ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। সখ্য প্রেম অনুরাগের প্রথম সীমা পর্য্যন্ত উন্নীত হয়। বাৎসল্য প্রেম অনুরাগের সীমান্তে গিয়া পৌছায। কিন্তু প্রেম বিকাশের অপর দুইটি স্তর অবশিষ্ট আছে যাহা এই রতিত্রয়ের মধ্যে নাই। সেই দুইটি স্তর ভাব এবং মহাভাব এবং তাহা কেবল মধুরা রতিতে পরিলক্ষিত হয়।

মধুরা রতিসর্বরসের সমাশ্রয়

মধুরা রতিতে কি দাস্য, কি সখ্য, কি বাৎসল্য সকল প্রকার গুণ বিদ্যমান আছে, উপরন্তু তাহার নিজস্ব বিশেষ গুণও আছে। চৈতন্য চরিতামৃতকার উদাহরণ স্বরূপ লিখিয়াছেন,

"আকাশাদির গুণ যত পর পরভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥"

আকাশের গুণ শব্দ। এই গুণ বায়ুতেও আছে কিন্তু এতদ্ব্যতীত বায়ুর আর একটি গুণ আছে তাহা স্পর্শ এই অতিরিক্ত গুণ নিবন্ধন আকাশের সহিত বায়ুর বৈশিষ্ট্য। এইরূপে অগ্নির মধ্যে শব্দ এবং স্পর্শ গুণ-ব্যতীত তাহার অপর একটি গুণ আছে তাহা রূপ। জলের শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ এই গুণ-ত্রয় ছাড়া তাহার আর একটি গুণ রহিয়াছে তাহা রস। আর সর্বোপরি পৃথিবীর মধ্যে উক্ত চারিটি গুণ যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস তো বিদ্যমান আছে, তদুপরি তাহার অপর একটি অতিরিক্ত গুণ রহিয়াছে, ইহা গন্ধ। অতএব পৃথিবীর মধ্যে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ এই পঞ্চবিধ গুণ এককালীন বর্তমান।

সেই প্রকার মধুরে শান্তাদি চতুর্বিধ রতির গুণ, যথা শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসংকোচ ভাব এবং বাৎসল্যের লালনাদি গুণ বিদ্যমান আছে, উপরন্তু তাহার অপর একটি নিজস্ব গুণ রহিয়াছে, যাহা অপরাপর রতির মধ্যে নাই। সে কারণ অপরাপর রতি অপেক্ষা মধুরের উৎকর্ষ। ইহা সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অশেষ বিশেষ ভাবে সেবা বিধান। মধুর রসকে পরমোজ্জ্বলরস বলা হয়। ইহা মূল রস। কোন কোন পণ্ডিত একথাও বলিয়াছেন যে মধুরা রতির পঞ্চগুণের এক একটি উপাদান লইয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য রতির সৃষ্টি হইয়াছে।

মধুরা রতির মধ্যে ভাব এবং মহাভাবের অপূর্ব পরাকাষ্ঠা থাকায় মধুরা রতিই সর্বোত্তম। ভাব এবং মহাভাব যখন বিভাব এবং অনুভাবাদির দ্বারা সংযুক্ত হয় তখন তাহা রসে পরিণত হয়। তখন স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ অনুরাগ প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব স্তরগুলি এমনি ভাবে অনুরঞ্জিত এবং উপরঞ্জিত হইয়া যায় যে তাহা হইতে অশেষ বিধ প্রেম বৈচিত্র্যের সৃজন হয় এবং তাহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম আস্বাদ্য হইয়া উঠে। প্রেমের প্রত্যেকটি স্তর তখন মধুর রসের সংস্পর্শে আসিয়া নব নব রূপে প্রকাশিত হয়।

কামানুগা

ব্রজের মধুরা রতি কামানুগা, সম্বন্ধানুগা নহে। যদিও গোপীগণের প্রেম

স্বাভাবিক কামগন্ধবিহীন এবং দগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় শুদ্ধ, নির্ম্মল এবং উজ্জ্বল, তথাপি গোপ রামাদিগের প্রেমকে কাম বলিবার প্রথা আছে। ভক্তি রসামৃত সিন্ধু বলেন,

"প্রেমৈব গোপরামানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতংবাঞ্ছন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ॥ (পূঃ বিঃ ২ লহরি ১৪৩-১৪৪)

ইহা প্রাকৃত কাম নহে, কাম ক্রীড়া সাম্যে ইহা কাম নামে অভিহিত।

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম ক্রীড়া সাম্যে তাহার কহি কাম নাম।"
(চৈঃ চঃ ২।৮।১৭৪)

ইহা যে প্রাকৃত কাম নহে তাহার প্রমাণ ভক্তি রসামৃত সিন্ধু শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ হইতে বুঝা যায়। উদ্ধবাদি শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ ব্রজকান্তাগণের এই প্রকার কাম বা প্রেম পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতএব ইহা যদি প্রাকৃত কাম হইত তাহা হইলে ভগবানের প্রিয় ভক্তগণ কখন তাহার জন্য লালায়িত হইতেন না বরং হেয়জ্ঞান) করিতেন।

ব্রজের মধুরা রতি কামানুগা হওয়ায় অপরাপর রতির ন্যায় ইহার কোন বন্ধন নাই। অশ্বের রশ্মি যদি শ্লথ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে অশ্ব যেমন তাহার সামর্থ্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দৌড়াইতে পারে, সেই প্রকার এই রতিরও অবাধগতি—মুক্ত প্রগাঢ়বৃত্তি। ধর্মাধর্মের দিকে লক্ষ্য নাই, শুভাশুভ বিচার নাই, নিজসুখ বাঞ্ছা নাই, আছে কেবল প্রিয়তমের প্রতি অসীম মমতা, প্রগাঢ় ভালবাসা, প্রেমিকের জন্য সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রিয়তমের অশেষ বিশেষ সেবা। ইহা কামানুগার প্রকৃতি। কামানুগার ধর্ম এই যে ব্রজকান্তাগণের কাম বা প্রেম প্রথম এবং তাঁহাদের কাম বা প্রেম প্রিয়তমের সেবার প্রবর্ত্তক। সম্বন্ধানুগার ধর্ম সম্বন্ধ প্রথম এবং তদনুযায়ী স্ব স্ব-প্রেমানুসারে সেবা। উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। তাই ব্রজরামাগণের প্রেম জগতে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। গোপীগণের প্রেম মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়া 'গোপী প্রেমামৃতে' উক্ত হইয়াছে,

"সহায়াঃ গুরবঃ শিষ্যাঃ ভুজিষ্যাঃ বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন।"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি গোপীকারা আমার যে কি হন এবং কি না হন তাহা আমি বলিতে পারি না। তাঁহারা প্রিয় বন্ধুর ন্যায় আমার সাহায্য করেন। তাঁহারা আমার লীলার উপকরণ। তাঁহারা গুরুর ন্যায় আমাকে উপদেশ করেন আবার শিষ্যের ন্যায় আমার আজ্ঞানুবর্তিনী

হন। দাসীর ন্যায় আমার সেবা করেন, বন্ধুর ন্যায় আমার সহিত প্রীতি ব্যবহার করেন এবং আমাকে পতিজ্ঞানে পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় আচরণ করেন। অতএব তাঁহারা আমার সর্বস্ব। ইহা হইতে বুঝা যায় যে মধুরা রতিজাত প্রেমে সর্ব প্রকার ভাব নিহিত আছে।

গোপী প্রেম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আদি পুরাণে বর্ণিত আছে,—

"নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি পর্য্যুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং নমে পার্থ নিগূঢ় প্রেম ভাজনম্॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥"

(লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ৪০শে উদ্ধৃত)

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিলেন, 'হে অর্জুন! গোপীগণ তাহাদের নিজ দেহও আমার সেবার উপকরণ বলিয়া মনে করে। সে কারণ তাহারা নিজ নিজ দেহকে ভালবাসে এবং নানাবিধ বেশ ভূষাদির দ্বারা সজ্জিত করে। তাহাদের ন্যায় আমার প্রিয় পাত্র আর কেহই নাই। গোপীগণ আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আমার মনোগত ভাব সকলই জানে। তাহারা ব্যতীত আর কেহই আমার মাহাত্ম্য অবগত নহে।

যদিও অন্যান্য কান্তাগণ অপেক্ষা ব্রজ গোপীগণের প্রেম শ্রেষ্ঠ, তথাপি ব্রজ-গোপীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সর্বকান্তা শিরোমণি শ্রীরাধার প্রেম সর্ব শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধার সর্বাতিশায়ী প্রেমের মাহাত্ম্য সর্বশাস্ত্রে কীর্তিত আছে। মধুরা রতির যে চরম উৎকর্ষ, তৎসমুদয়ের ঐকান্তিক স্থিতি কেবলমাত্র সর্ব নায়িকার শিরোভূষণ শ্রীরাধিকাতে। সে কারণ শ্রীরাধাই মধুরা রতি জাত প্রেমের সমাশ্রয়।

ললনানিষ্ঠ প্রেম

ব্রজের মধুরা রতিজাত সর্বোত্তম এবং সর্বোজ্জ্বল প্রেমের মকরন্দ পান করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ মত্তভৃঙ্গ সর্বদা লোলুপ। এই জাতীয় প্রেম কৃষ্ণকে সম্যকরূপে বাঁধিতে পারে বলিয়া ইহা সমর্থারতি নামে অভিহিত। এই রতির সম্বন্ধে শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি স্থায়িভাব প্রকরণে লিখিয়াছেন,—

"স্বরূপ ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেৎ
অদৃষ্টেহপ্যশ্রুতেহপুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্য্যাৎ দ্রুতং রতিম্॥" (২৮)

অর্থাৎ এই রতি আপনা আপনি উন্মেষিত হয় এবং দ্রুত গতিতে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। ইহা অন্য নিরপেক্ষ। সাধারণীরতির ন্যায় কৃষ্ণ সৌন্দর্য দর্শনের দ্বারা ইহা উৎপন্ন হয়

না, কিম্বা সমঞ্জসা রতির ন্যায় কৃষ্ণগুনাদি শ্রবণ জাত নহে। ইহা স্বাভাবিক এবং স্বতঃ স্ফূর্ত্ত। ইহাকে ললনানিষ্ঠ প্রেম বলে। পূর্বরাগের পূর্বেও শ্রীরাধা স্বানুভব দ্বারা বুঝিতে পারিতেন যে যাঁহাকে তিনি পূর্বে কখন দেখেন নাই, যাঁহার কথা পূর্বে কখন শুনেন নাই, সেই অদৃষ্ট পূর্ব এবং অশ্রুত পূর্ব ঘন শ্যামল, পীতাম্বর কোন মনোহর পুরুষ তাঁহার চিত্তে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া তাঁহাকে অস্থির করে এবং সেই অজ্ঞাত পুরুষকে স্বরমনরূপে পাইবার নিমিত্ত তাঁহার চিত্তকে ব্যাকুল করে।

ইহা সাধারণ স্ত্রীপুরুষের আকর্ষণ নহে। কারণ ব্রজদেবিগণ যদি বা তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন পুরুষ থাকেন, তথাপি সেই পুরুষের রূপগুণাদিতে আকৃষ্টা হইতেন না এবং তদ্বারা তাঁহাদের কৃষ্ণ প্রেমের উদ্দামতা প্রশমিত হইত না। তাঁহাদের প্রেম অজ্ঞাত, অশ্রুত এবং অদৃষ্ট পূর্ব শ্রীকৃষ্ণকে চিত্তের সম্মুখে স্বতঃস্ফূর্ত্তরূপে প্রাপ্ত হইয়া কেবল তাঁহার দিকে উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হইত। অন্য কোন বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রুক্ষেপ থাকিত না। একমুখী হইয়া তাঁহাদের প্রেম চলিতে থাকিত।

এই ললনানিষ্ঠ স্বরূপটি নায়িকার শিরোমণি মাঞ্জিষ্ঠ রাগবতী শ্রীমতী রাধিকার মধ্যেই পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। তাই তাঁহার হৃদয়োদ্ঘাটনচতুরা ললিতা তাঁহার মানসিক দুঃস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—হে সখি ললিতে! যাঁহাকে আমি কখন দেখি নাই, যাঁহার কথা কখন শুনি নাই, ত্রিভুবনে তাদৃশ কোন ব্যক্তি আছেন কিনা তাহাও জানিনা, কিন্তু তথাপি হায়! এই গোষ্ঠ মধ্যে সেই শ্যামল পীতাম্বর কোন এক অজ্ঞাত পুরুষকে স্বরমনরূপে প্রাপ্ত হইতে আমার মন বৃথা বিদীর্ণ হইতেছে। শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি এই প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীরাধার ললনানিষ্ঠ স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন।

অপ্রাকৃত নবীন মদন

এই রতির বিষয়ীভূত কৃষ্ণ নব কিশোর নটবর- সর্বপ্রকার নায়ক গুনে বিভূষিত। শৃঙ্গার রসরাজ এবং অপ্রাকৃত নবীন মদন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কাম বীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥" (২।৮।১০৯-১১০)

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ :" অপ্রাকৃত নবীন মদন এবং সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ একই অর্থ বোধক। বৈষ্ণব তোষনী সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথের যে টীকা করিয়াছেন তাহা বঙ্গভাষায় অনূদিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন অসাক্ষাৎ মন্মথগণের মন্মথত্ব প্রকাশক সেই প্রকার অপ্রাকৃত সাক্ষান্মথগণেরও মন্মথত্ব প্রকাশক। প্রাকৃতাপ্রাকৃত ভেদে মন্মথগণ দ্বিবিধ. এক অসাক্ষাৎ রূপ অপর সাক্ষাৎ রূপ। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যংশের আবেশী যে প্রাকৃত মন্মথগণ আছেন তাঁহারা অসাক্ষাৎ রূপ। মনে হয় প্রাকৃত কামদেব শঙ্করের কোপানলে ভস্মীভূত হইয়া অতনু হইয়া আছেন, তাই তাঁহারা অসাক্ষাদ্রূপ। আর নানা বাসুদেবাদি চতুর্ব্যুহে তাঁহার স্বরূপগত যে সমুদয় কাম দেবতা আছেন যথা সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ এবং প্রদ্যুম্ন তাঁহারা সাক্ষাদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রাকৃত অসাক্ষাদ্রূপ মন্মথগণের মন্মথত্ব প্রকাশক সেই প্রকার অপ্রাকৃত সাক্ষাৎ মন্মথগণেরও মন্মথত্ব প্রকাশক।

পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ অসাক্ষাদ্রূপ প্রাকৃত মদন নহেন, আর সাক্ষাদ্রূপ অপ্রাকৃত মদনও নহেন। তিনি প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল মদনেরই নিদানভূত অপ্রাকৃত মূল নবীন মদন।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত আছে ;—

"চাতুর্য্যৈক নিদান সীম চপলাপাঙ্গচ্ছটা মন্থরম্
লাবণ্যামৃত বীচি লোলিত দৃশং, লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতম্।
কালিন্দী পুলিনাঙ্গন প্রণয়িনং কামাবতারাঙ্কুরম্
বালং নীলমমী বয়ংমধুরিম স্ব রাজ্য মারাধ্নুমঃ ॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সারঙ্গ রঙ্গদাটীকায় বৈষ্ণব তোষনীর অর্থানুসারে যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার সারার্থ এই :—মাধুরী স্বারাজ্য শ্রীকৃষ্ণ কামাদি অবতারের অঙ্কুর অর্থাৎ শাখা স্থানীয় চতুর্ব্যুহান্তর্গত প্রদ্যুম্ননামক স্বস্বরূপ সমূহের এবং পত্রস্থানীয় অনন্ত ব্রহ্মান্তর্গত শুদংশ লেশাভাস স্বরূপ প্রাকৃত কাম সমূহের প্রাকট্যের প্রথমোদ্ভিন্ন কোমল স্কন্ধাংশ। তিনি প্রাকৃতাপ্রাকৃত কন্দর্প সমূহের নিদানভূত বৃন্দাবনের অভিনব কন্দর্প। তিনি স্বয়ং মূর্ত্তিমান মাধুর্য্য।

শ্রীজীব গোস্বামীপাদ তাঁহার বৃহৎ ক্রম সন্দর্ভে সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথের অপর একটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—

"মদীয়তি মথ্নাতীতি যা মদ্নথ বা মদনঃ তং মন্ম তীতি মন্মথো রুদ্রঃ, তস্যাপি মদং গর্ব্বং মথ্নাতীতি মোহিনী রূপেন গর্ব্বং হৃতবানিতি।"

মদাভিভূত করে বা মথিত করে যে এই অর্থে মদ্ বা মথ্ যে কোন শব্দই মদনকে বুঝায় এবং সেই মদনকে মথিত বা মদাভিভূত করেন যিনি তিনি মন্মথ অর্থাৎ রুদ্ররূপী মহাদেব। মহাদেব যখন তপশ্চর্য্যায় সমাসীন ছিলেন, তখন প্রাকৃত কামদেব

মহাদেবের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার ফুলধনুতে জ্যা রোপন করিয়া পুষ্পশর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু মহাদেবের তেজ প্রভাবে মদন ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। অতএব মহাদেব প্রাকৃত কামদেবের মন্মথ। আবার সেই রুদ্রের মদ অর্থাৎ গর্ব্ব যিনি মথিত করেন, তিনি মন্মথ মন্মথ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্র মন্থন জাত সুধা পরিবেশন কালে মোহিনী মূর্ত্তিতে মহাদেবকেও বিমোহিত করিয়াছিলেন।

অতএব তাঁহার সৌন্দর্য্যে কিবা পুরুষ কিবা স্ত্রী, কিবা স্থাবর জঙ্গম সকলেই বিমোহিত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে বলিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণের মদন মোহনত্বের চরমতম বিকাশ একমাত্র শ্রীরাধিকার সান্নিধ্যে আসিয়া সম্ভব হয়। শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত কাব্যে লিখিত হইয়াছে।

"রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদন মোহনঃ।
অন্যথা বিশ্ব মোহোহপি স্বয়ং মদন মোহিতঃ॥ (৮ সর্গ ৩৭ শ্লোক)

এই প্রকার মাধুর্য্য বিকাশের একমাত্র কারণ শ্রীরাধার সর্বাতিশায়ী প্রেমের মাধুর্য্য। অতএব শ্রীকৃষ্ণের মদন মোহনত্ব শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধ প্রেম মাহাত্ম্যের পরিচায়ক।

শ্রীচৈতন্য চরিত মৃতকার শ্রীকৃষ্ণের রূপ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যেরূপের এককন, ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব প্রাণীকরে আকর্ষণ॥
কোটি ব্রহ্মাণ্ড পর ব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ
তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা শিরোমণী, যারে কহে বেদবাণী
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥"

কাম গায়ত্রী.

অপ্রাকৃত নবীন মদনের স্বরূপ হইল কাম গায়ত্রী। কাম গায়ত্রী এবং কামবীজে তাঁহার উপাসনা করা হয়। কাম গায়ত্রী মন্ত্রে সর্বশুদ্ধ পঁচিশটি অক্ষর আছে। কিন্তু বর্ণাগম ভাস্বৎ গ্রন্থানুসারে যদি 'য়'-কারের পর 'বি' অক্ষর থাকে তাহা হইলে 'য়'-কার অর্দ্ধাক্ষর হয়। অতএব কাম গায়ত্রীতে মোট সাড়ে চব্বিশ অক্ষর আছে এবং সেই অক্ষর গুলি সব চন্দ্র।

"কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়
ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥" (চৈঃ চঃ ২।২১।১০৪)

এই চন্দ্রগুলি শ্রীকৃষ্ণের কোন্ কোন্ অঙ্গে বিরাজমান, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী তাহার বর্ণনা করিয়াছেন :—

সখি হে! কৃষ্ণ মুখদ্বিজ রাজরাজ
কৃষ্ণ বপুঃ সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥"
দুইগণ্ড সুচিক্কন, জিনি মণি দর্পণ
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাট অষ্টমীইন্দু, তাহাতে চন্দন বিন্দু
সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥
কর-নখ-চাঁদের হাট, বংশী উপর করে নাট
তার গীত মুরলীরতান।
পদ নখ চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন
নূপুরের ধ্বনি যার গান॥" (২।২১।১০৫)

শ্রীকৃষ্ণের মুখ একটি পূর্ণচন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্র সমূহের রাজা (দ্বিজরাজ রাজ)। দ্বিজরাজ শব্দে চন্দ্রকে বুঝায়। সুচিক্কন গণ্ডদ্বয় দুই পূর্ণ চন্দ্র, পদাঙ্গুলির দশটি নখ দশটি পূর্ণ চন্দ্র, হস্তাঙ্গুলির দশটি নখ দশটি পূর্ণ চন্দ্র, ললাটের চন্দন বিন্দু একটি পূর্ণ চন্দ্র এবং ললাট অষ্টমী তিথির চন্দ্র অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে একুনে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র বিরাজমান। এই চন্দ্র সমূহের মাধুর্য্য এবং দ্যুতিশীলতা এতই অধিক যে তাহা প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্ব জগতের চিত্তাকর্ষক এবং তদ্দর্শনে ত্রিজগৎ কৃষ্ণ কামনাময় হইয়া পড়ে অর্থাৎ কৃষ্ণকে ভালবাসিবার জন্য সকলের অপরিসীম লোভ জন্মিয়া থাকে। কাম গায়ত্রী জপ করিবার কালে জপকারীর চিত্তে অপ্রাকৃত নবীন মদন মোহন রূপ স্ফুরিত হইয়া উঠে।

শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্য চন্দ্র এবং কমলের সহিত উপমা দিবার রীতি চির প্রসিদ্ধ। তদনুসারে শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের প্রথম

দিকে এই নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি চন্দ্র এবং কমলের উপমা পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত যখন তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন ঘটিল এবং যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তৎপরে যখন তাঁহার বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন তিনি তাঁহার মধুর কবিতাবলীর মধ্য দিয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণন করিলেন বটে তবে চন্দ্র এবং পদ্মের উপমা পরিহার করিলেন।

তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—বিল্বমঙ্গল তোমার কবিতা সুমধুর, ইহা আমার কর্ণের অমৃত স্বরূপ। তবে এখন আর আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শোভা চন্দ্র এবং কমলের সহিত উপমা দিতেছ না কেন? তুমি প্রাচীন কবিদিগের পথ অনুসরণ করিয়া চন্দ্র এবং পদ্মের সহিত তুলনা কর। শ্রী বিল্বমঙ্গল তাহাতে উত্তর দিলেন, 'না প্রভো! এখন আমি আর তাহা করিতে পারিব না।" শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন? চন্দ্রের কলঙ্ক আছে বলিয়া; কিন্তু কবিগণতো বলিয়াছেন, একোহহি দোষো গুণ সন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।' গুণ সন্নিপাতে একটি দোষ থাকিলে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হয় না।" তাহাতে বিল্বমঙ্গল বলিলেন, "প্রভো! চন্দ্রের যে শুধু কলঙ্ক আছে তাহা নহে, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে। কিন্তু আপনার সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর বর্ধনশীল এবং নিত্য নবীন। তাহার কোন হ্রাস নাই, কেবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। অতএব চন্দ্রের সহিত আপনার অফুরন্ত রূপরাশির কেমন করিয়া উপমা দিই? চন্দ্র আপনার চরণের নখদ্যুতি দেখিয়া লজ্জায় দশধা বিভক্ত হইয়া আপনার চরণ নখদ্যুতিতে গিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছে। উপরন্তু অমাবস্যা তিথির কথা স্মরণ করিয়া কি প্রকারে আপনার সৌন্দর্য্য চন্দ্রের সহিত তুলনা করিতে পারি।"

তখন কৃষ্ণ বলিলেন—'তবে না হয় পদ্মের সহিত তুলনা কর। কবিগণ আমার মুখকে মুখারবিন্দ, চরণকে চরণারবিন্দ বলিয়া তো বর্ণনা করিয়াছেন, তুমি তাহাই কর।' বিল্বমঙ্গল উত্তর দিলেন—'না প্রভো! আমি তাহাও পারিব না। চন্দ্রের উদয় হইলে কমলিনীর যে কি দুর্দ্দশা হয় তাহা দেখিয় আমি কি করিয়া কমলের সহিত আপনার মুখের উপমা দিতে পারি? চন্দ্রের চরণাঘাতে পদ্ম যায় অধঃপাতে। কমলিনী মলিনা দিবসাত্যয়ে।' সেহেতু আমি তাহাও পারিব না। আপনার মুখ আপনার চরণ আপনার অঙ্গ-প্রতঙ্গের শোভা কাহারও সহিত তুলনীয় নয়। ইহা অতুলনীয়।

লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে 'শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্য্য শ্লোকে শ্লোকে

উদ্গীরণ করিয়াও যখন পরিতৃপ্ত হইলেন না, তখন কেবল 'মধুর, মধুর' বলিয়া পরিসমাপ্ত করিলেন।

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম।
মধুস্মিত মধুগন্ধি মেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।" (৯২ শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণের দেহখানি অতি মধুর। দেহ হইতে বদন শ্রেষ্ঠ, অতএব বদন তাহা হইতেও মধুর। এই বদনের উপর যে মধুগন্ধি মধু হাসি খেলিয়া যায় তাহা সুমধুর। ইহা মধুর, মধুর, মধুর মধুর।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীমহাপ্রভুর মধ্য দিয়া সনাতন শিক্ষা প্রসঙ্গে এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যেন মহাপ্রভু সান্নিপাত রোগগ্রস্ত হইয়াছেন সান্নিপাত রোগে বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইয়া উঠে। এ রোগের উপসর্গ কেবল পিপাসা। এ পিপাসা কোন ক্রমেই শান্ত হইতে চাহে না। মনে হয় যেন সমুদ্রের সমগ্র জল পান করিয়া ফেলে। কিন্তু দুর্দৈব চিকিৎসক প্রাণ ভরিয়া জল পান করিতে দেন না। যেটুকু জল পান করে, তাহা যেন তপ্ত সৈকতে বারি বিন্দুসম" এক নিশ্বাসে শুকাইয়া যায়। তাই শ্রীমহাপ্রভু আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন;—"সনাতন! কৃষ্ণ মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।

মোর মন সান্নিপাতি, সবপিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য নাদেয় এক বিন্দু॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য পুর, মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে সেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হইতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশ দিকে বহে যার পুর।"

(চৈঃ চঃ ২।২১।১১৫-১১৭)

শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য বিরচিত শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকং নামক স্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণের যাহা কিছু সবই মধুর মধুর বলিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ;—

শ্রীকৃষ্ণের

বর্ণকে হার মান.

পরাজিত করে। ওষ্ঠ .

বিপুল আবক্তিম নয়নে মধুর ক৮

হইয়া সেই চাঁদনির মধ্যে নিমজ্জি৩ ২ ,

দণ্ডায়মান। ললাট ও গণ্ডস্থল অলক, তিল,

কুণ্ডল, যেন গণ্ডদেশকে আক্রমণ করিয়া নীলাভঃ।:২

মস্তকে ময়ূর পুচ্ছের চূড়া এবং বাহুদ্বয়ে বহুবিধ রত্নখা৮

গগনে বক পংক্তির ন্যায় মনোহর মুক্তাহার। গলে বনমালা।৭

দ্বয়কে চুম্বন করিবার জন্য লালায়িত। পরি৮, .ন পীতব স, চরণে নান।

খচিত নূপুর যেন নখচন্দ্রের শোভায় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া রুনুঝুনু রবে নি

জয়ধ্বনি করে। কিন্তু তিনি সকল সময় রাজকীয় বেশভূষায় অলঙ্কৃত

ভালবাসেন না। বৃন্দাবনে, অপ্রাকৃত নবীন মদনের আরণ্যক নব নটবর বেশ। তাং

তাঁহার বাহুতে পল্লবের অঙ্গদ, কর্ণে কর্ণিকা কুসুমের অবতংস, গলে পঞ্চবর্ণের বনফুলের

ান

ন। তাঁহার

া না লক্ষ লক্ষ যুগ

না। তাই কবি বিদ্যাপতি

স অনুভব মোর।

তি অনুরাগ বাখানিতে

তিলে নূতন হোয়॥

জনম জনম হাম, রূপ নেহারনু

নয়ন না তিরপিত ভেল।

সই মধুর বোল, শ্রবণ হি শুনম্নু

শ্রুতিপথে প্রবেশ না গেল।

কত মধু যামিনী, রভসে গোঁয়ায়নু

না বুঝনু কৈছন কেলি।

লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ল না গেলি।
কত বিদগধ জন, রসে অনুগমন
অনুভব কাহে নাহি পেখ।
বিদ্যাপতি কহে, প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক।”

(শ্রীরাধার মধুরাখ্য স্থায়ীভাব অনুরাগ)

সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের পূর্ণ আস্বাদন একমাত্র ভাবের দ্বারা সম্ভবপর হয়। শুষ্ক জ্ঞান অপেক্ষা ভাবধারা শ্রেষ্ঠ। ভাবুক না হইলে অর্থাৎ ভাবশূন্য শুষ্ক হৃদয়ে ভাবের ঠাকুরকে কখন ধরা যায় না। মাধুর্য্য আস্বাদন মস্তিষ্কের কার্য্য নহে, ইহা অন্তরস্থ ভাবের কার্য্য। যাঁহার যে প্রকার ভাব, তিনি ততটুকুই আস্বাদন করিতে পারেন। সে কারণ যিনি মহাভাববতী তিনি ব্যতীত অন্য কেহই শ্রীকৃষ্ণকে অপ্রাকৃত নবীন মদন-রূপে অনুভব করিতে পারেন না।

নায়িকার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য

তৎপরে এই রসের নায়িকা বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা অশেষ নায়িকাগুণে বিভূষিত, অখণ্ড রসবল্লভা। রসশাস্ত্রে নায়িকার যে আট প্রকার ভেদ দেখান হইয়াছে যথা অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা এবং স্বাধীনভর্তৃকা। এই আট প্রকার নায়িকাবস্থা রাধাপ্রেমে অদ্ভুত ভাবে প্রকটিত।

অভিসারিকা—যে নায়িকা যৌবনমদে মত্তা হইয়া স্বয়ং ব্যগ্রতার সহিত কান্তের সন্নিধানে গমন করেন, শুক্লা রজনীতে তিনি শুক্লবসনা এবং শুভ্রাভরণা হইয়া কান্তের সন্নিধানে অভিসার করেন। কারণ তাঁহার প্রেম পরকীয়া রতিমূলক।

বাসক সজ্জা- যে নায়িকা তাঁহার প্রিয়তম আসিবেন ইহা নিশ্চিত জানিয়া কেলিকুঞ্জ বিবিধ উপকরণে সজ্জিত করেন এবং নিজেও বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া উৎকণ্ঠার সহিত দ্বারদেশে কান্তের আগমন প্রতীক্ষা করেন।

উৎকণ্ঠিতা- যে নায়িকা কান্তের অনাগমন বশতঃ দুঃখে অধীরা হইয়া নানা প্রকার প্রমাদ গণনা করেন। তবে নিজকৃত অপরাধের জন্য তাঁহার কান্ত আসিতেছেন না কিম্বা কান্তের নিজেরই কোন অমঙ্গল হইয়াছে এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া দুঃখে অভিভূতা হন।

বিপ্রলব্ধা—বিরহিনী নায়িকা।

খণ্ডিতা—অন্য নায়িকার সম্ভোগচিহ্নযুক্ত নায়ককে দেখিয়া রোষযুক্তা নায়িকা।

কলহান্তরিতা—কান্তকে নানা প্রকার তিরস্কার ভর্ৎসনা দ্বারা কুঞ্জ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া তাঁহাকে পুনরায় প্রাপ্তির জন্য পশ্চাত্তাপযুক্তা নায়িকা।

প্রোষিতভর্তৃকা—দীর্ঘকাল প্রবাসগত কান্তের বিরহে খিন্না নায়িকা।

স্বাধীনভর্তৃকা—বিচিত্র বিলাস মত্তা নায়িকা, যিনি তাঁহার কান্তকে শৃঙ্গার রসোচিত বেশ রচনা এবং বক্ষঃস্থলে মৃগমদবিন্দুর দ্বারা কেলি মকরাদি অঙ্কিত করিতে আদেশ করেন এবং যিনি তাঁহার প্রিয়তমকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া রাখেন। ইহা সম্ভোগদশা অপরগুলি বিয়োগদশা।

এই সকল নায়িকা গুণ তাঁহাতে বিশেষভাবে বিদ্যমান। কান্তকে পাইবার জন্য তিনি সর্বদা ব্যাকুলা। অসংখ্য সখীগণে পরিবৃতা হইয়া সর্বদাই কৃষ্ণান্বেষণে আগ্রহান্বিতা। তাঁহার সহিত কেলি বিলসিতা হইয়া শৃঙ্গার রসরাজকে সম্যকরূপে আপ্যায়িত করেন।

অশেষ রসের নাগর যেমন রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়ায় রত থাকিবার জন্য লালুপ, অশেষ রসের নাগরী শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনী রাধিকাও সেই প্রকার কৃষ্ণ সঙ্গম ব্যতীত অন্য কাহারও সঙ্গম অভিলাষ করেন না। পরিধানে নীল বসন, তবে শুভ্রা রজনীতে যখন কৃষ্ণাভিসারে বহির্গতা হন তখন শুভ্র বসন পরিধান করেন এবং কৃষ্ণা রজনীতে কৃষ্ণবাস পরিধান করেন। দিবসে কৃষ্ণকে নিভৃতে পাইবার নিমিত্ত ছল-পূর্বক পদ্মবন্ধু সূর্য্যদেবকে আরাধনা করিতে যান এবং কৃষ্ণও পুরোহিতরূপে আসিয়া তাঁহার প্রেম পূজা সমাপন করেন।

তিনি কনক পাত্রে ঘৃষ্ট নব কুঙ্কুমের ন্যায় অথবা নব গোরোচনার ন্যায় গৌরাঙ্গী। চক্ষুদ্বয় খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় ইতস্ততঃ কৃষ্ণাভিমুখে সঞ্চরণশীল। আগুল্ফ বিলম্বিত কৃষ্ণবর্ণ বেণী, উপরিভাগে মণিরত্ন খচিত কবরীবন্ধ। শিখিগণ সর্পভ্রমে আক্রমণ করিতে আসিয়া নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কেকারবে নায়িকার জয়গান করিয়া যায়। অঙ্গের লাবণী বিলসিতা হইয়া চতুর্দিক মধুর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে। মুখমণ্ডল চন্দ্র প্রভৃতি উপমান পদার্থের গর্বকে খর্ব করিয়া দেয়। অঙ্গের সৌরভে মধুপগণ মুখপানে আসিয়া গুনগুন্ রবে নায়িকার গুণগান করে। কেবল মধুপগণ কেন, মত্তভৃঙ্গরূপী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সে সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া মধুপান করিবার নিমিত্ত নিয়ত লালায়িত।"

পদ নখের দ্যুতিঃচন্দ্রের সৌন্দর্য্যকে প্রশমিত করে। কর্ণদ্বয়ে মণিরত্ন খচিত কর্ণিকার ভূষণ, ঈষৎ বায়ুসঞ্চালনে দোদুল্যমান। পদদ্বয়ে মণিমাণিক্য খচিত বলয় নায়িকার পদ সেবায় রত। উন্নত কুচযুগল মদমত্তমাতঙ্গরূপী কৃষ্ণকে লৌহ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিবার সুদৃঢ় কীলক। অষ্টসাত্ত্বিকভাবে তাঁহার বিগ্রহ নিরত ব্যাকুলিত। তিনি কারুণ্যে, তারুণ্যে, লাবণ্যে অদ্বিতীয়া। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী বিরচিত 'প্রেমাম্ভোজ মরন্দাখ্য স্তবরাজে' শ্রীরাধার যে সৌন্দর্য্য মাধুর্য বর্ণিত আছে, তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল ;

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তারত্নোদ্ভাবিত বিগ্রহাম্।
সখীপ্রণয়-সদ্গন্ধ বরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভাম্ ।। ১
কারুণ্যামৃত বীচীভিস্তারুণ্যামৃত ধারয়া।
লাবণ্যামৃত বন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্ ।। ২
হ্রী পট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্য ঘুসৃণাঞ্চিতাম্।
শ্যামলোজ্জ্বল কস্তূরী বিচিত্রিত কলেবরাম ।। ৩
কম্পাশ্রু-পুলক-স্তম্ভ-স্বেদগদ্-গদ্ রক্ততা।
উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ।। ৪

*　　　*　　　*

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার ঐ ভাব অবলম্বনে কিছু পরিবর্ধিত আকারে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন —

"প্রেমের স্বরূপদেহ প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ।।
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণকরে এই কার্য্য যার ।।
মহাভাব চিন্তামনি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ ।।
রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্তন।
তাতে অতি সুগন্ধ দেহ উজ্জ্বল বরণ ।।
কারুণ্য মৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম ।।
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা-শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান ।।" (২।৮।১২৪-১২৯)

"কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর।।" (২।৮।১৩৩)

অশ্রু, কম্প, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ গদ্গদতা, রক্ততা উন্মাদ এবং জাড্য (জড়িমা) এই নবরত্নদ্বারা তাঁহার কলেবর অলঙ্কৃত। অতএব ব্রজের নায়ক নায়িকা উভয়েই তুল্যমূল্যভাবে অশেষ শোভাসম্পদে বিভূষিত। বৈষ্ণব কবিগণ কতভাবে যে নায়ক নায়িকার অপরিসীম সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কীর্তন করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। শ্রীরাধার মধ্যে মধুরাখ্য স্থায়ীভাব এক, ব্যভিচারিভাব তেত্রিশ, হাসাদিভাব সাত একুনে ৪১ প্রকার। এই সকল ভাব তাঁহার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার স্বরূপ।

চতুর্বিধ মাধুর্য

ব্রজের মাধুর্য্য চতুর্বিধ ধারায় প্রবাহমান। যথা রূপ মাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, প্রীতি মাধুর্য্য, এবং বেণুমাধুর্য্য,। চতুর্বিধ মাধুর্য্য মধুরা রতিতে অদ্ভুত রূপে প্রকাশমান। এই চতুর্বিধ মাধুর্য্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ব্রজানুরক্ত ভক্তগণ মাধুর্য্যের উপাসক—সে কারণ তাঁহাদের ভজন মধুর। তাঁহারা বিবিধছন্দে গানে এই চতুর্বিধ মাধুর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বেণু মাধুর্য্য কি প্রকারে অলৌকিকভাবে মধুরা রতিকে উদ্দীপিত করিয়া নব নব রসের সঞ্চারকরে—তাহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। বেণুমাধুর্য্য ব্রজযুবতীগণের প্রেমসমুদ্রকে কিভাবে উদ্বেলিত করে, পরবর্তী তরঙ্গে তাহার কিঞ্চিদাভাস প্রদর্শিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ

বেণু মাধুর্য্যের দ্বারা উদ্বেলিত প্রেম

বৃন্দাবনে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি অভিনব মাধুর্য্যমণ্ডিত। ইহার আকর্ষণী শক্তি অদ্ভুত। কৃষ্ণের বেণুনাদ লহরী আকাশ বাতাস পরিপূরিত করিয়া এবং সর্ব আবরণ ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়। সেখানেও তাহার প্রতিক্রিয়া উপলব্ধ হয়। স্বর্গের দেবিগণ কল্পবৃক্ষ হইতে সায়াহ্নে যখন পুষ্প চয়ন করেন, তখন সে ধ্বনি সেখানে গিয়া প্রবেশ করে। তচ্ছ্রবনে তাঁহারাও স্রস্ত গাত্র এবং সম্পূর্ণরূপে বিবশ হইয়া পড়েন। হস্তস্থিত কুসুমসমূহ স্খলিত হইয়া কৃষ্ণের মস্তকে পতিত হয়।

বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজযুবতিগণের কর্তা ভর্তার সন্মুখে নীবিবন্ধ খসিয়া পড়ে। সকলেই কৃষ্ণের সন্ধানে যাইবার নিমিত্ত এতই উন্মত্তা হন যে নীবিবন্ধ নিবদ্ধ করিবার অবকাশ তাঁহাদের থাকে না। যদিবা নীবিবন্ধ সুদৃঢ় করিতে যান, অমনি মতী খসিয়া পড়ে। কোন বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নাই, তিলমাত্র ধৈর্য্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর ডাক তাঁহাদের প্রেম সমুদ্রকে এতই উদ্বেলিত করিয়া তুলে যে তাঁহাদের বেশভূষা পরিচ্ছদাদির প্রতি দৃক্‌পাত করিবার সময় থাকে না। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্যা হইয়া যেন প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া চলেন; নিজেদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলেন। ধৈর্য্যহারা হইয়া ভ্রমবশতঃ নয়নের কজ্জল চরণে দেন, আর চরণের অলক্তক নয়নে দেন। কণ্ঠের হার কটিদেশে পড়েন এবং কটিদেশের মেখলা কণ্ঠে লাগান। আশ্চর্য্য বংশীর শক্তি যদ্দ্বারা ব্রজযুবতিগণের ভ্রম এবং বৈপরীত্য সংঘটিত হয়।

বেশ বিভ্রম

এই প্রকার বিভ্রমের বিষয় শ্রীরূপকৃত বিদগ্ধমাধব নাটকে বর্ণিত আছে :—

ধম্মিলোপরি নীলঃ পঞ্চিতোহারস্তয়ারোপিতো,
বিন্যস্ত কুচকুম্ভয়োঃ কুবলয় শ্রেণী কৃতো গর্ভকঃ।
অঙ্গে চর্চ্চিত মঞ্জুলং বিনিহিতা কস্তুরিকা নেত্রয়োঃ
কংসারেরভিসার সম্ভ্রম ভরাস্মন্নে জগদ্বিস্মৃতম্‌

(চতুর্থ অঙ্ক ৩০ অনুচ্ছেদ)

প্রয় সশ্রীরাধার প্রিয় সখী ললিতা দেবী রাধিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন— তুমি খোঁপায় নীলমণি রচিত হার আরোপণ করিয়াছ। কেশে ধারণোপযোগী নীলপদ্ম রচিত মাল্য বক্ষস্থলে স্থাপন করিয়াছ। কজ্জল সর্বাঙ্গে লেপন করিয়াছ এবং কস্তুরী নয়নদ্বয়ে লেপন করিয়াছ। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে তুমি কৃষ্ণাভিসারে গমন করিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা নিবন্ধন সমগ্র জগৎ ভুলিয়া গিয়াছ।

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদাবলী 'পদকল্পতরুর' একটি গানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণানুরাগিনী প্রগাঢ় প্রেমবতী শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে যে বেশভূষার বৈপরীত্য ব্যক্ত হইয়াছে তাহা অতি মনোজ্ঞ এবং নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"রাই সাজে বাঁশী বাজে, না পরিল উল।
কি করিতে কি না করে সব হইল ভুল॥
মুকুরে আঁচড়ে রাই, বাঁধে কেশ ভার।
পায়ে বাঁধে ফুলের মালা না করে বিচার॥
করেতে নূপুর পরে, জঙ্ঘে পরে তার।
গলেতে কিঙ্কিণী পরে কটি তটে হার
চরণে কাজল পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা।
বংশীবদনে কহে যদু বলিহারী।
শ্যাম অনুরাগের বালাই লইয়া মরি।"

যেমন নদী সমস্ত বাধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ধবনাম্নী (কাল্পনিক বৃক্ষ) তরুকে দূরে ফেলিয়া রাখিয়া কুলুকুলুনাদে সমুদ্রে গিয়া মিশিতে চায়, সেই প্রকার ব্রজসুন্দরীগণ ধর্ম, অধর্ম, পতি, দেহ, গেহ, স্বজন, আর্য্যপথ প্রভৃতি উল্লঙ্ঘন করিয়া মধুরকিঙ্কিনী রবে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উন্মত্তা হন। অপরদিকে কৃষ্ণও তাঁহাদিগকে পাইবার নিমিত্ত এতই উৎকণ্ঠিত হন যে তাঁহাদের কিঙ্কিনীরবর যতক্ষণ তাঁহার শ্রুতিপথে প্রবেশ না করে ততক্ষণ বিষাদে মলিন চিত্ত হইয়া সংশয়ে সময় অতিবাহিত করেন।

ধর্মবিপর্যয়

কৃষ্ণের বংশীধ্বনি 'ধর্মবিপর্য্যয়কারী'। ইহা স্থাবরকে পুলক, রোমাঞ্চ স্বেদ,

কম্পঅশ্রু প্রভৃতি জঙ্গমাত্মক ধর্ম এবং জঙ্গমকে স্তম্ভ,বৈবর্ণ্য প্রভৃতি স্থাবরাত্মক ধর্ম প্রদান করিয়া ধর্ম বিপর্যয় ঘটাইয়া দেয়। ধেনুগণ কর্ণ ঊর্দ্ধ করিয়া আবেশের সহিত কৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণ করে। পক্ষিগণ নীরব হইয়া যায়। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইতে থাকে। পত্রপুষ্পে শিহরণ জাগিয়া উঠে। যমুনার জল কখন উজান গতিতে বহিতে থাকে, কখন আবার স্ফীত হইয়া গোবিন্দের চরণ যুগল সিক্ত করিয়া দেয়।

কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার 'গোবিন্দলীলামৃত' কাব্যে বংশীগানে স্থাবর ও ও জঙ্গমাদির যে কি প্রকার স্বভাব বৈপরীত্য হয় তাহা বর্ণন করিয়াছেন। বেণুনাদে স্থাণু পর্বতসকল দ্রবীভূত হইলে তাহা হইতে যে জল নিঃসৃত হয়, সেই জল পান করিবার জন্য তৃষ্ণাতুর মৃগ এবং পক্ষিগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে কিন্তু তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বেণুনাদে তাহারা জড়ত্বপ্রাপ্ত হয় এবং নির্ঝরের জল পান করিতে পারে না। বংশীনাদে সরোবরের জলপ্রবাহ পাষাণতুল্য হয়। তাহাতে হংসীগণের পদদ্বয় বদ্ধ এবং অঙ্গ নিশ্চল হইয়া পড়ে। হংসগণ রমণাভিলাষী হইয়াও প্রস্তররূপে পাষাণত জল দ্বারা বদ্ধপাদ হইয়া গমন করিতে এবং প্রিয়তমা হংসীগণকে মৃণালখণ্ড প্রদান বা নিজেরও ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।

বংশীধ্বনির দ্বারা বৃন্দারণ্যে ছয় ঋতুর ধর্ম এককালীন উপস্থিত হয় এবং তদ্দ্বারা দিগ্‌গণকে অমৃতধারায় সেচন করিয়া উল্লাসযুক্ত করে। ষড়ঋতুজাত সমুদয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। মালতী, বকুল, মল্লিকা, পাটল, শিরীষ, যূথিকা, কদম্ব, কেতকী, জাতী পদ্ম, লোধ্র, বন্ধুক প্রভৃতি ষড় ঋতুজাত মনোরম কুসুম সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া বৃন্দাটবীর অঙ্গভূষণ সাজাইয়া দেয়।

যেমন সখীগণ স্তম্ভাদি-সাত্ত্বিকভাবে বিভূষিত হইয়া সম্যকরূপে বিলসিত হন, সেই প্রকার বৃন্দাটবীস্থিত জঙ্গমদ্বারা স্তম্ভযুক্তা, কম্পান্বিত স্থাবর দ্বারা কম্পিতাঙ্গী, গলিতপ্রস্তর দ্বারা স্বেদযুক্তা, অস্ফুট পক্ষিধ্বনিতে গদগদযুক্তা এবং অঙ্কুরোদগমের দ্বারা পুলকিতাঙ্গী হইয়া বিলাসপ্রাপ্ত হন। (দ্বাদশ সর্গ ৪১—৪৪ শ্লোক)

রস্থানুসারে ভাবের উদ্দীপন

বংশীগানে যাহার যেভাব সেই ভাবের উদ্দীপন হয়। এই বংশীধ্বনির দ্বারা সখাগণ গোচারণে যাইবার কিম্বা প্রত্যাবর্তন করিবার সংকেত লাভ করেন। মা যশোমতী বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া ঔৎসুক্য ভরে কৃষ্ণের পান ভোজনের আয়োজন করেন। ব্রজযুবতীগণ বংশীধ্বনী শ্রবণে বিকলাঙ্গী হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হন।

শিবরামের একটি প্রসিদ্ধ গানে বংশীধ্বনির যে মধুর বর্ণনা আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই বংশীর অষ্টরন্ধ্র এবং যে রন্ধ্রে ফুঁক দিলে যে যে অবস্থা ঘটে তাহার বর্ণনা ইহার মধ্যে আছে।

প্রথম রন্ধ্রের গানে, ব্রহ্মার ভাঙ্গয়ে ধ্যানে
দ্বিতীয়েতে যমুনা উজান।
তৃতীয় রন্ধ্রের কথা, শুন বৃষভানুসুতা
পবনের হত হয় জ্ঞান॥
চতুর্থ রন্ধ্রের গানে, ব্রজগোপীর বাজে কানে।
উন্মত্ত ভ্রমরীর প্রায়।
বসন পরিতে নারে, নীবিবন্ধ খসি পড়ে
এলোকেশে সেই পথে ধায়।
পঞ্চম রন্ধ্রের স্বরে, আপনে সে ধেনু ফিরে
পুনঃ ধেনু যাইতে না পারে।
ঊর্ধ্ব মুখে যায় ধেনু যেখানে বাজায় বেণু
আগে আসি মোর মুখ হেরে।
ষষ্ঠ রন্ধ্রের প্রায় শুষ্ক তরু প্র[illegible] পায়
পা[illegible] অপান দ্রব হয়।
গা[illegible] ভী তু[illegible] না[illegible] [illegible] চিত্ত পুত্তলিকার প্রায়
কা[illegible]কলাদির স্বরভঙ্গ হয়।
সপ্তম রন্ধ্রের [illegible]তে কদম্বাদি বিকশিতে
ষড় ঋতু বহে এক ভাবে।
অষ্টম রন্ধ্রের গান গায় সদা তব নাম
অবহেলে বাঁশী এই কবে
শুনহ আমার ধম, অসাধ্য বাঁশীর কম
ত্রিলোক মোহিত বাঁশীর গানে
বাঁশীর যতেক গুণ, কি কহিব নিরূপণ
শিবরাম কি কহিতে জানে।"

ইহা শ্রীরাধার নিকট বংশীধ্বনির মাহাত্ম্য বর্ণন।

বংশীর প্রভাব

এই বংশীধ্বনির এতই মাধুর্য শক্তি যে তদ্বারা সমুদ্রের তরঙ্গ রুদ্ধ হয়। মেঘের গতি স্তম্ভিত হইয়া যায়। গায়ক শ্রেষ্ঠ তম্বুরু সমগ্র নাদ লহরীর পরিজ্ঞাতা হইয়াও বংশীর অদ্ভুত স্বর মাধুর্য্যে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া যান। সনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিলেও তাঁহাদের ধ্যানভঙ্গ হইয়া যায় এবং ব্রহ্মানন্দ হইতে বিচলিত হইয়া পড়েন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্য ভুলিয়া যান। অনন্তদেব চঞ্চল হইয়া পড়েন। পাতালে বলি মহারাজার মস্তক বিঘুর্ণিত হয়। বংশীধ্বনি যে কেবল ব্রহ্মাণ্ডে সীমাবদ্ধ তাহা নহে। ইহা ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহ ভেদ করিয়া দ্যুলোকে গিয়াও উপনীত হয়। ইহা শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত বিদগ্ধ মাধব নাটকে বংশীধ্বনির প্রভাব বর্ণনা। সংস্কৃত শ্লোকটী এই স্থলে উদ্ধৃত হইল,—

"রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতি পরং কুর্ব্বন্মুহুস্তম্বুরুম্
ধ্যানাদন্তরয়ন সনন্দন মুখান
বিস্মারয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যা বলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্
ভোগীন্দ্রমাঘুর্ণয়ন
ভিন্দন্নণ্ড কটাহ ভিত্তি মভিতো
বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ" (প্রথম অঙ্ক : ৪৭ অনুচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণন,—

স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধরমধুরে
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশীছিদ্র আকাশে, তার গুণ-শব্দে পৈসে
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়
জগতের বলে পৈশে কানে।
সভা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি
বিশেষতঃ যুবতীর গণে
ধ্বনি বড় উদ্ধত পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত
পতি কোলে হৈতে কাড়ি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে
তার আগে কেবা গোপীগণে॥

নীবি খসায় পতি আগে, গৃহকর্ম করায় ত্যাগে
বলে ধরি আনে কৃষ্ণ স্থানে।
লোক ধর্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়
ঐছে নাচায় সব নারীগণে॥
কানের ভিতর বাসা করে, আপনে তাঁহা সদা স্ফুরে
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কান, আন বলিতে ভুলায় আন
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥ (চৈঃ চঃ ২।২১।১১৮-১২২)

বংশীর সর্ববশীকরণ শক্তি থাকিলেও তাহার প্রধান লক্ষ্য ব্রজযুবতীগণের প্রাণে ভাববিশেষের উদ্দীপন করা। যখন এইভাবে বিভাবিত হইয়া বেণু নাদলহরী উত্থিত হয় তখন যোগমায়ার অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে কেবল যাঁহারা মধুর রতির আশ্রয়, তাঁহারাই শ্রবণ করিতে পারেন। অন্য কেহ তাহা শুনিতে পান না। তাঁহারা সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া সহস্র প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রগাঢ় অনুরাগ ভরে এবং ধৈর্য্যহারা হইয়া তাহার অভিসারে বহির্গতা হন। একমাত্র বংশীধ্বনিই গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন সংঘটনে পরম সহায়। সেকারণ বংশীকে তাঁহারা দূতী এবং প্রিয়সখী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

বংশী ত্রিবিধ

ভক্তি রসামৃত সিন্ধু দক্ষিণ বিভাগ ১ম লহরী হইতে জানিতে পারা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের **বংশী ত্রিবিধ**। যথা, বেণু, মুরলী এবং বংশীকা। "বংশী ত্রিধা ভবেদ্বেণু-মুরলী বংশীকেত্যপি।" এই তিনটি একবস্তু নহে, প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে।

তত্র বেণুঃ

"পাবিকাখ্যো ভবেদ্বেণু র্দ্বাদশাঙ্গুল দৈর্ঘ্যভাক্।
স্থৌল্যেঽঙ্গুষ্ঠ মিতঃ ষড়্‌ভির্বিবরৈঃ সমন্বিতঃ। (১৮৭)

যাহা দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থূল ও ছয়টি ছিদ্রযুক্ত তাহাকে পাবিকাখ্য বেণু বলে।

মুরলী

"হস্তদ্বয়মিতায়ামা মুখরন্ধ্র সমন্বিতা।
চতুঃস্বরচ্ছিদ্রযুক্তা মুরলীচারুনাদিনী॥" ১৮৮

যাহা দ্বিহস্ত পরিমিত, মুখ মধ্যে রন্ধ্র এবং চারি স্বরের ছিদ্র সমন্বিত, তাদৃশ মনোহর শব্দকারিনীর নাম মুরলী।

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধ মাধব নাটকে মুরলীর লক্ষণ দিয়াছেন যাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

"রায় কহে—বৃন্দাবন মুরলী নি:স্বন।
কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন?" (৩।১।১২৪)

মুরলী যথা তত্রৈব।

"বা মুষ্টাঙ্গুষ্ঠ ত্রয় মসিত রত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মনিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ।
তয়োর্মধ্যে হীরকোজ্জ্বল বিমলজাম্বুনদময়ী
করে কল্যানীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলি মরলী।"

(বিদগ্ধ মাধব নাটক ৩।১)

মুরলীর উভয়দিকে অর্থাৎ শিরোভাগে ও পুচ্ছভাগে তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থান অসিত রত্ন অর্থাৎ ইন্দ্র নীল মণি দ্বারা খচিত, শিরোদেশের তিন অঙ্গুলির পরে এবং পুচ্ছদেশের তিন অঙ্গুলির পূর্বে অঙ্গুষ্ঠত্রয় পরিমিত পরিসরদ্বয় অরুণবর্ণ মনি দ্বারা খচিত। ঠিক মধ্যস্থলের স্থানটি স্বর্ণ দ্বারা জড়িত এবং হীরক দ্বারা খচিত। এই প্রকার কল্যাণী কেলি মুরলী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বিলসিত হইতেছে।

শ্রীরাধা মুরলীর ভাগ্য বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, (যথা বিদগ্ধ মাধবে)

"সখি মুরলি বিশাল চ্ছিদ্র জালেন পূর্ণা
লঘুরতি কঠিনা ত্বং নীরস গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দ সান্দ্রং
হরি কর পরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ৫।১৯"

শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা মুরলী বাজাইয়া থাকেন। সেহেতু মুরলী সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শ এবং অধরস্পর্শ পাইয়া থাকে। মুরলীর অতিশয় সৌভাগ্য দেখিয়া শ্রীরাধা তাহাকে প্রিয়সখী মনে করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,

"মুরলী তুমি বিশাল ছিদ্রজালে পরিপূর্ণ। তুমি অতিশয় লঘু এবং কঠিন, রসহীন এবং অসরল। এত দোষে দুষ্ট হইয়াও তুমি শ্রীকৃষ্ণের চুম্বন এবং তাঁহার শ্রীহস্তের আলিঙ্গন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছ। কিন্তু হায়। আমার ভাগ্যে তাহা জুটিল না। অতএব তুমি বল তুমি কি পুণ্য কার্য্য করিয়াছ যাহার ফলে তুমি তাহা পাইয়াছ। আমিও না হয় সেই প্রকার পুণ্য করিয়া দেখি।"

বংশী।

"অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোন্মান' তারাদি বিবরাষ্টকম্।
ততঃ সার্দ্ধাঙ্গুলাদ্ যত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলম্।
শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সা তু বংশিকা।
নবরন্ধ্রান্বিতা সপ্তদশাঙ্গুল মিতা বুধৈঃ॥" (ভ' রঃ সি ২।১।১৮৯)

নবছিদ্রসমন্বিত সপ্তদশ অঙ্গুলি পরিমিত বংশকে বংশী বলে। ইহাতে নয়টি ছিদ্র আছে, তন্মধ্যে একটি মূলছিদ্র। এক এক অঙ্গুলি ব্যবধানে অষ্টছিদ্র, সার্দ্ধ অঙ্গুল অন্তরে মুখ ছিদ্র। উপরি ভাগে চারি অঙ্গুল, পশ্চাদ্ভাগে তিন অঙ্গুল এবং গ্রন্থির পর ভাগ অর্দ্ধঅঙ্গুল। সর্বসমেত নয়টি ছিদ্র সমন্বিত সতেরো অঙ্গুল পরিমিত বংশকে বংশী বলে।

যদি সেই মুখ ছিদ্র ও স্বরছিদ্র দশ অঙ্গুলি ব্যবধানে হয়, তাহা হইলে তাহার নাম মহানন্দা ও সম্মোহিনী। দ্বাদশ অঙ্গুল অন্তর হইলে আকর্ষণী এবং চতুর্দ্দশ অঙ্গুল ব্যবধান হইলে বংশুলা নামে অভিহিত করা হয়। বংশী ক্রমে মনিময়ী, হৈমী এবং বৈনবী এই তিন প্রকার। মনিময়ীর নাম সম্মোহিনী, স্বর্ণ নির্মিত হইলে আকর্ষণী এবং কেবল বংশনির্মিত হইলে তাহার নাম আনন্দিনী বংশীর এই ত্রিবিধ ভেদ শ্রীপাদ গোস্বামী পাদ দেখাইয়াছেন।

রাসলীলার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ যে বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন তাহা স্বর্ণ নির্মিত আকর্ষণী নামক বংশীদ্বারা।

বংশী ধ্বনির সার্থকতা কোথায়

এখন জিজ্ঞাস্য, এই যে শ্রীকৃষ্ণ যে অপূর্ব বংশীনাদে ত্রিভুবন বিমোহিত করেন। তাহা কি কেবল যে সে পুলকে, সঞ্চার করেন তাহা কি তাঁহার বংশী ধ্বনির মাহাত্ম্য খ্যাপনের নিমিত্ত, না তাঁহার অপার কারুত্ব প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত? রসশাস্ত্রবিদগণ বলিলেন – না, না উদ্দেশ্য তাহা নহে। সে কারণ তিনি 'বেণুবিনোদিয়া' নহেন।, এগুলি সব পরীক্ষামূলক। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার বংশীধ্বনি আকাশস্থ মেঘের গতি রোধ করিতে পারে কি না, স্বর্গের দেবদেবীগণকে আকর্ষণ করিয়া আনয়ন করিতে পারে কিনা, স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে ধর্ম বিপর্যয় ঘটাইতে পারে কিনা, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণের ধ্যান ভাঙ্গাইতে পারে কিনা, ইত্যাদি। যখন তিনি দেখিলেন যে তাহার বংশীধ্বনির অপূর্ব শক্তিতে অসাধ্য সাধিত হইয়াছে তখন তিনি আশ্বস্ত হইয়া চিন্তা করিলেন যে এইবার বোধ হয় তাঁহার বংশীধ্বনি পরম ধৈর্যবতী

প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্যশালিনী, সুমর্য্যাদাসম্পন্না, অশেষ লজ্জাশীলা কুলবতী ব্রজকান্তাগণকে তাহাদের ধর্মের কপাট ভাঙ্গিয়া দিয়া, লজ্জা এবং ধর্মের আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদিগকে উন্মাদিনীর ন্যায় তাহার সমীপে লইয়া আসিতে পারিবে। যদি পারে তাহা হইলেই তিনি বুঝিবেন তাঁহার বংশী শিক্ষার সার্থকতা হইয়াছে। অতএব তিনি ব্রজদেবীগণকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত এবং তাহাদের চিত্তে ভাববিশেষের উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত 'বেণুবিনোদিয়া'। অপর কোন কারণে নহে। ইহাই সশাস্ত্রের অভিমত।

পঞ্চদশ তরঙ্গ

রাধা প্রেম-পূর্বরাগ

প্রেমের বিশ্লেষণে যত প্রকার বৈশিষ্ট্য আছে, সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যই ব্রজবধূগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সব নায়িকা শিরোমণি শ্রীরাধিকাতে পরিদৃষ্ট হয়। সে কারণ এই নায়িকা শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য প্রেমরূপ মানিক্যের পেটিকা।

গগণে চন্দ্র উদিত হইলে যেমন সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং তরঙ্গ কূলকে পরিপূরিত করিয়া দেয়, সেই প্রকার শ্রীমতী রাধার প্রেমের সম্পাতে কৃষ্ণের মাধুর্য্য সিন্ধু শতগুণে পরিবর্ধিত হয়। তখন রাধা প্রেম এবং কৃষ্ণ প্রেমের মধ্যে যেন যুদ্ধ বাধিয়া যায় এবং সেই যুদ্ধে উভয়েই অপরাজিত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন —

"কৃষ্ণমাধুর্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোহে কেহ নাহি হারি।"

শ্রীরাধিকার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য সিন্ধু যেমন উদ্বেলিত হয়, অপরদিকে তেমনি শ্রীকৃষ্ণের নবনব বর্ধমান মাধুর্য সন্দর্শন করিয়া রাধা প্রেমও উদ্বেলিত হইয়া উঠে। রাধা প্রেমের উত্তরোত্তর বর্ধনের ফলে শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য এতই উৎকর্ষ লাভ করে, যে তাহা দেখিয়া নিখিল সৌন্দর্য এবং মাধুর্য্যের আধার স্বয়ং মদন দেব পর্য্যন্ত বিমোহিত হন। এইরূপে মদনকে বিমোহিত করেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম মদন মোহন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে এই মদন মোহন রূপটি বৃষভানু রাজনন্দিনীর সান্নিধ্য ব্যতীত অন্যত্র সম্ভবে না।

"রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদন মোহনঃ।
অন্যথা বিশ্ব মোহোঽপি স্বয়ং মদন মোহিতঃ।

রাধা সঙ্গে যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হন তখনই মদন মোহন। অন্যথায় শ্যাম সুন্দর বিশ্ব মোহন হইলেও মদন কর্তৃক মোহিত হইয়া যান। যেমন সরোবরে পদ্ম কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিতে হইলে প্রভাতি রক্তিমার প্রয়োজন, যেমন কুমুদকে বিকশিত করিতে হইলে চাই সুধাংশু কিরণ; সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য ফুটাইতে হইলে

রাধার কিরণচ্ছটার প্রয়োজন। ইহা শ্রীরাধার মহাভাবের এক অদ্ভুত বৈচিত্র্য। শ্রীরাধার প্রেম অনুরাগের শেষ সীমা অতিক্রম করিয়া মহাভাবে গিয়া উপনীত হয়। শৃঙ্গার রসের দ্বারা শৃঙ্গার রসরাজ শ্রীকৃষ্ণকে সম্যকরূপে বশীভূত করেন। শৃঙ্গার রসেরদুইটি দিক—একটি বিপ্রলম্ভ অপরটি সম্ভোগ। উভয় দিকই শ্রীরাধার প্রেমকে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ প্রকারে অভিব্যক্ত হয়—যথা পূর্বরাগ প্রেমবৈচিত্ত্য মান এবং প্রবাস। অতএব পূর্বরাগ বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত। শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি পূর্বরাগের সংজ্ঞা দিয়াছেন।

"রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবনাদিজা।

তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ সউচ্যতে।" (শৃঙ্গার ভেদ প্রঃ ৫)

যে রতি নায়ক নায়িকার সঙ্গমের পূর্বে দর্শন এবং শ্রবনাদি হইতে উৎপন্ন হয় যাহা বিভাবাদি সংযোগে অপূর্ব আস্বাদময়ী হইয়া উঠে পণ্ডিতগণ তাহাকে পূর্বরাগ বলেন।

পূর্বরাগ প্রত্যেক নায়িকার মধ্যে দৃষ্ট হয়, কিন্তু রতিভেদে ইহার উৎকর্ষ। কুব্জার পূর্বরাগ সাধারণ পূর্বরাগ। মহিষীবৃন্দের পূর্বরাগ সামঞ্জস পূর্বরাগ এবং সমর্থারতির পূর্বরাগ প্রৌঢ়।

কখন দূতী মুখে কখন সখী মুখে কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করিয়া কিম্বা চিত্রে কৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়া কিম্বা কখন দূর হইতে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া শ্রীরাধার পূর্বরাগ উদ্ভূত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের নব পরিচয় লাভ করিয়া শ্রীরাধার প্রেম ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া প্রগাঢ় অনুরাগে পরিণত হয়। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ বিবিধ পদাবলীতে শ্রীরাধার পূর্বরাগ কীর্তন করিয়াছেন।

সাক্ষাৎ দর্শনের পূর্বে কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করিয়া তিনি ভাবে বিভোর হন। নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম নামের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। শ্যাম নাম কর্ণের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া তাঁহার মর্মস্থল বিদীর্ণ করে। কৃষ্ণনাম তাঁহার হৃদয় মধ্যে বাসা নির্মাণ করে। নামের মধ্যেই যখন এত মাধুর্য নিহিত তখন তাঁহার অঙ্গস্পর্শে যেকি অবস্থা হয় তাহা কল্পনাতীত। প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস তাঁহার সুললিত পদে তাহার পরিচয় দিয়াছেন.—

"সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম

কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো।

আকুল করিল মোর প্রাণ॥

না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পাবে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ কবিল গো
কেমনে পাইব সই তাবে॥
নাম পবকাশে যাব, ঐছন কবিল গো
অঙ্গেব পবশে কিবা হয়।
যেথানে বসতি তাব, নয়নে দেখিয়া গো
যুবতি ধবম কৈছে বয়
পাশবিতে কবিমনে, পাশবা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতি কুল নাশে
আপনাব যৌবন যাচায়।"

তৎপবে চিত্রাঙ্কনে নিপুন তন্ত্রা সখী বিশাখা কৃষ্ণেব আলেখ্য প্রস্তত কবিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। সে আলেখ্য দেখিয়া তিনি সজ্ঞাহীনা হইলেন। এক অপূর্ব মবতি, এবং অমিয়া লাবণী চিত্রেব মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিয়া তিনি আর ধৈর্য্য বক্ষা কবিতে পারিলেন না। এই মনে হয় প্রাণ মাতান রূপ চিত্রে প্রদর্শন কবিবাব জন্য, তিনি বিশাখাকে তিবস্কার কবিলেন। "তুই আমার প্রিয়সখী হইয়া আমাকে কেন বিপদে নিক্ষেপ কবিলি। আমি তো কিছুতেই ধৈর্য্য বক্ষা কবিতে পারিতেছি না। এ চিত্র যেন আমার দিকে তাকাইয়া ডাক দিতেছে, তাঁহাব রূপ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমার চিত্তকে গ্রাস কবিয়া ফেলিতেছে। এ রূপটিকে আমি চিত্ত ছাড়া কবিতে গেলেও সে আমাব চিত্তকে ছাড়িতেছে না।

তৎপবে কালিন্দীকূলে ননদিনীর সহিত যমুনাব জল আনিতে গিয়া নবীন কিশোব শ্যামকে দূব হইতে দেখিলেন। তাঁহাব তনু ঢল ঢল, বর্ণ কোটি কামকে পবাজিত কবিতেছে, কোটি শশিজিত তাঁহাব বদন ভ্রূ বক্রাকৃতি ধনুঃ সম। মস্তকেব চূড়া বামে হেলা, সে চূড়া ময়ুব চন্দ্রিকায় সুশোভিত। অলকা বলিত মুখমণ্ডল কুঞ্চিত চূর্ণ কুন্তলে পবিবেষ্টিত। কদম্ব বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান। চাহনি চঞ্চল এবং বক্র, কামিনীমন বন্ধন কবিবার ফাঁদতুল্য। ভুবন মোহন রূপ সন্দর্শন করিয়া শ্রীরাধা আপনাকে ভুলিয়া গেলেন। এক কৃষ্ণবর্ণ কিশোব তাঁহাকে গ্রাস কবিল। তখন তিনি আক্ষেপ কবিয়া বলিলেন, "হায় হায় এ আমাব কি হইল, আমি এক পুরুষেব নাম শুনিয়া তাহাকে প্রাণ সমর্পণ করিলাম। অপর এক পুরুষকে চিত্রে দেখিয়া

তাহাকে বরণ করিলাম। (আর এক নবীনাকৃতি কিশোর শ্যাম পুরুষকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া কুল, মান ধৈর্য্য লজ্জা প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে প্রাণ বল্লভ রূপে বরণ করিলাম।) হায় একসঙ্গে তিন পুরুষে আসক্তা হইলাম। এখন আমার উপায় কি? আমার ন্যায় অসতী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর কে আছে?

শ্রীমদুজ্জ্বলে শ্রীমতী রাধোক্তি :—

"একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরম্
সান্দ্রোন্মাদ পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধ ঘনদ্যুতির্মনসিমেলগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক পুরুষত্রয়েরতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥"

(স্থায়িভাব প্রকরণ) বিদগ্ধ মাধব নাটক ২।১৯ অনুচ্ছেদ

(পূর্ব্বরাগে উত্তম নায়িকার মধ্যে যে দশ দশা রসশাস্ত্রকারেরা বর্ণন করিয়াছেন সে সমুদয় রাধা প্রেমে পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।) এই দশাগুলি তাঁহার হৃদয়কে ব্যাকুলিত করিয়া অনির্ব্বচনীয় বেদনা অনুভব করায়। উজ্জ্বলনীলমণি শৃঙ্গার ভেদ প্রকরণে প্রবাস বিপ্রলম্ভে শ্রীকৃষ্ণ বিরহের যে দশ দশার কথা লিখিয়াছেন, [illegible] —

'চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ॥" (১৬৭)

চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ তানব (অঙ্গক্ষীণতা), মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ [illegible] মৃত্যু। এই দশদশাই রাধার বিগ্রহকে ব্যাকুল করিয়া তুলে। সমর্থা রতিমতী শ্রীরাধার [illegible] প্রৌঢ়। পূর্ব্বরাগে প্রৌঢ়তা নিবন্ধন এই দশদশাও প্রৌঢ়। এগুলি [illegible] নহে।

তিনি নির্জ্জনে বসিয়া কুলের [illegible] অরুণ বসন পরিধান করিয়া মহাযোগিনীর বেশে কাটেন [illegible]। যেদিকে তাকান সেই দিকেই তার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি।

[illegible] কৃষ্ণ যার অন্তরে বাহিরে
যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাঁহার গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

[illegible] পুরঃ স্ফুরতি পার্শ্বযুগেচপশ্চা
চ্চিত্তস্য বৃত্তিষু দৃশো র্বিষয়েচ শশ্বৎ।
শ্রীগণ্ডয়োশ্চ কুচয়োস্তরলে যতোঽস্যাঃ
শ্রীরাধিকা তদিহ কৃষ্ণময়ী তি সত্যম্॥ (১১ সর্গ ১৩৫ শ্লোক)

শ্রীরাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীরাধিকার সম্মুখে, দুই পার্শ্বে, পশ্চাদ্ভাগে তাঁহার সর্বমনোবৃত্তিতে, নেত্র গোচরে, দ্যুতিশীল গণ্ড দ্বয়ে স্তন যুগলে এমন কি তাঁহার কণ্ঠে হারের মধ্যস্থিত মণিতে কৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। অতএব এ সংসারে শ্রীরাধিকা যে কৃষ্ণময়ী সে বাক্য সত্য।

তিনি কখন নভোমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের দিকে উদাস নয়নে তাকাইয়া থাকেন কখন অপলক দৃষ্টিতে ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠের দিকে চাহিয়া থাকেন। কখন তমাল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করেন। কখন কেশ দাম হইতে মল্লিকা মালা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কেশের বর্ণ দেখিতে থাকেন। কখন যমুনার নীলজলে অঙ্গ আবৃত করিয়া থাকেন। উদ্দীপন বিভাবের মধ্য দিয়া যেমন তাঁহার কৃষ্ণস্ফূর্তি হয়, তেমনি সেই উদ্দীপন বস্তুর মাধ্যমে বিরহ ব্যাকুল চিত্ত একটু সান্ত্বনা লাভও করে।

কবি চণ্ডীদাস শ্রীরাধার পূর্বরাগের মর্মান্তিক বেদনা [illegible] নিম্নে কতিপয় পদাবলীর মধ্য দিয়ে আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন —

"রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারো কথা
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ন তারা
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা।
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি
একদিঠ করি, ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সানে।

পূর্বরাগ দশায় শ্রীরাধার কৃষ্ণের জন্য উন্মাদ চেষ্টা দেখিয়া ভূতাবেশ মনে করতঃ মধুরা পৌর্ণমাসী দেবীর নিকটে বিষাদভরে বলেন, "এই রাধা সম্মুখে ময়ূর পুচ্ছ খণ্ড দেখিলে অতিশয় কম্পিতা হন, গুঞ্জামালা দর্শনে মুহুর্মুহু অশ্রু বিসর্জন সহকারে

ফুৎকার করতঃ রোদন করেন। মনে হয় কোন নবীন গ্রহ এই বালিকার চিত্তকে আক্রমন করিয়াছে।” (বিদগ্ধ মাধব নাটক ২য় অঙ্ক ১৫ অনুচ্ছেদ)

তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, কবরী অসংবদ্ধ। কেশগুচ্ছরুক্ষ, তৈল বিবর্জিত যোগিনীর স্থায় জটাজালে পরিণত। তিনি মোহগ্রস্তা এবং মৃত্যুর পারে আসিয়া উপনীতা। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় তখন শ্রীরাধার বিরহোত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের ধুমে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুব্ধ। সমগ্র বৃন্দাবন এমনকি যাঁহারা রাধা গোবিন্দের মিলনের বাধা সৃষ্টি করিতেন তাঁহারা পর্য্যন্ত রাধার শোকে মুহ্যমান। কারণ তাঁহারা জানেন যে রাধার যদি জীবনাবসান হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে ফিরিবেন না। তখন তাঁহাদের কৃষ্ণ দর্শন চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। ব্রজবাসী মাত্রেই কৃষ্ণ গত প্রাণ। মিলনের প্রতিকূল বিধান রসময়ী লীলার অপূর্ব বৈচিত্র্য।

এমন কি তাঁহার প্রতিপক্ষীয়া নায়িকা শ্রীমতী চন্দ্রাবলীও জানেন যে তাঁহার প্রেম শ্রীরাধার তুলনায় অতি তুচ্ছ। যেটুকু কৃষ্ণ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে মিলে তাহার মূল কারণ শ্রীরাধা। অতএব শ্রীরাধার যদি প্রাণবিয়োগ হয় তাহা হইলে তিনি আর কৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারিবেন না, সে কারণ তিনিও শ্রীরাধার পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিতেন।

রাধার বিরহ জ্বালায় তিন জগৎ পর্য্যন্ত রোদন করিতে থাকে। অগাধ জলে সঞ্চরণশীল মৎস্য, মকরাদি ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করে। নাগলোক ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠলোক গোলোক ভূলোকসকল লোকই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অশ্রু বর্ষণ করে। ইহা শ্রীরাধার বিরহের অবস্থাবিশেষ। দিব্যোন্মাদ, উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি যে প্রকার সাত্ত্বিক ভাব এবং বিভাবাদি থাকিতে পারে তাহা যুগপৎ উত্থিত হইয়া তাঁহার দেহকে ব্যাকুল করিয়া তুলে। ইহা পরবর্ত্তী তরঙ্গে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পদকর্ত্তাগণ কীর্ত্তন পদাবলীর মধ্য দিয়া সেই গভীর বেদনার অনুভূতি আমাদের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। কৃষ্ণ সঙ্গ তৃষ্ণা তাঁহার এতই প্রবল যে যদি তাঁহার দশমী দশা অর্থাৎ মৃত্যু হয় তাহাহইলে তিনি কামনা করেন যেন তাঁহার দেহের পঞ্চভূত কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হয়। অর্থাৎ তাহার দেহের ক্ষিতি যেন কৃষ্ণের গতায়াতের পথে মিশিয়া যায়। তাহার দেহের জল যেন শ্যামকুণ্ডে মিশিয়া মিশে। তাঁহার দেহের জ্যোতি যেন কৃষ্ণের দর্পনে মিশিয়া প্রতিফলিত হয়। তাহার দেহের বায়ু যেন কৃষ্ণের বীজন করিতে পারে। তাঁহার দেহের আকাশ যেন কৃষ্ণের বেণুনাদ লহরীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে।

অপরদিকে বিপ্রলম্ভের মর্মন্তুদ দশার মধ্যে উদ্দীপন বিভাগের সহযোগে যখন কৃষ্ণস্ফূর্তি হয়, তখন তিনি অপরিসীম আনন্দেও অভিভূতা হন। তখন মনে করেন এই ত কৃষ্ণ তাঁহার কাছে, তাঁহাকে ছাড়িয়া তিনি অন্যত্র কোথাও যান নাই। তাঁহার বদনসৌন্দর্য্য মানসনেত্রে পান করিয়া অপরিসীম আনন্দে পরিপ্লুতা হন। এইরূপে বিরহেও মানস মিলন সংঘটিত হয এবং অপূর্ব রসের সঞ্চার করে। সেকারণ পণ্ডিতগণ বিপ্রলম্ভকে 'রস' বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। উপরন্তু বিপ্রলম্ভ বিনা সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান হয় না। "নবিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগ পুষ্টি মশ্নুতে।" বিপ্রলম্ভের মধ্যে মিলনানন্দ জড়িত আছে বলিয়া বিপ্রলম্ভ সঞ্জীবিত থাকে।

এস্থলে শ্রীরাধার যে বিরহদশা বর্ণিত হইল তাহা পূর্বরাগ এবং প্রবাসাখ্য বিরহ একত্র সম্মিলিত করিয়া। মনে হয় ইহাতে কোন অসঙ্গতি বা সিদ্ধান্ত বিরোধ হয় নাই। যাহাহউক পরবর্ত্তী 'প্রবাসাখ্য বিরহ' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রজকন্যাগণের বিরহ বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গৌরাবির্ভাবের কারণ

বিপ্রলম্ভের মর্মন্তুদ দশার আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার মধ্যে বিশেষ পরিচয় পাই। কৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে নয়নের অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া তাঁহার সমস্ত দেহকে পরিপ্লুত করিতেছে। পুলক ও রোমাঞ্চ কদম্ব কুসুমের ন্যায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ভাবয়া উঠিয়াছে। কখন উত্তান নয়ন, কখন যমুনা ভ্রমে সমুদ্রে পতন, কখন দেহ কূর্মাকৃতি সদৃশ। কখন হাস্য কখন রোদন, কখন ভূমিতলে বিলুণ্ঠন, কখন গম্ভীরার প্রাচীরে গাত্র ঘর্ষণ প্রভৃতি অলৌকিক ভাবধারা মহাভাববতী শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভের ভাবদ্যোতক। রাধার প্রেমমহিমা কীদৃক, তাহার নিজ মাধুর্যই বা কীদৃক, এবং সে মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করেন তাহাই বা কীদৃক. এই তিনবিষয় জানিবার বাঞ্ছা লইয়া কৌতুকী কৃষ্ণ পরবর্তী লীলায় শ্রীরাধার ভাবকান্তি পরিগ্রহ করিয়া গৌর রূপে অবতীর্ণ হইলেন। ইহাই গৌরাবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণ।

কোন এক খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক মহাপ্রভুর জীবনী পাঠ করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন তাঁহারা যিশুখৃষ্টের নীচে গৌরাঙ্গদেবকে Prophet হিসাবে স্বীকার করিতে পারেন বটে কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এতবড় Prophet-এর শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল।

বস্তুতঃ প্রেমের উন্নত অবস্থার সম্বন্ধে সাধারণের কোন ধারণা থাকিতে পারেনা। সে কারণ এপ্রকার উক্তি অস্বাভাবিক নহে। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদকে অনেকেই

প্রাকৃত উন্মাদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এমন কি তাঁহার পার্ষদগণের মধ্যে অনেকের এইপ্রকার ধারণা জন্মিয়াছিল। তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয়ও এই প্রকার ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বাতিকগ্রস্ত হইয়াছেন মনে করিয়া তিনি নবদ্বীপ হইতে তাঁহার নিমিত্ত নীলাচলে বিষ্ণুতৈল আনয়ন করিয়াছিলেন এবং স্বরূপ দামোদরের নিকট তৈল রাখিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি অর্থাৎ স্বরূপ দামোদর যেন মহাপ্রভুকে ঐ তৈল মাথায় মাখিতে অনুরোধ করেন। কয়েকদিন গত হইল জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয় স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মহাপ্রভু ঐ তৈল ব্যবহার করিতেছেন কিনা। তদুত্তরে স্বরূপ দামোদর তাঁহাকে জানাইলেন যে মহাপ্রভু ঐ তৈল অঙ্গীকার করেন নাই। তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় অতিশয় দুঃখিত হইয়া রহিলেন। একদিন মহাপ্রভু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি যে আমার জন্য কষ্ট করিয়া নবদ্বীপ হইতে তৈল আনিয়াছ তাহাকি সন্ন্যাসীর পক্ষে ব্যবহার করা উচিত? তাহারচেয়ে তুমি ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে ঐ তৈল দ্বারা প্রদীপ জ্বালাইয়া দাও, তাহাহইলে তোমার সুদূর হইতে তৈল আনা সার্থক হইবে।" পণ্ডিত সে কথায় রুষ্ট হইয়া ঐ তৈলভাণ্ড মহাপ্রভুর পদতলে আনিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং তথায় তৈল স্রোত বহিতে লাগিল। তিনি মহাপ্রভুকে এতই ভালবাসিতেন যে তাহার নিমিত্ত যে তৈল আনা হইয়াছে তাহা আর অন্য কোন দেবতাকে, তিনি যত বড়ই হউননা কেন, দিতে রাজী হইলেন না। পণ্ডিত দুঃখিত হইয়া কপাট বন্ধ করিয়া নিজালয়ে গিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে নানাবিধ অনুনয় বিনয় করিয়া এবং পরিশেষে তাহার গৃহে সেবার অঙ্গীকার করিয়া পণ্ডিতকে কৃতার্থ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের Prophot হিসাবে স্থান কোথায় তাহা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের "অমিয় নিমাই চরিত" গ্রন্থে পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন যেসব অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। নতুবা তাঁহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে পরিচয় আমাদের নিকট চিরকাল অজ্ঞাত থাকিত। যিশুখৃষ্ট নিজেকে "ভগবানের পুত্র" বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। হজরৎ মহম্মদ নিজেকে "আল্লার সেবক" বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেব বহুসময়ে নিজেকে "স্বয়ং ভগবান" বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। নবদ্বীপ লীলায় মহাপ্রকাশের দিনে শ্রীবাস অঙ্গনে তিনি প্রথমে তাঁহার আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন এবং তৎপরে বিবিধ সময়ে বিবিধ স্থানে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট ষড়ভুজ মূর্ত্তি প্রভৃতি ঐশ্বরিক মূর্ত্তি

দেখাইয়া ভগবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। যদি আমরা তাঁহাদিগকে অসামান্য বা মহামানব বলিয়াও স্বীকার করি তাহাহইলে তাঁহারা যে নিজেদের সম্বন্ধে মিথ্যা পরিচয় দিয়া গিয়াছেন একথা কোনপ্রকারে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

অবশ্য শ্রীচৈতন্যের ধর্ম বহুল পরিমানে প্রসারতা লাভ করিতে পারে নাই তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে ধর্মের মানসংখ্যা বাহুল্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। বস্তুতঃ ভাগবত ধর্ম অতীব নিগূঢ় এবং স্বল্প লোকের জন্য এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

যদিও শ্রীরাধার পক্ষে মিলনই কাম্য, বিরহ কাম্য নহে তথাপি জীবের পক্ষে পূর্বরাগ একান্ত কাম্য বস্তু। পূর্বরাগ জীবনে উপস্থিত হইলে বুঝিতে হইবে যে আত্মজাগরণ সুরু হইয়া গিয়াছে। লৌল্যই পূর্বরাগের ভিত্তি। পূবরাগের অনুভূতি যতই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে আরম্ভ করিবে ততই আত্মবিকাশ উন্নত হইতে উন্নততর হইবে। তখন কোন বাধা বিঘ্ন তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। পিছনের ডাক তাহার কর্ণে পৌঁছাইবে না। সম্মুখের ডাকে সে একেবারে ভরপুর হইয়া উঠিবে। দেহাভিনিবেশ একেবারে শিথিল হইয়া পড়িবে। দেহ মন, ইন্দ্রিয় সকল একমুখী হইয়া তন্ময় হইয়া যাইবে। তীব্র বিরহের প্রজ্জ্বলিত অনলে সমস্ত কদর্থ ভস্মীভূত হইবে। মনাবশুদ্ধ সত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইবে। প্রেমময়ের অপরিসীম মাধুর্যের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিবে। তাহার সহিত অভিসার করিবার প্রবল আগ্রহ দেখা দিবে। ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ চতুর্বিধ ফলকে তৃণাদপি অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া: আনন্দ ঘনের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রগাঢ় অভিলাষ জন্মিবে। তৎপরে অপরিচিত পরিচিত হইয়া আপনার প্রিয়তমরূপে স্ফুরিত হইবেন। তখন মনে হইবে তিনি কত প্রিয়তম।

> "তোমারে বলেছে যারা পুত্র হ'তে প্রিয়;
> বিত্ত হতে প্রিয়তর যা'কিছু আত্মীয়।
> সব হ'তে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,
> আত্মার অন্তরতম, তোমারি চরণে,
> পাতিয়া রাখিতে চাই হৃদয় আমার।"

পূর্বরাগ আত্মজাগরণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে পূর্বরাগের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয় এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই পূর্বরাগের কবিতা। প্রবল উৎকণ্ঠা পূর্বরাগের আশ্রয়। এই সুতীব্র ব্যাকুলতা যে কখন কাহার মধ্যে আচম্বিতে প্রকটিত হইবে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। নাম সংকীর্ত্তনের মধ্য দিয়া; চিত্রপট কিম্বা বিগ্রহ দর্শন

করিয়া ভাবাবেশ আসিতে পারে। স্ফুরণের মধ্য দিয়া সাক্ষাৎ দর্শনের স্থায় তাঁহার রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই পঞ্চানন্দে বিভোর হইতে পারা যায়।

অনেকে ধারণা করেন যে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগের মধ্য দিয়া নরনারীর স্বাভাবিক মিলন পিপাসা সূচিত হয়। কিন্তু এই যুক্তি ঠিক যেন গাড়ীর সম্মুখে ঘোড়া সংলগ্ন না করিয়া ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী সংযোজনা করা (To put the cart before the horse) নবনারীর ক্ষুদ্র প্রেমে অতৃপ্ত হইয়া এবং অস্বস্তি বোধ করিয়া মন ভূমা প্রেমের দিকে উধাও হইয়া ছুটিতে চায়, এ দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণে সাধক জীবনে পরিদৃষ্ট হয়। প্রাকৃত নায়ক নায়িকার মধ্যে যদি কোন ভাগ্যোদয়ে তীব্র মিলন বাসনা জাগরিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ইহাও সত্য যে সে স্বতন্ত্র উৎকণ্ঠা কখন ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছায় তাহা পর্য্যবসিত হয় না। ক্ষুদ্রগণ্ডী ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া সে মহা প্রেমের দিকে ছুটিতে চায়।

"কুঁড়ির ভিতর কাঁদছে গন্ধ অন্ধ হ'য়ে
কাঁদিছে আপন মনে,
কুসুমের দলে বদ্ধ হ'য়ে
করুণ কাতর স্বনে .
কাঁদিছে সে হায় হায়।
বেলা যায় বেলা যায় গো
ফাগুনের বেলা যায় "

কবি যেমন জীবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়া (realisation of all inner potentialities এবং ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিতে চান, বৈষ্ণব সাধকগণও ক্ষুদ্রগণ্ডী ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া ভূমা প্রেমের সহিত পরিচিতি লাভ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হন। তখন তাঁহাদিগকে কেহই বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। "বেলা যায় বেলা যায়গো" কোন বাউলের মুখে এই প্রকার গান শুনিয়া, লালাবাবুর চমক ভাঙ্গিয়া গেল। কবি নির্ঝরের অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রভাত পাখীর গান শুনাইয় দিয়া, তাহার স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দিলেন এবং সে যেমন সকল বাধাবিঘ্ন দূরে ফেলিয়া দিয়া প্রাণের আবেগে সমুদ্রের দিকে ছুটিতে লাগিল, সেই প্রকার 'বেলা যায়, বেলা যায় গো' এই গান শুনিয়া লালাবাবুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি তাঁহার অতুল বৈভব, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সকলই তৃণের স্থায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। ইহা পূর্বরাগের নিদর্শন। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী প্রমুখ সাধকবর্গের জীবনে এইপ্রকার পরিবর্তন দৃষ্ট হয়।

বিল্বমঙ্গল

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর চিন্তামণি নামক এক বেশ্যার প্রেমে অন্ধ হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ঝঞ্ঝাসংকুল রজনীতে কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিলেন। কাষ্ঠ ভ্রমে মৃতদেহের উপর আরোহণ করিয়া তরঙ্গায়িতা নদী পার হইলেন। তৎপরে চিন্তামণির গৃহে আসিয়া দেখেন দ্বার অর্গলবদ্ধ। ঘন ঘন মেঘগর্জনের মধ্যদিয়া তাঁহার আকুল আহ্বান কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। তখন সর্পকে রজ্জু মনে করিয়া তাহার পুচ্ছকে অবলম্বন করতঃ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। ভীষণ এক শব্দ হইল। চিন্তামণি তাঁহার সহচরী বৃন্দের সহিত আসিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন যে সে বিল্বমঙ্গল; তাহার গাত্রহইতে তখনও শবের পূতিগন্ধ নির্গত হইতেছে। যাহাকে রজ্জু মনে করিয়াছিলেন সেই কালসর্প তখনও প্রাচীর গাত্রে বিদ্যমান। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া চিন্তামণি একেবারে হতবাক এবং স্তম্ভিতা হইয়া গেলেন। একি দুর্দ্দমনীয় মিলনোৎকণ্ঠা। প্রাবৃটের ঘনঘটাচ্ছন্ন গভীর রজনীতে যখন কেহই ঘরের বাহির হইতে পারেন', একটা পশুপর্য্যন্ত রাস্তায় দেখা যায়না, এমন অবস্থায় সে কিনা আমার ন্যায় একটি বারবণিতার তুচ্ছ প্রেমে অভিভূত হইয়া সকল বিপদ আপদ তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে আমার কাছে প্রেম নিবেদন করিতে।

তখন চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে বলিলেন "দেখ তুমি যে গভীর প্রেম আমার নিমিত্ত পোষণ করিয়া রাখিয়াছ, তোমার সেই অকৃত্রিম প্রেম যদি রাধারমণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে পার, তাহাহইলে তোমার এ প্রেম সার্থকতা লাভ করিবে।"

এক কথাতেই তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। এই তিরস্কার উত্তর জীবনে তাহার পুরস্কার রূপে গণ্য হইল। পাশ্চাত্য কবি সাহিত্যিক johnson বলিয়াছেন :—
:Abuse is often of service'. তখন উভয়ের জীবনে আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হইল। চিন্তামণি এ দৃশ্য দেখিয়া কৃত পাপের জন্য অনুশোচনানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে এ নারকীয় জীবন আর বহন করিবেন না। এইপ্রকার রূপের মোহ বিস্তার করিয়া কাহাকেও প্রতারণা করিবেন না।

সমস্ত রাত্রি তাঁহারা একত্রে মিলিয়া রাধাকৃষ্ণের ভজনগান করিতে লাগিলেন। নব জাগরণ সুরু হইয়াগেল। রাত্রি প্রভাত হইলে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে প্রণাম করিয়া তাঁকে বর্ত্মোদ্দেশী গুরুরূপে বরণ করিলেন। তৎপরে সোমগিরি নামক এক পরম বৈষ্ণবের নিকট গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পরম রসের সন্ধানে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। গভীর সাধনার ফলে রসানুভূতি লাভ করিয়া অত্যাশ্চর্যরূপে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের অপূর্ব মাধুর্য মণ্ডিত শ্লোকাবলী তাঁহার শ্রীমুখ হইতে স্বতঃ নিঃসৃত

হইতে লাগিল। তিনি প্রথমেই চিন্তামণিকে বন্দনা করিয়া মঙ্গলাচরণরূপ শ্লোকে বলিলেন,

"চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে।
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান শিখিপিঞ্ছমৌলি॥
যৎ পাদ কল্প তরু-পল্লব-শেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বর রসঃ লভতে জয়শ্রীঃ।"

এই মঙ্গলাচরণ রূপ শ্লোক হইতে জানা যায়, গুরুত্রিবিধ। প্রথম বর্ত্মগুরু অর্থাৎ যিনি পথের সন্ধান দেন। অথবা যাঁহার তিরস্কার বাক্যে ভগবদ্বিমুখ চিত্ত ভগবদুন্মুখ হইয়া উঠে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের পক্ষে চিন্তামণি নামক বেশ্যা তাঁহার বর্ত্মগুরু। দ্বিতীয়—মন্ত্রগুরু অর্থাৎ যিনি কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিয়া ভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া দেন। বিল্বমঙ্গলের পক্ষে সোমগিরি নামক এক পরম বৈষ্ণব তাঁহার মন্ত্রগুরু। তৃতীয়—শিক্ষাগুরু অর্থাৎ যাঁহার মস্তকে চূড়া ময়ুর পুচ্ছ দ্বারা সুশোভিত সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যষ্টি জীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেন এবং বিবেকের পালে হাওয়া তুলিয়া দিয়া সৎপথে পরিচালিত করেন। তিনি সর্বজীবের শিক্ষাগুরু। অন্তরে অবস্থিত থাকেন বলিয় তিনি চৈত্য গুরু নামে অভিহিত।

শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য মাধুর্য্য বর্ণন করিতে গিয়া তিনি প্রথমে তাঁহার নখদ্যুতির বর্ণনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণকে কল্পতরুর সহিত তুলনা করিলেন কারণ ইহা সর্বার্থপ্রদ। চরণের অঙ্গুলিগণকে কল্পতরুর পল্লবের সহিত তুলনা করিলেন। নখাগ্রগণকে পল্লবের অগ্রভাগের সহিত তুলনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার নখাগ্রগণ এতই শোভাসম্পদ এবং দ্যুতি শীলতায় উজ্জ্বল এবং মনোহর যে সে শোভাসম্পদ কি পার্থিব কি অপার্থিব কোন বস্তুর সহিত উপমিত হইতে পারে না। যখন তিনি কোন উপমানের দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না, তখন তিনি শ্রীরাধার মধ্য দিয়া তাহার সমাধান করিলেন। তিনি বলিলেন, জয়শ্রী অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মী দেবীরও যিনি অংশিনী সেই রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পদনখসৌন্দর্য্যে এতই আকৃষ্ট হন যে লজ্জাবনত বদনে এবং সতৃষ্ণনয়নে তাহাদের প্রতি চাহিয়া থাকেন এবং তাহা হইতে যে লীলারস নিঃসৃত হইতেছে সেই রসের লোভে শ্রীকৃষ্ণ চরণে আত্মসমর্পন করিয়া স্বয়ম্বর সুখ অর্থাৎ শৃঙ্গার রস সম্বন্ধি প্রেমামৃত আস্বাদন করেন।

এই অমূল্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থ শ্রীগৌরাঙ্গ দেব দাক্ষিণাত্য হইতে বক্ষে ধারণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।

প্রেমের পুজারী শ্রীচণ্ডী দাসের অবস্থাও তাহাই। তিনি রজকিনী রামীর প্রেমকে অবলম্বন করিয়া অতীন্দ্রিয় প্রেমরাজ্যে উন্নীত হইলেন। কবি জয়দেব পদ্মাবতীর প্রেমকে আশ্রয় করিয়া অপ্রাকৃত উজ্জল মহা প্রেম রাজ্যে উপনীত হইলেন।

প্রেম বৈচিত্ত্য

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রেম বৈচিত্ত্য বিরহের অন্তর্গত। উজ্জল নীলমণি প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞা দিযাছেন ;—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষ ধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥"

(শৃঙ্গার ভেদ প্রঃ ১৪৭

প্রোমেৎকর্ষ স্বভাবে প্রিয়তমের সন্নিকটস্থ থাকিয়াও বিরহ ভয়োত্থ যে আর্ত্তি তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে।

শ্রীরাধার প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার পরায়না হইলেও তিনি মনে করেন যে কৃষ্ণ বুঝি তাঁহার কাছে নাই, তাহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন, এই মনে করিয়া সংযোগেও অসংযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তাহাতে তিনি বিরহ যাতনায় মূর্চ্ছিতা হন। কৃষ্ণ অঙ্কে শায়িতা থাকিযাও তাঁহার অনুরাগ এতই প্রবল যে তিনি বিচ্ছেদজ্বরের আতিশয্যে বিবশ বুদ্ধি এবং মহাঘূর্ণাগ্রস্থা হইয়া "হা রমন! হা প্রেষ্ঠ কাসি কাসি? মহাভুজ!" হে রমন, হে মহাভুজ, হে প্রেষ্ঠ তুমি এখন কোথায়?" এই বলিয়া চীৎকার করেন। তাহাতে কৃষ্ণও বিস্মিত হইযা যান এবং বলেন, হে প্রিয়ে আমিতো তোমার নিকটেই আছি এই বলিয়া তাঁহার সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনেন। ইহা শ্রীরাধার প্রৌঢ় অনুরাগ। বিরহে যেমন মিলনের স্ফূর্ত্তি হইযা তাঁহাকে আনন্দ দান করে, সেই প্রকার তিনি মিলনেও বিরহ ব্যথায় অধীরা হইয়া পড়েন।

প্রেমবৈচিত্ত্যের একটি সুন্দর কাহিনী শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত বিদগ্ধ মাধব নাটকে বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন সংঘটিত হইয়াছে সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ এবং সঙ্গে প্রিয় সখা মধুমঙ্গল, পার্শ্বে ললিতাদি সখীবৃন্দ। এমন সময় একটি ভ্রমর আসিয়া শ্রীরাধার মুখমণ্ডলের নিকট গুন্‌গুন্ শব্দ করিতে লাগিল। তাহাতে শ্রীরাধা বিচলিতা হইয়া ভ্রমরকে তাড়াইবার জন্য অনুরোধ করলেন। প্রিয় নর্ম

সখা মধুমঙ্গল ভ্রমরকে তাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "এখন মধুসুধন চলিয়া গিয়াছে।" এই কথা বলিতেই তিনি মনে করিলেন যে বুঝি তাঁহার প্রিয়তম মধুসূদন তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এই চিন্তা করিয়া শ্রীরাধা বিরহ ব্যকুলা হইয়া পড়িলেন। প্রেমবৈচিত্ত্য প্রেমানুরাগের বিচিত্র স্বভাব।

মান।

মান সম্বন্ধে এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে কিঞ্চিদধিক বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি মানের সংজ্ঞা দিযাছেন ;—

"স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা-বাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যংমান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

(স্থায়িভাব প্রঃ ৯৬)

"স্নেহের উৎকর্ষে হয় মাধুর্য্য নূতন।
তাহে অদাক্ষণ্যে 'মান' কহে বুধগণ॥"

(উজ্জ্বলচন্দ্রিকা)

স্নেহ উৎকর্ষতা লাভ করিলে মানের উদয হয়। কারণ স্নেহের পরবর্ত্তী কক্ষা মান। কিন্তু প্রণয না হইলে মানের কোন অর্থ থাকে না। যেখানে প্রণয অতিশয় নিবিড় এবং সান্দ্র, সেইখানেই মানের সার্থকতা। সে কারণ মানের ভিত্তি প্রণয়। মান, স্নেহ এবং প্রণয উভয় ভাবের সম্মিলিত অবস্থা।
মানের বিবিধ সঞ্চারি ভাবের মধ্যে শঙ্কা এবং অসূয়া প্রধান। প্রাচীনমতে স্নেহব্যতীত ভয় হয় না এবং প্রণয় ব্যতীত ঈর্ষাও সম্ভবেনা। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয বলেন কৃতাপরাধনায়ক নায়িকাকে ভয় করেন এবং নায়িকার তৎপ্রতি ঈর্ষা হয়। ভয় এবং ঈর্ষা এই দুই কারণে নায়ক নায়িকার মানাখ্য রস হয়। তন্মধ্যে ভয়ের কারণ স্নেহ এবং ঈর্ষার কারণ প্রণয়। সুতরাং নায়িকা বিষয়ক চির্ত্তাদ্রী ভাব ব্যতীত নায়কের ভয় হয় না এবং নায়ক বিষয়ক সখ্য না হইলে নায়িকার ঈষার উদ্রেক হযনা।

মানমিলনের পরিপন্থী সুতরাং বিরহের অন্তর্গত। ইহা মিলনানন্দকে স্তিমিত করিয়া দেয়। অপর পক্ষে ইহা প্রচুর পরিমাণে মিলনোৎকণ্ঠাকে বাড়াইয়া তুলে। সে কারণ মান রসরূপে পরিগণিত এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম আস্বাদ্য।

প্রগাঢ় প্রেমবতী শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্য কোন নায়িকার মান সাজেনা। শ্রীমতী চন্দ্রাবলীর মান অতীব ক্ষীণ। তিনি দক্ষিণা নায়িকা। অদাক্ষিণ্য যদিও প্রেমের স্বভাবে কোন সময়ে প্রকটিত হয় তথাপি তাঁহার দাক্ষিণ্য স্বভাব গুণে মান বিশেষ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। রুক্মিণী মহিষীবৃন্দের মান শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কারে

পর্য্যবসিত হয়। একমাত্র শ্রীরাধার দুর্জয় মানের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নতি স্বীকার করেন।

মান সহেতুক এবং অহেতুক দুই হইতে পারে। কান্তের গাত্রে অন্যরমনীর ভোগচিহ্ন দেখিয়া যে মানের উৎপত্তি তাহা সহেতুক, এবং মিলনের সময়েও নায়িকার হৃদয় মধ্যে বিনা কারণে .য মান সহসা আবির্ভূত হয় তাহা অহেতুক। আবার বিনাকারণে শ্রীমতী ললিতা দেবীর আদেশেও তাঁহাকে মানবতী হইতে হয়। মানবশতঃ শ্রীমতী রাধারাণী কান্তকে কুঞ্জ হইতে বহিস্কৃত করিয় দিয়া পশ্চাৎ বিলাপ করিতে থাকেন। তাঁহার মিলনের তীব্র উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইলেও তিনি তাঁহার সখী মঞ্জরীদিগকে সাবধান করিয়া দেন যে তাহারা কেহ যেন তাঁহার মানের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া মিলনের উদ্যোগী না হন।

অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার দুজয় মান ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বহুপ্রকা'ব স'ধ্য সাধনা করিযা থাকেন, এমন কি কখন মালিনী বেশ ধাবণ কবিযা "দেহি পদপল্লব মুদারম্" বলিয়া শ্রীরাধার চবণে আত্মনিবেদন করেন। ইহা শ্রীরাধার মানের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীবাধা প্রেমসমুদ্রেব বিচিত্র তবঙ্গ।

ষোড়শ তরঙ্গ

প্রবাসাখ্য বিরহ (মাথুর বিরহ)

প্রবাস বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত। প্রবাস দ্বিবিধ—অদূর এবং সুদূর। ইহা বুদ্ধি পূর্বকও হইতে পারে এবং অবুদ্ধি পূর্বকও হইতে পারে। অদূর প্রবাসের বিরহ সে প্রকার বেদনাদায়ক নহে। ইহা তরল। কারণ তাহাতে নায়কের অনুপস্থিতি স্বল্পকালের নিমিত্ত এবং মিলনও ত্বরান্বিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সুদূর প্রবাস জনিত যে বিরহ তাহা অতিশয় তীব্র এবং মর্মন্তুদ। সুদূর প্রবাসে মিলনের আশা একপ্রকার দুরাশা বলিয়া মনে হয়। সেকারণ তজ্জনিত বিরহবেদনা অত্যুগ্র এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। অপরপক্ষে দীর্ঘ বিরহের পর যে মিলন ঘটে, তাহা আবার সুমধুর। সেকারণ পণ্ডিতগণ সুদূর প্রবাসের পর সম্ভোগকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বলিয়াছেন।

কৃষ্ণ যখন মথুরায় তখন ব্রজভূমির যে কিপ্রকার দুর্দশা হইয়াছিল, শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে বর্ণিত 'উদ্ধব সংবাদ' হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গোস্বামী প্রভুগণ সুবিস্তারে সে মর্মবেদনা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। কবিগণ, চারণগণ এবং বাউলগণ কৃষ্ণবিহনে বৃন্দাবনের উপর যে ঘনীভূত বিষাদের কালোছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার করুণ কাহিনী বিবিধ কবিতায় এবং গানে আমাদের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। 'নন্দপুত্রচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।" "দেখে এলাম শ্যাম তোমার ব্রজধাম, বৃন্দাবন আজ বন হয়েছে।' এবম্প্রকার কবিতা এবং গান শুনিয়া আমাদের কঠিন প্রাণও শোকে বিহ্বল হইয়া উঠে। তাহাদের বিরহব্যাথা শুনিয়া আমরাও বিগলিত হইয়া পড়ি। ইহ ব্রজপ্রেমের 'যাবদাশ্রয় বৃত্তি।

বিরহের মধ্যে মাথুর বিরহ সর্বাপেক্ষা বেদনা দায়ক। পূর্বরাগের বিরহ ততটা বেদনা দায়ক নহে, কারণ ইহাতে নায়ক নায়িকার পরস্পর পরস্পরের সহিত আকর্ষণ আছে এবং মিলনের আশা সমুজ্জ্বল থাকে। রাসে পরিত্যক্তা ব্রজ রমণীগণের যে বিরহ তাহা সুদীর্ঘ ছিল না, অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু মাথুর বিরহ দীর্ঘকাল স্থায়ী। মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই। উভয়ের উভয়ের প্রতি সমান আকর্ষণ নাই। প্রকৃত পক্ষে

ইহা এক পক্ষীয়। উপরন্তু মিলনের পর যে বিরহ তাহা অতিশয় মর্মান্তিক। সে হেতু পূর্বরাগের বিরহ অপেক্ষা প্রবাসের বিরহ অতীব বেদনা দায়ক।

এক প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যক বলিয়াছেন, "short absence quickens love long absence kills it" অর্থাৎ ক্ষণ কাল উপস্থিতি প্রেমকে উদ্দীপিত করে, কিন্তু দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি প্রেমের বিনাশ সাধন করে। ইহা মর্ত জগতে সত্য কারণ মর্ত জগতে প্রেম নাই, যদি বা প্রেমের আভাস থাকে, তাহা হইলে তাহা স্বার্থ পঙ্কিল। তাই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি লৌকিক নায়ক নায়িকা উভয়ের প্রেমকে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়া দেয়। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে, "Human memory is short" অর্থাৎ আমরা যাহাদের সহিত অবাধে মিলা মিশা করি; যাহাদের সহিত আমরা প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হই, তাহারা আমাদের নয়নের অন্তরালে যাইলেই, আমরা তাহাদের কথা ভুলিয়া যাই। কিন্তু এখানে যে প্রেমের অনুশীলন কর হইতেছে সে প্রেম সহস্র প্রতিকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও বিনষ্ট হয় না। কারণ ইহাতে কোন স্বার্থ পঙ্কিলতা নাই, তাই ইহা অমর অক্ষয়। ইহা নিষ্কাম, পবিত্র এবং মহিমোজ্জ্বল।

যদিও মথুরা বৃন্দাবন হইতে দূরবর্তী নহে, তথাপি কেহ কাহারও সহিত দেখা করিতে পারিতেছেন না। ইহা যেন দুইটি দুর্ভেদ্য কারাগারে পরিণত হইয়াছে। নন্দ মহারাজ বা যশোমতী একবারও যে মথুরায় গিয়া তাঁহাদের পুত্রকে দেখিয়া আসিবেন সে উপায় নাই। কারণ কৃষ্ণ কংস নিধন এবং ধর্ম সংস্থাপন করিতে গিয়াছেন। সেখানে গেলে কৃষ্ণের যদি কর্তব্য কর্মের প্রত্যবায় হয় সেই আশঙ্কায় তাঁহারা যাইতে পারিতেছেন না। গোপীগণের অবস্থা আরও বেদনা দায়ক। তাহাদের প্রিয়তম তাঁহাদের সকলকার অনুমতি লইয়া কর্তব্য সম্পাদনার্থ মথুরায় গিয়াছেন নন্দ যশোদাও তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন যে তিনি আবার ফিরে আসবেন। অনুমতি না লইয়া তো তিনি কখন কোন কর্ম করেন নাই। কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য তাহারাও নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে অনুমতি দিয়াছেন। এমনকি কৃষ্ণ যখন দ্বারকা হইতে শ্রীরাধার নিকট পত্র প্রেরণ করেন যে ধর্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে রুক্মিণী প্রভৃতি দ্বারকা মহিষী দিগকে বাধ্য হইয়া বিবাহ করিতে হইবে তখন শ্রীরাধা তাঁহার নিজের সুখের কথা বিবেচনা না করিয়া অসংকুচিত চিত্তে এবং হাসিমুখে তাহাতে অনুমতি দিয়াছিলেন। যদিও ইহা পরবর্তী ঘটনা তথাপি তাঁহাদের নিষ্কাম, অচঞ্চল, এবং সুগভীর প্রেমের পরিচয় দিবার নিমিত্ত প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইল। অতএব এই প্রকার যাঁহাদের

প্রেম, তাঁহারা তাঁহাদের প্রেমের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া কি করিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পারেন ?

অপরদিকে কৃষ্ণের মনেও ব্রজের পূর্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া, তাঁহাকে অশেষ দুঃখ দান করিতেছে। তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম অবহেলা করিয়া মথুরা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিতেছেন না। আর গেলেও তাঁহাকে অচিরে ফিরিয়া আসিতে হইবে এই মনে করিয়া তিনিও যাইতে পারিতেছেন না। এই প্রকারে মথুরা এবং বৃন্দাবনের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। উভয় দেশের মধ্যে একটা দুর্ল্লঙ্ঘনীয় প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে। কবে যে তিনি কার্য্য সমাধা করিয়া ব্রজে ফিরিবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই। আর ফিরিবেন কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

ইহা হইতে মনে হয় সে সুদুর প্রবাসের অর্থ কেবল দুরত্বের উপর নির্ভর করে না, ইহা স্থায়িত্বের উপরও নির্ভরশীল।

এখন শ্রীকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপক। কংসকে নিধন করিয়া যাদবগণকে রক্ষা করিতে হইবে তাঁহাকে পুনরায় ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। গীতার যে মহাবাণী তিনি অর্জ্জুনের নিকট উচ্চারণ করিয়াছিলেন,

"যদাযদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রানায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

(চতুর্থ অধ্যায় ৭-৮)

মথুরায় তাহার পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু তাহা হইলেও, তিনি যে ব্রজের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহা নহে। ব্রজবাসিগণের দুঃখ অপনোদন করিবার নিমিত্ত তিনি বুদ্ধিসত্তম; যদুরাজ মন্ত্রী, ভক্ত শ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে ব্রজে প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ শক্তি প্রভাবে তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া প্রথমে বৃন্দাবনের বৈভব, ঐশ্বর্য্য এবং শোভাসম্পদ চাক্ষুষ দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং মনে করিলেন, এই বৃন্দাবনভূমি তাঁহার প্রভুর যোগ্য লীলা নিকেতনই বটে। কিন্তু তৎপরেই সে দৃশ্য অদৃশ্য হইয়া গেল। তৎপরিবর্তে দেখিলেন যে সেখানে বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই অগ্নিতে সকলে আহুতি প্রদান করিতেছেন, সে অনলের প্রচণ্ড উত্তাপে বৃক্ষসকল দগ্ধীভূত। পত্র পুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া তরুরাজী এখন নতশির নয়। যাঁহার জন্য তাহারা এতকাল ফলধারণ করিত,

তিমি আজ বৃন্দাবনে নাই, তাই তাহারা পত্রপুষ্পফল শূণ্য। সে কারণ বৃক্ষে বৃক্ষে কোকিলের কণ্ঠস্বর নাই, পাখীর কাকলী ধ্বনি নাই। লতা গুল্ম কুসুমিত হয না বলিয়া ভ্রমরের গুঞ্জন নাই। শুক সারী প্রভাতে সুমধুর সুরে কৃষ্ণের ঘুম ভাঙ্গান গান গায় না। ময়ূর ময়ূরী আনন্দে নৃত্য করে না। যমুনা শীর্ণ কাযা—মলিনা। তথায কলকণ্ঠ রাজহংস আনন্দে বিচরণ করে না। জলে কমল ফোটে না। আকাশে বাতাসে আনন্দের হিল্লোল বহে না। সাধের কুঞ্জবন এখন শ্রীহীন এবং অবহেলিত। বৃন্দাবন এখন মৃতপুবী, নিষ্প্রভ, নিস্তব্ধ এবং বিষাদে মলিন। ব্রজে এখন আব বাঁশী বাজে না। ব্রজ এখন নীরব, নিথব এবং নিস্পন্দ।

ব্রজ প্রেমের বিভাগ

ব্রজেব সকলেই কৃষ্ণগত প্রাণ, সকলেব মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম নিহিত আছে বলিযা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রজ প্রেমকে তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন। একটি বিবেকহীন প্রেম. দ্বিতীযটি বিশ্রম্ভ প্রধান প্রেম এবং তৃতীযটি উৎকণ্ঠা প্রধান প্রেম। বিবেক-হীন প্রেম তরুলতা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, প্রস্তব, ধুলি মাটি প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণী এবং অচেতন পদার্থদিগেব কৃষ্ণ বিষযক প্রেমকে বুঝায। বিশ্রম্ভ প্রধান প্রেম সখাদিগের প্রেমকে বোঝায় এবং কতিপয ব্রজ গোপীগণের প্রেমকেও বোঝায। উৎকণ্ঠা প্রধান প্রেম নন্দ যশোদা এবং তদুপরি কৃষ্ণকান্তাগণের এবং সর্বোপবি শ্রীরাধার প্রেমকে বোঝায।

বিবেকহীন প্রেম

বস্তুতঃ পক্ষে ব্রজে বিবেকহীন প্রেম বলিযা কিছু থাকিতে পাবে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সপ্রমাণ কবিয়াছেন তরু, লতা. ওষধি প্রভৃতির মধ্যে প্রাণ আছে। আমাদের শাস্ত্র বলিযাছেন, "অন্তঃসত্তা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমান্বিতাঃ।" প্রস্তর লোষ্ট্র প্রভৃতি যাহাদিগকে আমরা অচেতন পদার্থ বলি, তাহারাও বিশেষ বিশেষ স্পন্দনে স্পন্দিত হয়। প্রাকৃত জগতে যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বৃন্দাবনের কথা তো আরও উর্দ্ধে। বৃন্দাবন চিদাত্মক স্বপ্রকাশ, ইহা জড় বস্তু নহে। তদুপরি শ্রীকৃষ্ণ তাহাদেব মধ্যে স্বকীয প্রেম সঞ্চার করিয়া, তাহাদের মধ্য হইতে পুনরায় প্রেম গ্রহণ করেন। লতা গুল্ম কৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে শিহরিত এবং উৎফুল্ল হয়। শ্রীরাধার চরণস্পর্শে তাহারা ধন্য বোধ করে। তরুলতা, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী এমনকি গিরি নদী সকলেই কৃষ্ণ সেবা করে। কৃষ্ণ সেবা করিতে করিতে, তাহারা পরিতৃপ্ত হয না বলিযা, আক্ষেপ করিযা বলে, আমরা অবিবেকী নিকৃষ্ট জীব আমরা অচেতন, আমরা আর কি করিয়া

কৃষ্ণ সেবা করিব ?" এভাব ব্রজে সকলকার মধ্যে বিরাজমান। রতির উৎকর্ষে ইহার উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। ইহা তাহাদের কৃষ্ণ প্রেমোত্থ স্বভাবসিদ্ধ দৈন্যের লক্ষণ। ভক্ত শ্রেষ্ঠ উদ্ধব মহাশয় ব্রজ প্রেমে অভিভূত হইয়া ব্রজে তার্ণ জন্ম লাভের অভিলাষ করিয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস প্রমুখ বৈষ্ণব ভক্তগণ কদম্ব বৃক্ষ, তমাল বৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষদিগকে ভক্তি ভরে প্রণাম করিতেন। ইহা পৌত্তলিকতা কিম্বা আদিম যুগেব অন্ধ কুসংস্কার বলিয়া উড়াইযা দেওয়া চলে না। কারণ উন্নত প্রেমের স্বভাব এই যে যাঁহাদের সহিত তাঁহাদের প্রেমাস্পদের সম্বন্ধ আছে তাঁহাদিগকে গৌবব বুদ্ধিতে ভক্তি কবা। বিবেকহীন প্রেম বলিযা ব্রজে কিছু নাই—। তবে বৈষ্ণবগণ তাহাদের প্রেমকে যে বিবেকহীন প্রেম আখ্যা দিযাছেন, তাহা কেবল প্রেমের ভেদ নিরূপণ এবং উত্তরোত্তর উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত।

বিশ্রম্ভ প্রধান প্রেম।

ব্রজেব সখাদিগেব 'বিশ্রম্ভময় ভাব এই যে তাঁহাদেব প্রাণের সখা তাঁহাদের ছাড়িয়া অন্যত্র কোথাও যান নাই। তিনি তাঁহাদের মধ্যেই আছেন। এই বিশ্রম্ভময় ভাব লইয়া সখাগণ নিশ্চিন্ত মনে গোচারণে যাতায়াত করেন এবং ধেনু পালন কবেন। ব্রজ গোপীগণেব মধ্যেও কেহ কেহ আছেন, যাঁহাদেব ভাব বিশ্রম্ভ প্রধান। তাঁহাবাও মনে কবেন, কৃষ্ণ তাঁহাদেব নিকটেই আছেন। তাই তাঁহাবা প্রভাতে উঠিযা, কৃষ্ণ গুণ গান করিতে কবিতে গো দোহন কবেন, দধিমন্থন কবেন এবং সেই দধি দুগ্ধ দিয়া উৎকণ্ঠা প্রধান প্রেমের যাঁহাবা আশ্রয, তাঁহাদিগের প্রাণ রক্ষা করেন। এই প্রেমের স্বভাব এই যে কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ কবিযা এক পাও কোথায় যাইতে পারেন না বা যান নি। এই বৃন্দাবনের কোথাও লুকাইযা আছেন। তাঁহাদেব মনে হয় কৃষ্ণ নিজেই বলিযাছেন, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" অতএব তাঁহাদের কৃষ্ণ বিবহ প্রাণে উদয হয না।

উৎকণ্ঠা প্রধান প্রেম

বাৎসল্য প্রেমের উৎকণ্ঠা

ভক্ত প্রধান উদ্ধব মহাশয শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে বিরহ বিধুর ব্রজবাসীগণকে সান্তনা দিবার উদ্দেশ্যে স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়া, মথুরা হইতে নন্দালয়ে আসিযা উপনীত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, যে মহারাজ এবং মা ব্রজেশ্বরীর বদন কমল বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন এবং পাংশুবর্ণ। দেহশীর্ণ এবং অলস। পুত্র বিরহে তাঁহাদের নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে। তাঁহারা কোনক্রমেই নয়নের জল রোধ করিতে পারিতেছেন না। যেদিন হইতে তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কৃষ্ণ তাঁহাদের

ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, সেইদিন হইতে তাঁহাদের আহার নিদ্রা বন্ধ। রন্ধনশালায় আর আগুন জ্বলে না, রন্ধন গৃহ রুদ্ধ, ধূলিকণা এবং কীটপতঙ্গের জালে পরিপূর্ণ। তাঁহারা এখন কাহার জন্য রন্ধন করিবেন, তাঁহাদের পুত্র যে তাঁহাদের কাছে নাই। ব্রজবাসীগণ ফল মূল দুগ্ধ যাহা কিছু তাঁহাদিগকে দেন সে সকলকার কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করেন। অবশিষ্ট সব পড়িয়া থাকে। কৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছে সে আবার ফিরিয়া আসিবে এই আশায় বুক বাঁধিয়া, কোন মতে প্রাণ রক্ষা করেন। কবে আসিবে তাহার আশা পথ চাহিয়া তাঁহারা দিন কাটান।

উদ্ধবকে নিকটে পাইয়া এবং কৃষ্ণের নিকট হইতে আসিয়াছে জানিয়া পুত্র বিরহ বিধুর নন্দ মহারাজ তাঁহার হৃদয়কপাট উন্মুক্ত করিয়া, তাহার নিকট তাঁহাদের শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মা ব্রজেশ্বরী পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। তিনি বলিলেন, "উদ্ধব, যে পুত্রকে গোষ্ঠে প্রেরণ করিতে আমরা ভয়ে ব্যাকুল হইতাম-পাছে কৃষ্ণের কোন বিপদ হয়, এই আশঙ্কায় তাহার দাদা বলরামকে সম্মুখে যাইতে বলিতাম, তাহার সখাদিগকে হিংস্রজন্তু হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে বলিতাম, ক্ষুধা পাইলে খাইবে বলিয়া তাহার অঞ্চলে মিষ্টান্ন বাঁধিয়া দিতাম, গোষ্ঠ হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইলে, আমরা অধীর হইতাম এবং তৎপরে তাহার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইতাম সে পুত্র আজ আমাদের নিকট নাই। বল দেখি তাহার বিহনে আমরা কি প্রকারে প্রাণে বাঁচিতে পারি? তাহার জন্য আমরা কত সমারোহে খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিতাম, আমাদের হাতে না খাইতে পেলে তাহার খাওয়া হইত না, তাহার মায়ের স্তন্যপান করিবার জন্য সে যে কি প্রকার উদ্গ্রীব হইত, তাহার মায়ের রক্তাক্ত চক্ষু দেখিয়া ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিত এবং তাহার মা তাহার চঞ্চলতা নিবন্ধন তাহাকে এক সময় উদুখলে বন্ধন করিয়াছিলেন, এবং আমি আসিয়া যখন তাহার বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া দিলাম তখন সে যে কি প্রকার সস্মিত বদনে এবং প্রফুল্ল নয়নে আমার কোলে ঝাঁপিয়া পড়িত, সে সকল স্মরণ করিয়া আমরা কি দেহ ধারণ করিতে পারি? এখন সে যে কি করিতেছে, কে খাওয়াইতেছে কে তাহাকে যত্ন করিতেছে, এই সকল চিন্তা করিয়া তাহার জন্য শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।"

বিরহের মধ্যে পূর্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া স্বভাবতঃ শোকসন্তপ্ত চিত্তকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রদান করে। তৎপরে তাহার পুত্রের গুণাবলীও বর্ণনা করিলেন। বিরহের মধ্যে এখন ঐশ্বর্য জ্ঞান স্ফুরিত হইল যাহা পূর্বে তাহার উপস্থিতিতে প্রচ্ছন্ন ছিল। মর্তজগতের সহিত মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে মহান ব্যক্তিদিগের যে

সকল মহিমা তাঁহাদের জীবিতাবস্থায় প্রচ্ছন্ন থাকে, তাঁহাদের তিরোধানের পর সে সকল মহিমা :উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়। এখন পুত্রের বিরহে, তাঁহাদের পুত্রের মহিমা জ্ঞান উদিত হইল। পুত্রের অসাধারণ মহিমার কথা তিনি উদ্ধব মহাশয়কে জানাইলেন, "উদ্ধব আমাদের পুত্র তো সাধারণ নহে। সে যে আমাদিগকে কত প্রকারে রক্ষা করিয়াছে তাহা আর কি বলিব? কালীয় দমন, পূতনা নাশন, গিরি গোবর্ধন ধারণ, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি অসুর নিধন দাবানল ভক্ষণ এবং যমলার্জ্জুন ভঞ্জন এবং কুবেরের পুত্রদ্বয়কে মোচন প্রভৃতি কত কি যে অলৌকিক কার্য্য করিয়াছে সে সকল হইতে সে যে কত অসাধারণ তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি।" পূর্বে যে-গুলি তাঁহাদের শিশু গোপালের কার্য্য নহে বলিয়া তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এখন সেগুলি তাহারই কার্য্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি হইল।

এই সুযোগ লইয়া উদ্ধব মহাশয় তাঁহাদের মনকে কৃষ্ণ হইতে সরাইয়া দিবার নিমিত্ত কৃষ্ণের ভগবত্তা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু দেখিলেন তাহাতে কোন ফল হইল না। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের উদয় হইলেও তাহা তাঁহাদের বাৎসল্য প্রেমকে শিথিল করিতে পারিল না।

তাঁহাদের বাৎসল্য প্রেম সকল সময় এবং সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে। তাহার কারণ তাঁহাদের প্রেমে কোন স্বার্থ গন্ধ নাই। তাই তাঁহাদের বাৎসল্য প্রেম বসুদেব দেবকীর বাৎসল্য প্রেমের ন্যায় চপল নহে। উদাহরণ স্থলে বলিতে পারা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ যখন সান্দীপনি মুনির নিকট হইতে পাঠ সমাপন করিলেন, তখন সন্দীপনি মুনির স্ত্রী কৃষ্ণের নিকট হইতে গুরুদক্ষিণা চাহিয়া বলিয়াছিলেন "কৃষ্ণ, তুমি যে ভগবান, তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। অতএব তুমি যদি আমাদের মৃত পুত্রকে আনিয়া আমাদের দেখাইতে পার, তাহা হইলে তোমার গুরুদক্ষিণা পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে!" কৃষ্ণ যমালয় হইতে তাঁহাদের মৃত পুত্রকে আনিয়া তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

দেবকী দেবী তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার মনেও উদয় হইল যে তাঁহার ছয় পুত্র কংস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, অতএব কৃষ্ণ যদি তাহাদিগকে যমালয় হইতে আনিয়া তাহাদিগকে দিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহাদের পুত্র শোক অপনোদিত হইত। অবশ্য কৃষ্ণ তাহা করিয়াও ছিলেন কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রকার কামনা বাসনা তাঁহাদের বাৎসল্য প্রেমকে ভেদ করিত। যেখানে যেখানে ঐশ্বর্য্য স্ফুরিত হয়, সেইখানেই কিছু প্রাপ্তির আশা থাকিয়া যায়। সে কারণ তাঁহারা কখন কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইতে পারেন নাই এবং মা দেবকী তাঁহাকে কখন স্তন্য পান করাইতে

পারেন নাই। আর ব্রজের বাৎসল্য প্রেমে অভিভূত হইয়া ভগবান কৃষ্ণ কখন 'যশোদা স্তনন্ধয়ত্ব স্বভাব' পরিহার করিতে পারেন নাই। অতএব ব্রজের বাৎসল্য প্রেম নিষ্কাম। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যদি কোন দাগ না থাকে তাহা হইলে যে প্রকার উজ্জ্বল হয়, সেই প্রকার তাঁহাদের বাৎসল্য প্রেমে কোন মসী রেখা নাই। ইহা নির্মল এবং নিরাবিল।

উদ্ধবের কথা শুনিয়া নন্দ মহারাজ উত্তর করিলেন, "তুমি আমার পুত্রের ঐশ্বর্য্যের কথা যাহা যাহা বলিলে তাহা আমরা সব জানি। গর্গাচার্য মহাশয় যখন কৃষ্ণের নামোপকরণের সময় বলিয়াছিলেন যে আমাদের পুত্র "নারায়ণ সমোগুণৈঃ।" তাহাও আমরা জানি, আমরা আরও জানি যে তাহার প্রভাব নারায়ণ অপেক্ষাও বেশী। তবুও সে আমাদের পুত্র। তুমি কেবল আমাদের এই কথা বল, সে কুশলে আছে কি'না। সে যদি কুশলে থাকে তবে আমরা নিশ্চিন্ত হই।"

অতএব উদ্ধব মহাশয় আর কি বলিবেন। তিনি ভগবত্তার ঝাঁজ দেখাইয়া তাঁহাদের মনকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহার দৌত্য ব্রজ প্রেমের নিকট ব্যর্থ হইল। এখানে আর একটী কথা স্মরণ রাখার দরকার যে মা ব্রজেশ্বরীর বিরহ নন্দ মহারাজার বিরহ অপেক্ষা আরও মর্মন্তুদ। গোস্বামীচরণগণ মা যশোদার প্রেমকে নন্দ মহারাজার প্রেমের উপরে স্থান দিয়াছেন। তিনি মহাভাববতী শ্রীরাধার সান্নিধ্যে আসিয়া শ্রীরাধার অধিরূঢ় মোহনাখ্য মহাভাবের সহিত নিজরতির সামঞ্জস্য রাখিয়া বাৎসল্য প্রেমের স্বভাবে প্রলাপ করিতেন। নারীর বিরহ এবং প্রেম পুরুষের প্রেম অপেক্ষা যে সমধিক তাহার স ত্র পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রজের বাৎসল্য প্রেম হইতে আমরা জানিতে পারি যে বিরহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান স্ফুরিত হয় কিন্তু তাহা তাঁহাদের পুত্রত্ব বোধকে গ্রাস করিতে পারে না। মহামতি উদ্ধব মহাশয় ঐশ্বর্য্য প্রধান মথুরার বাৎসল্য প্রেমের সহিত পরিচিত ছিলেন বটে কিন্তু এখন ব্রজের বাৎসল্য প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলেন।

ব্রজকান্তাগণের প্রেমোৎকণ্ঠা

শ্রীউদ্ধব মহাশয় ব্রজের বাৎসল্য প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া, কৃষ্ণানুরাগিনী ব্রজ বধূগণের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। তাঁহার প্রভু তাঁহাদের কথাই বিশেষভাবে তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা কৃষ্ণ বিরহে খিন্না হইয়া, স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক গভীর অরণ্য মধ্যে এক শৈলোপরি অবস্থান করিতেছেন। যাঁহারা পূর্বে অসূর্য্যম্পশ্যা কুল রমণী ছিলেন, কৃষ্ণের সন্তোষ বিধানের জন্য কেবল গৃহ হইতে বহির্গতা হইতেন, তাঁহারা এখন বনচারিণী;

যাহারা তাঁহাদের প্রিয়তমের প্রীত্যর্থে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা থাকিতেন, তাঁহারা এখন নিরাভরণা। তাঁহাদের কেশ আলুলায়িত, বসন মলিন। তাঁহাদের আহার নাই, নিদ্রা নাই, সতত কান্তের ধ্যানে নিমগ্না।

সহসা তাঁহাদের সম্মুখে কৃষ্ণের ন্যায় অবয়বধারী এক নবাগত পুরুষকে দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। তৎপরে তাঁহার কৃষ্ণপ্রসাদী বসনভূষণ এবং কৃষ্ণের দত্ত মাল্য হইতে, কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ অনুভব করিয়া বুঝিলেন, যে তিনি কৃষ্ণের নিকট হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, তাঁহাদের মলিন বসনের প্রান্তভাগ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। উদ্ধব মহাশয় ভক্তিসহকারে তাহা মাথায় পাতিয়া লইলেন। কৃষ্ণের দূত মনে করিয়া, তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেম আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা কৃষ্ণেয় ওলাহনে পর্য্যবসিত হইল। তাঁহারা বলিলেন, "কৃষ্ণ আমাদের সহিত শাঠ্য ব্যবহার করিয়া ঐশ্বর্য্যের লোভে, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। আমাদিগকে বিষানলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি শঠ, ধূর্ত্ত শিরোমণি; লম্পট এবং প্রতারক।" এই কথা শ্রবণ করিয়া উদ্ধব মহাশয় অবাক হইলেন। তিনি মনে করিলেন, তাঁহার প্রভু যাঁহাদের প্রেম মাহাত্ম্য বিশেষভাবে খ্যাপন করিয়াছেন, এই কি সেই প্রেম? শ্রুতি-স্মৃতিগণ, যাঁহার মহিমা সর্বদা গান করিয়া থাকেন, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ যাঁহার ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকেন, দেবতাগণ যাঁহার ভয়ে কম্পিত, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি স্ব স্ব কক্ষে অবস্থিত থাকিয়া যাঁহার আজ্ঞায় নিজ নিজ কার্য্য সমাধান করেন, তাঁহারা তাঁহাকে শঠ, ধূর্ত্ত এবং প্রতারক বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন। তাঁহার মনে হইল, হয় তাঁহারা ভগবদ্ তত্ত্ব জ্ঞানহীনা আর না হয় কৃষ্ণ বিদ্বেষিণী।

তাঁহার ভক্তি ঐশ্বর্য্য প্রধান ছিল। কিন্তু **সেই ভক্তি যদি রাগপ্রধান হয় তাহা হইলে তাহার উৎকর্ষ কোথায় গিয়া পৌঁছায়** তাহা দেখাইবার জন্য কৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাকে ব্রজে পাঠানর ইহাই কৃষ্ণের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল।

তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—তাঁহার এবম্প্রকার ব্যবহার, তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক-ই বটে। দেখা যায়, বৃক্ষ যখন ফলশূন্য হয়, তখন সে বৃক্ষে আর পাখী বসে না। লতার কুসুম ফুরাইয়া গেলে, সেখানে আর ভ্রমর গুঞ্জন শোনা যায় না। অধ্যেয় বিদ্যা সমাপ্ত হইলে, গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ থাকে না। তাঁহার ব্রজের সাধ এখন মিটিয়া গিয়াছে, তাই তিনি মথুরায় গিয়া মধুপতি হইয়াছেন। এখন তিনি আর গোপীপতি নন। গোপীপতি বলিয়া যে পরিচয় দিতেন, তাহাও তাঁহার শঠতার পরিচায়ক।

আমরা প্রেম নীতিজ্ঞানহীনা এবং অবলা। সে কারণ তিনি আমাদের সহিত বঞ্চনা করিয়া চলিয়া গিযাছেন।

কিন্তু আমরা তো তাঁহাকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেও ভুলিতে পারিতেছি না। তিনি আমাদের হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন। শত চেষ্টা করিয়াও, আমরা তাঁহাকে চিত্তছাড়া করিতে পারিতেছি না।

আমরা তাঁহার জন্য স্বজন, আর্য্যপথ, ধর্মাধর্ম. দেহগেহমন, অম্লানবদনে বিসর্জন দিয়া, তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিলাম। কিন্তু হায! পতঙ্গ যেমন অগ্নির সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া গিয়া মরণকে আলিঙ্গন করে, আমাদের দশা তাহাই হইল। তিনি আসিবেন বলিয়া চলিয়া গিযাছেন, সেই আশাপথ চেয়ে আমরা বাঁচিয়া আছি। কই তিনি ত আর ফিরে আসিতেছেন না। তাঁহার বিরহে আমাদের নয়নাশ্রু সহস্র ধারায় পতিত হইতেছে। শুনিয়াছি তিনি বিপদভঞ্জন, আর্তজনের দুঃখ বিমোচনের জন্য তাঁহার আবির্ভাব। কিন্তু আমাদের এমনি দুরদৃষ্ট যে আমাদের দুঃখ মোচন করা তো দূরে থাক্, অনাদিকাল হইতে আমাদিগকে দুঃখ দেওযাই যেন তাঁহার মহান ব্রত।

তিনি সুমধুর মুরলীরবে আমাদিগকে আকর্ষণ করিযা তৎসমীপে আনয়ন করিযাছিলেন। আমাদের সহিত কত হাস্য পরিহাসে এবং রাসাদি বিবিধলীলায তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। আমরাই তখন তাঁহার জীবনসঙ্গিনী ছিলাম। কিন্তু আজ তিনি যদুপতি হইযা ব্রজের সব কথা ভুলিযা গিযাছেন। কিন্তু আমাদের পুরাণ স্মৃতিগুলি মানস পটে উদিত হইযা আমাদিগকে অশেষ বেদনা দান করিতেছে।"

শ্রীউদ্ধব মহাশয তাঁহাদের প্রলাপের মধ্য হইতে দুইটি বিষয শিক্ষা করিলেন। একটি প্রেম সম্বন্ধে। ধ্বংসের নিখিল কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যে ভাববন্ধন কখন শিথিল হয় না, সেই নিরবদ্য প্রেম তাঁহাদের মধ্যে সতত বিরাজমান।

আর একটি তাহাদের তিরস্কারের তাৎপর্য্য। তাঁহার প্রভু বলিতেন যে বেদস্তুতি হইতে প্রিয়াগণের তিরস্কার তাঁহার মন অধিক হরণ করিত। এখন তাহার তাৎপর্য্য বুঝিলেন, যে বেদস্তুতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কোন না কোন স্বার্থানুসন্ধান থাকে, কিন্তু ইহাদের প্রেমে তাঁহাকে ভালবাসা ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্য লুক্কায়িত নাই। তিরস্কার দুই প্রকারে হইতে পারে। একটি **প্রেম-সংস্পর্শ-হীন অতএব রোষোদ্দীপক**। আর একটি **গভীর প্রেমসমুদ্র হইতে উত্থিত, উহা হর্ষোদ্দীপক এবং মত্ততা বিধায়ক বরামৃত সদৃশ**। এই বরামৃত পান করিয়া তাঁহার প্রভু যে উন্মত্ত হইতেন, তাহা তাঁহাদের প্রলাপের মধ্য হইতে বুঝিতে পারিলেন।

রাধার প্রেমোৎকণ্ঠা

তৎপরে উদ্ধব মহাশয় দেখিলেন, অদূরে সেই শৈলোপরি কদম্ববৃক্ষ মূলে যোগিনী বেশে এক রমণী বসিয়া আছেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া ঐ সকল অগণিত বিরহ খিন্না রমণী অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল যদিও মলিন, তথাপি তাঁহার চম্পক নিন্দি দেহ হইতে এক অপূর্ব জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া সমগ্র বনানী আলোকিত করিতেছে। তিনি গম্ভীরাশয়া, কান্তের ধ্যানে নিমগ্না। উদ্ধব মহাশয় বহু ধ্যানরত যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র দেখিয়াছেন কিন্তু এইপ্রকার ধ্যান তাঁহার চক্ষে কখন পড়ে নাই। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইনি কে। ইঁহার কথাই তাঁহার প্রভু বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বনবাসিনী, বিষাদিনী, বিরহিনী রমণী। তিনি কখন গাম্ভীর্য্যশালিনী, কখন প্রলাপবাদিনী। পুঞ্জীভূত দুঃখ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাহার দেহকে আক্রমণ করিয়াছে। তিনি তাহার কান্তের জন্য পাগলিনী।

কৃষ্ণ প্রেমাভিব্যক্তির পূর্ণতম পর্য্যবসান কৃষ্ণ প্রেমময়ী, কৃষ্ণপ্রাণাধিকা রাধিকাতে। শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণের নখাঙ্কুল হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত কৃষ্ণ প্রেম দিয়া গড়া। এক কথায় শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমেরই মূর্ত্তি। তাঁহার ভিতরে প্রেমের যে প্রকার উচ্ছলন দেখা যায় তাহা অন্য কুত্রাপি দেখা যায় না। প্রেম বিচারে শ্রীরাধারাণী হইতে অপর সকলকার আসন নিম্নে।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর শ্রীরাধারাণীর যে দিব্যোন্মাদের বিকার হইয়াছিল ও উদ্ধবের দর্শনের স্মৃতি মাত্রে উদ্ধবকে ভুলিয়া গিয়া নিজ চরণসমীপে গুঞ্জনরত ভ্রমরকে দেখিয়া দিব্যোন্মাদবতী অবস্থায় যে চিত্তজল্পময়ী বাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাহা দশটি শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ে "ভ্রমর গীত" নামে প্রখ্যাত, তাহা প্রেমোৎকণ্ঠার চরমতম অভিব্যক্তি। [এষ ভ্রমর গীতাখ্যো দশমে প্রকটীকৃতঃ।" (উঃ নীঃ স্থায়িভাব প্রকরণ ১৯৭)]

দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে উজ্জ্বল নীলমণি বলিয়াছেন, কোনও এক অনির্বচনীয় বৃত্তি প্রাপ্ত মোহন নামক ভাবের ভ্রমাভারূপ অদ্ভুত বৈচিত্র্যকে দিব্যোন্মাদ বলে। এই দিব্যোন্মাদের উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি বহু প্রকারের ভেদ আছে।

দিব্যোন্মাদ প্রাকৃত উন্মাদ রোগ নহে। প্রাকৃত উন্মাদ রোগ মস্তিষ্ক বিকৃতির ফল। প্রাকৃত উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির চিত্ত বৃত্তি বিক্ষিপ্ত, কোনও বিষয়ে চিত্তবৃত্তি নিবেশের ক্ষমতা থাকে না। দিব্যোন্মাদ প্রেমের গাঢ়তার ফল। প্রেমের গাঢ়তা বশতঃ প্রিয় বিরহে প্রিয় সম্বন্ধীয় কোন একটি বিষয়ে চিত্তের নিবিড় আবেশ জন্মে।

এই আবেশ নিবন্ধন সেই বিষয়েই সমস্ত চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হয়, এবং অন্য কোন বিজাতীয় বিষয়ের অনুসন্ধান থাকে না।

উদ্‌ঘূর্ণা—নানা প্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্য চেষ্টাকে উদ্‌ঘূর্ণা বলে। ইহা প্রেমবৈবশ্য। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থানকালে, তাঁহার অনুপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া, ব্রজসুন্দরীগণ নিবিড়:অন্ধকারে কুঞ্জাভিসার করিতেন, কখন খণ্ডিতা ভাবাবলম্বনে মানিনী হইয়া কান্তকে তিরস্কার কবিতেন।

চিত্রজল্প—প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কোনও সুহৃদের সঙ্গে দেখা হইলে, গূঢ় বোষযুক্ত যে ভূরিভাবময় জল্প তাহাকে চিত্রজল্প বলে। ইহা'ত অসংখ্য ভাব বৈচিত্র্য এবং অনির্বচনীব আনন্দ চমৎকাবিতা আছে। ইহার অন্তে প্রবল উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়। একটি ভ্রমরকে তাঁহার চবণতলে গুঞ্জন কবিতে দেখিযা তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের দূত মনে করিয়া শ্রীবাধারাণীর যে প্রলাপ বাক্য, তাহা চিত্রজল্প। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লিখিত হইতেছে এই ভ্রমর যে কে কোন কোন টিকাকার তাহা বলিয়া দিয়াছেন। তাহার প্রিযতম তাঁহার প্রিযার প্রলাপ বাণী শুনিবার উদ্দেশ্যে ভ্রমর রূপে তথায় আসিযাছিলেন।

চিত্রজল্পেব দশটী অঙ্গ—যথা ১) প্রজল্প,) পরিজল্প, ৩) বিজল্প, ৪) উজ্জল্প, ৫) সংজ্জল্প ৬) অবজল্প, ৭) অভিজল্প, ৮) আজল্প, ৯) প্রতিজল্প, ১০) সুজল্প।

এইজল্পগুলি উজ্জল নীলমণিতে এইভাবে দেখান হইযাছে,(স্থায়িভাব প্রঃ ১৯৬-২১৯)

প্রজল্প—ঈর্ষা,অসূযা গর্ব প্রভৃতি সঞ্চারীভাবেব উদ্গমে অবজ্ঞার সহিত প্রিয়তমকে অবিচক্ষণ এবং অনিপুণ রূপে বর্ণনা করা। ভ্রমরকে কৃষ্ণ প্রেরিত দূত মনে করিয়া ঐ চরম বিপ্রলম্ভ দশাতেও শ্রীবাধারাণীর মান হইল। তিনি মনে করিলেন ভ্রমর তাঁহার চরণে পড়িয়া অনুনয কবিতেছে। ভ্রমরের স্বাভাবিক পীতবর্ণ শ্মশ্রু দেখিযা বলিলেন', হে কিতব বন্ধো, মথুরা নাগবীর কুচদ্বযে সংঘৃষ্ট বিলুলিত বনমালার কুঙ্কুম সংঘর্ষে তোর শ্মশ্রু পীত হইয়াছে। অতএব তুই আমার চরণ স্পর্শ করিস্ না। তোর বন্ধুকে বলিস, যদি মান প্রসন্ন করিতে হয, তবে যত মথুবায় নাগরী আছে সে তাহাদেব মান প্রসাদন করুক। কিন্তু তাহার সমস্ত জীবনেও সেই মানিনীগণের মানপরম্পরা প্রসাধিত হইবে না। এই প্রকাব মান প্রসাদন চেষ্টাতে সে বিড়ম্বিত হইবে। অতএব সে অনিপুণ এবং অবিচক্ষণ।

এখানে কৃষ্ণকে কিতব বলায অসূয়া এবং মথুরা নাগরীগণের প্রতি ঈর্ষা এবং 'চরণ স্পর্শ করিস না' এই বাক্যে গর্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

পরিজল্প। প্রিযতমের নির্দয়তা, শাঠ্য, চাপল্য প্রভৃতির বর্ণনা দ্বারা নিজ নৈপুণ্য প্রকাশকে পরিজল্প বলে।

দেবি! আপনি কেন তাঁহার অবজ্ঞা করিতেছেন, তিনি তো আপনার কোন অপকার করেন নি। যেন ভ্রমর এইরূপ গুঞ্জনের দ্বারা বলিতেছে ইহা উট্টঙ্কন করিয়া শ্রীমতী বলিলেন 'তোর প্রভুর দোষ নাই তো দোষ কাহার আছে? দেখ্ ভ্রমর আমরা না চাহিলেও জোর পূর্বক নিজের মোহিনী অধর সুধা মাত্র একবারের জন্য আমাদিগকে পান করাইয়া, সে আমাদের সর্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ইহলোক, পরলোক, সুখাপেক্ষা এমন কি বেদ ধর্ম মর্যাদা পর্যন্ত লঙ্ঘন করিয়া আমরা উন্মাদিনী হইয়া কেবল তাহাকেই সুখী করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমাদের সব ছাড়াইয়া সবহারা করিয়া, সহসা নিজেও ছাড়িয়া অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া গেল। লক্ষ্মী যে তাহার চরণ পদ্মের সেবা করিয়া থাকে সে লক্ষ্মীর নির্বুদ্ধিতা। তাহার চাটুকারদের মুখে তাহার কল্পিত মিথ্যা যশ লক্ষ্মী ধরিতে পারে না তাই আমরা সেরূপ নির্বোধ নহি।' এখানে মোহিনী অধর সুধা পান করাইয়া বলাতে শঠতা, 'সদ্য ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে' নিদয়তা লক্ষ্মীকে নির্বোধ বলায় নিজের বিচক্ষণতা দেখান হইয়াছে।

৩) বিজল্প। এই চিত্রজল্পে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণে স্পষ্ট-অসূয়া, গূঢ় মান ও প্রতি উক্তিতে কটাক্ষ প্রকাশ পায়।

তবুও ভ্রমর গুঞ্জনে বিরত না হইলে, শ্রীরাধারাণী মনে করিলেন ভ্রমর বুঝি, এখন চারণ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে কিছু প্রাপ্তির আশায়, তাই তাহাকে বলিলেন "ওরে ষট্পদ, তুই পশু হতেও নির্বোধ, যে হেতু সর্বহারা আমাদের কাছে অধুনা যদুপতি সেই কৃষ্ণের গুণ বেশী করিয়া গাহিতে ছস-আমরা তো মথুরার নাগরী নহি যে তাহার গুণ শুনিয়া তোকে কিছু পুরস্কার দিব—সে আমাদের একেবারে নিঃস্ব করিয়া গিয়াছে কিছুই রাখিয়া যায় নাই। বরং মথুরায় গিয়া তাহার গুণ গান করিলে তাহার বিলাস কলস মুগ্ধ সেখানকার নাগরীরা তোকে অনেক কিছু পুরস্কার দিবে।"

এখানে প্রথম ভাগে যদুপতি বলিয়া কৃষ্ণের উল্লেখ করায় অসূয়া ও গূঢ় মান এবং সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষোক্তি। অসূয়া শব্দের অর্থ "গুণেষু দোষাবিষ্করণম্।" অর্থাৎ গুণেতে দোষ দেখা।

৪) উজ্জল্প। এই চিত্রজল্পে গর্ব মিশ্রিত ঈর্ষার সহিত কৃষ্ণের কুহকতাবর্ণন ও অসূয়ার সহিত তাঁহার প্রতি আক্ষেপ বর্ণিত হয়।

তবু যেন ভ্রমর বলিতেছে,—দেবি আপনি অযথাই তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন সে সর্বদা আপনাকে ধ্যান করে, আপনি প্রসন্ন না হইলে তাহার নিস্তার নাই

—ইহাই মনে মনে উদ্ভাবন করিয়া লইয়া উন্মাদিনী বলিতেছেন, "ভ্রমর রে, আমি কি তাহাকে চিনি না কপট অথচ মনোহর হাসি ও সর্বনাশা ভ্রুবিলাস এই দুইটা যাহার অস্ত্র ত্রিভুবনে কোন রমণী তাহার দুর্লভ নয়। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও যাঁহার চরণ রজের আরাধনা করেন, সেখানে সামান্যা আমরা কে? তবে তুই তাকে গিয়া বলিস, দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া যাহার হৃদয়বিগলিত হয়—উত্তম শ্লোক এই নাম তাহারই যোগ্য।

এখানে "কোন স্ত্রীই তাহার দুর্লভ নয়" এইবাক্যে কুহকতা লক্ষ্মী যাঁহার উপাসনা করেন বলাতে গর্ব মিশ্রিত ঈর্ষা ও দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া যে দুঃখ পায় বলাতে অসূয়ার সহিত আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়াছে।

৫) **সংজল্প**। এই চিত্রজল্পে আক্ষেপ ভঙ্গীর দ্বারা সোল্লুণ্ঠবচন রীতিতে (ঠাট্টার সহিত প্রশংসা) শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতাদি বর্ণিত হয়।

দিব্যোন্মাদ স্বভাবে মধুকরের স্বাভাবিক গুঞ্জনকে ক্ষমা প্রার্থনা মনে করিয়া শ্রীমতী বলিলেন—তুই মস্তক হইতে আমার চরণ ছাড়িয়া দে, তুই দূর হইয়া যা। শঠ মুকুন্দের নিকট হইতে চাটুকারিতা শিখিয়া আসিয়া এখন আমার তোষামোদ করিতেছিস। আমি তোকেও জানি—তাকেও জানি। আমরা যাহার জন্য সকল ত্যাগ করিয়াছি, সবহারা হইয়াছি সেই অকৃতজ্ঞ সেই অনন্যপতি ব্রজাঙ্গনা আমাদিগকেও ত্যাগ করিয়া গিয়াছে—তাহার সহিত কোন মতেই সন্ধি হইতে পারে না। এখানে মস্তক হইতে চরণ ছাড়িয়া দে' দূর হইয়া যা এই বাক্যে আক্ষেপভঙ্গী এবং উত্তরার্দ্ধে 'যাহার জন্য সকল ত্যাগ করিয়াছি, সে স্বার্থপর অনন্যপতি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে' এই বাক্যে অকৃতজ্ঞতা, শঠতা প্রভৃতি দেখান হইল।

(৬) **অবজল্প**। এই চিত্র জল্পে ঈর্ষা ও ভয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণে কাঠিন্য, কামিত্ব ধূর্ত্ততা হেতু আসক্তির অযোগ্যতা বর্ণিত হয়।

দিব্যোন্মাদ দশায় নির্বেদরূপী সঞ্চারীভাবের অতিশয় গাঢ়তা নিবন্ধন, এখানে শ্যামবর্ণ মাত্রের প্রতি দোষদৃষ্টি আসিয়াছে। অর্থাৎ যাহাদের বর্ণশ্যাম, তাহারা ঈশ্বরই হউক, দেবতাই হউক, আর মানুষই হউক—তাহারা অতিশয় কুটিল, অধার্মিক ও নির্দয় হইয়া থাকে। তাই শ্রীমতী শ্যাম নামটি পর্য্যন্ত মুখে উচ্চারণ না করিয়া বলিতেছেন—"দেখ্ ভ্রমর; সাদার বিপরীত সেও (অর্থাৎ নবদুর্বাদল শ্যাম শ্রীরামচন্দ্র) ব্যাধের মত গুপ্তভাবে নির্দয় হইয়া, বানর রাজ বালিকে হত্যা করিয়াছে, আবার সে স্ত্রীজিৎ (অর্থাৎ সঙ্গে তাহার স্ত্রী আছে সে ব্রহ্মচারী নয়) অথচ শূর্পণখা তাহাকে বিবাহ

কবিতে চাহিয়াছিল বলিয়া তাহার নাক কান কাটিযা, তাহাকে বিরূপ করিয়া দিযাছিল। আবার অপর এক অসিত (শ্যাম) বহ্মচারীব বেশ ধরিয়া (বামন অবতার) বলি মহাবাজাব দান লইযা তাহাকে লাঞ্ছনা কবিযাছিল। অতএব সে অসিতের সখ্যে প্রয়োজন নাই—তবে যে এখনও তাহার কথা বলিতেছি—সে কেবল তাহাব কথাব কি এক মোহন আকর্ষন আছে—কিছুতেই ছাডা যায় না-তাই।"

এখানে বালিবধ রূপ ব্যাপাবটি কাঠিন্য, স্ত্রীজিত শব্দে কামিত্ব, বলিমহারাজার দান লইয়া ইহাতে ধূর্ত্ততা, অসিতেব সখ্যে প্রযোজন নাই এই স্থলে আসক্তিব অযোগ্যতা দর্শিত হইয়াছে।

(৭) অভিজল্প। এই চিত্রজল্পে পাখিগণকেও খেদ প্রদান করে বলিযা তাহাকে ত্যাগ কবা উচিত এইরূপ অনুতাপের সহিত ভঙ্গীতে যাহাতে প্রিয়তমের দোষোদ্গাব করা হয তাহাবই নাম অভিজল্প।

অনন্তব কিছুসময় বিশ্রাম এবং বিচাব কবিযা শ্রীরাধাবাণী বলিলেন—

"ওবে মধুপ আমবা যে সাক্ষাৎ তাহাব বন্ধুত্ব করিযা দুঃখিনী হইয়াছি—ইহা আর বেশী কি? তাহাব চবিত কথাব ও এমনি মোহিনী শক্তি আছে—যে একবাব মাত্র তাহা শ্রবণ কবে, তাহাব সকল দ্বন্দ্ব ভাব নষ্ট হইযা যায এবং সে গৃহত্যাগ করিযা নিজ গৃহ কুটুম্বকে দৈন্য সাগবে ডুবাইযা, নিজেও দীন হইযা পক্ষীব মত গৃহ হইতে গৃহান্তবে ভিক্ষার দ্বারা জীবনধারণ করে।

এখানে 'পাখীদেব তুল্য সাধুগণকেও দুঃখ দান করে বলিযা' তাহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ত্যাগ কবা উচিত। অভিজল্পে এইপ্রকাব অনুতাপ বর্ণিত আছে।

(৮) **আজল্প**। এই চিত্রজল্পে নির্ব্বেদ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণেব কৌটিল্য, দুঃখজত্ব এবং ভঙ্গিতে অন্য সুখদত্ব কীর্ত্তিত হয়। "ওহে মধুপ, আমবা তাহার কপট বাক্যে মোহিত হইযা মহা দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইযাছি। ওবে ভ্রমব, কৃষ্ণসাববধূগণ যেরূপ ব্যাধের কৃত্রিমগীতকেও নিষ্কপট বলিযা শ্রদ্ধা কবতঃ তাহার বাণাঘাতে মমপীডা পায, আমবাও তদ্রূপ সেই কপটেব ছলনা বাক্যে বাবংবার বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহার নখস্পর্শ জনিত পীডায় পীডিত হইযাছি— দখ আমাদেব দশনী দশা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব হে দূত, তুই তাহাব কথা ছাডিযা অন্য কথা বল, তাহাতেই আমবা সুখ পাইব।" এখানে দুঃখ প্রকাশ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের কৌটিল্য, নখস্পর্শদ্বাবা "পীডাদাযিত্ব" এবং অন্য বার্ত্তা বল্ এই উক্তিতে অন্যসুখদত্ব ধ্বনিত হইয়াছে।

(৯) **প্রতিজল্প**। এই জল্পে অনুদ্ধত ভাবে অর্থাৎ স্তুতি ও যুক্তিব সহিত দূতকে

সম্মান করিয়া স্ত্রীজন বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাওয়া উচিত নহে—এই প্রকার বলা হয়।

ভ্রমর নিজ চাঞ্চল্য বশতঃ অন্যত্র যাইলে অথবা দিব্যোন্মাদ অবস্থায় নিজ অনবধান বশতঃ ক্ষণকাল সেইস্থানে অবস্থিত ভ্রমরকে না দেখিতে পাইয়া, স্বাভাবিক প্রগাঢ় প্রেমোৎকণ্ঠায় তাহার অনাদর হইয়াছে আশঙ্কা করতঃ, কলহান্তরিতা দশার ন্যায়, ভাববিশেষে আবিষ্ট হইয়া তত্রস্থিত অথবা পুনরাগত তাহাকে বা অন্য আর একটীকে দেখিয়া শ্রীমতী বলিলেন, "প্রিয়মিত্র! পুনরায় আসিয়াছ? প্রিয়তম কি তোমায় প্রেরণ করিয়াছে? হে মাননীয়,তুমি কি চাও বল? তুমি কি আমাদের মথুরায় লইতে চাও? আমাদের প্রিয়তম সেখানে নাগরীগণের সঙ্গে বিলাস করিতেছে অতএব সেখানে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। যদি বল, সে 'অস্মৎপ্রেমৈকনিষ্ঠ'—তাহা হইলে বলি, একেবারেই নহে। এই ব্রজ হইতে যাইবার সময়ে সে নিত্যবক্ষঃ বিলাসিনী তাহার স্ত্রী লক্ষ্মীকেও তো সঙ্গেই নিয়েছে।"

এখানে 'প্রিয় মিত্র' সম্বোধনে অনৌদ্ধত্য 'মাননীয়' 'এই পদে দূতকে সম্মান ও মথুরা নাগরী গণের সঙ্গে বিলাস ও লক্ষ্মীর কথা বলতে'' স্ত্রীজন বেষ্টিত তাহার কাছে যাওয়া অনুচিত বর্ণিত হইয়াছে।

১০) সুজল্প। এই জল্পে সরলতা হেতু গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়।

এই অন্তিম উক্তিকালে শ্রীরাধারাণী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মনে হইতেছে '—হায়, আমি এতক্ষণ উন্মাদিনী হইয়া কি প্রলাপ বকিলাম। যাহা জিজ্ঞাসা করিবার তাহা জানিতে না চাহিয়া ভ্রমরকে ও প্রিয়তমকে যাহা মুখে আসিয়াছে, এতক্ষণ কেবল তাহাই বলিয়াছি।' এই বলিয়া সরলতা, গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠার সহিত নয়ন জলে ভাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর্য্য-পুত্র কি এখন মথুরায় আছেন?' যেন মধুকর বলিতেছে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় সুখেই আছেন—এইটি কল্পনা করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন, "তিনি কি কখন এই ব্রজের, তাঁহার পিতৃ গৃহের কথা স্মরণ করেন, তাঁহার বন্ধু গোপগণকে কি মনে করেন?" এইরূপ প্রশ্ন করিতে করিতে নিজেদের কথা মনে করিয়া অতি দৈন্য সহকারে আবার বলিতেছেন, "তিনি কি কখন এই দাসীগণের নাম করেন?" এইরূপ বলিতে বলিতে সাক্ষাৎ বিশেষ স্ফুর্ত্তিতে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যাদি অনুভব করিয়া বলিলেন, 'অগুরু হইতেও যাঁহার গন্ধ অতি মনোরম, সেইভুজ কতদিনে আমাদের মস্তকে অর্পন করিবেন?'' বলিতে বলিতে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন।

এখানে প্রথম প্রশ্নে সারল্য, দ্বিতীয় প্রশ্নে নিজেদের কথা বাদ দিয়া গোপগণের কথা প্রশ্ন করায় গাম্ভীর্য্য, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রশ্নে দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীউদ্ধব মহাশয় এতক্ষণ নির্বাক হইয়া শ্রীরাধারাণীর বিচিত্র চিত্রজল্পময়ী বাণী শুনিলেন এবং বিস্ময়ের অতল তলে নিমগ্ন হইলেন। কৃষ্ণ প্রেমানুরাগের যে পরিচয় পাইলেন, তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং অশ্রুতপুর্ব। তখন তাঁহার মনে হইল; যে ব্রজে কিছু-কাল বাস না করিলে এবং তাঁহাদের সংস্পর্শে না আসিলে, তাঁহাদের প্রেম মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে অবগত হইতে পারিবেন না। তাই তিনি ব্রজে দশমাস বাস করিলেন। কৃষ্ণের লীলাস্থলী সব ঘুরে ঘুরে দেখিতে লাগিলেন। ব্রজের প্রতি তরুলতা হইতে আরম্ভ করিয়া দাসগণ, সখাগণ, জনক-জননী প্রভৃতি সকলকার নিকট গিয়া কৃষ্ণের গান গাহিয়া গাহিয়া এবং কৃষ্ণের বিচিত্র কার্য্যাবলীর কথা শুনিয়া আনন্দে কাল কাটাতে লাগিলেন। বিরহ খিন্না ব্রজ কান্তাগণের প্রত্যেকের নিকট হইতে তাঁহারা কি ভাবে স্বজন, আর্য্যপথ দেহ গেহ তৃণের ন্যায় সব পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণকে ভালবেসে বরণ করিয়াছিলেন, সে সকল কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। সর্বোপরি রাধারাণীর দিব্যোন্মাদ হইতে যে প্রেমের পরিচয় পাইলেন, কৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিহার-রাসলীলায় শ্রীভগবানের অদ্ভুত প্রেমাধীনতার বিষয় যে সব জানিতে পারিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হইল যে এই ব্রজ দেবিগণই ধন্য, যাঁহারা সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া মুকুন্দচরণ সেবা করিয়াছেন। অতএব তিনি তাঁহাদের পদরেণু পাইবার মানসে ব্রজে তৃণ, লতা হইয়া জন্মগ্রহণের প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীরাধারাণীকে তাঁহার সখীবৃন্দ কৃষ্ণের গান গাহিয়া যখন তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করতঃ কিঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন তখন উদ্ধব মহাশয় বলিলেন 'দেবি! আপনি অত উতলা হবেন না। তিনি বলেছেন যে তিনি শীঘ্র ফিরে আসবেন। তিনি তাঁহার স্বহস্তে লিখিত বার্তা প্রেরণ করেছেন।" একথা শুনিয়া ব্রজবাসী সকলেই আগ্রহাতিশয্যে কৃষ্ণের পত্র শুনিবার জন্য, সেস্থলে আসিয়া উদ্ধবকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।

পত্রের পূর্বার্ধে তিনি জ্ঞানমার্গের কথা লিখিয়াছেন : তিনি দূরস্থ হইয়াও নিকটস্থ হৃদয়ে যদি ধ্যান করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে তিনি চিত্ত মধ্যে স্ফুরিত হইবেন এবং তাহাতে বিরহ ব্যথা বিদূরিত হইবে। শ্রীরাধারাণী একথা শুনিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। তৎপরে শেষার্দ্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি ব্রজবাসী সকলকার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। জনক জননী, সখা, দাস দাসী গাভী এমন কি

পশু-পক্ষী তরুলতা সকলকার সংবাদ জানিতে চাহিয়াছেন। ব্রজ দেবীগণের সহিত কি ভাবে বিহার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রাণপ্রিয়া রাধারাণীর সহিত যে সকল নিভৃত নিকুঞ্জ ক্রীড়া করিয়াছেন, সে সকল স্মৃতি তাঁহার হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া তাঁহাকে কি প্রকার মর্ম বেদনা দিতেছে তাহার সম্যক পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে শীঘ্রই ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন, সে কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এসকল কথা শুনিয়া তাঁহাদের বিরহানল কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত হইল।

তৎপর দশমাস অতিবাহিত হইবার পর উদ্ধব মহাশয় বিদায় প্রার্থনা করিলেন। প্রতি তরুলতা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ব্রজবাসীগণের নিকট হইতে বিদায় যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীরাধারাণীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! আমি তা'হলে প্রভুর নিকটে গিয়া কি বলবো আদেশ করুন।" তখন শ্রীরাধারাণী বলিলেন, " আপনি তাঁহাকে এই কথাই বলিবেন যে তিনি ব্রজে ফিরে আসলে আমাদের অপরিসীম সুখ হয় বটে, কিন্তু তাতে যদি তাঁহার কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষতি হয়, তা'হলে তিনি যেন ফিরে না আসেন। একথা সত্য যে তিনি যদি ফিরে না আসেন, তা'হলে আমাদের প্রাণান্তক কষ্ট হবে, তথাপি মথুরায় থেকে যদি তিনি অধিকতর সুখীহন, তবে যেন তিনি চিরকাল সেখানেই থাকেন।'

ইহাই অসমোর্ধ্ব প্রেমের পরিচয়। মৃত্যুজনিত দুঃখ স্বীকার করিয়াও প্রাণবল্লভের ঐকান্তিক সুখ কামনা সর্বোচ্চ প্রেমের পরিচয়। ভাগবত রাজ্য ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যে এজাতীয় প্রেমের অভিব্যক্তি নাই।

তৎপরে শ্রীরাধারাণী যখন শুনিলেন যে কৃষ্ণ ব্রজে ফিরিয়া না আসিয়া দ্বারকায় চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার বিরহোত্তপ্ত প্রেম নিঃশ্বাসের ধূমে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এমন কি বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। নরলোক-দেবলোক, গন্ধর্ব লোক, নাগলোক প্রভৃতি সকলেই তাঁহার সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিল। বিপক্ষা নায়িকাগণও রাধারাণীর শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় পীত বসন দ্বারা দেহকে আবৃত করিয়া যমুনাতীরস্থ কুঞ্জের লতাকে অবলম্বন করতঃ অশ্রুমোচন করিতে করিতে এমনি ভাবে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন যে তাহা শুনিয়া তির্য্যক জাতি পর্য্যন্ত রোদন করিয়াছিল।

তাঁহার দশমীদশা অর্থাৎ মৃত্যু সন্নিকটস্থ মনে করিয়া তিনি প্রার্থনা করিতেন যেন তাঁহার দেহের পঞ্চভূত কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হয়। তিনি মৃত্যু অবধারিত জানিয়া তাঁহার প্রিয়সখী ললিতাকে ডাকিয়া কহিলেন, "প্রিয়সখি! তুই আমার

দুটি কথা রাখিস্। আমি প্রিয়তম আসবে বলে একটি মালতীলতা রোপন করিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম যে এই লতা কুসুমিত হ'লে সেই পুষ্প দিয়ে মালা গেঁথে প্রিয়তমে'র গলায় পরায়ে দেব। অতএব যদি আর্যপুত্র কখন ফিরে আসেন, তা'হলে তুই আমার প্রতিভূ হ'য়ে এই লতার কুসুম দিয়ে মালা গেঁথে তাঁকে পরায়ে দিস্ আর বলিস যে তাঁর দাসী রাধার বড় সখ ছিল যে এই মল্লিকা প্রসূনের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করবে।

আর একটি কথা তোকে বলি, আমি বড় সাধ করে একটি মূল্যবান মণিমাণিক্য খচিত হার প্রস্তুত করে রেখেছি। মনে করেছিলাম, তিনি এলে আমি এই হার পরিধান করে তাঁকে আলিঙ্গন করবো। কিন্তু যখন তিনি এখনও এলেন না এবং আমার দশমী দশা উপস্থিত, তখন তিনি যদি কখনও আসেন, তা'হলে তুই এই হার পরে আমার প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁকে আলিঙ্গন করিস্ এবং বলিস যে তাঁর রাধা এই দুই কামনা রেখে চলে গেছে।"

কবি বলিয়াছেন যে গান যত মর্মন্তুদ সে গান তত মধুর। কিন্তু রাধার বিরহ ব্যথা যে কত মর্মস্পর্শী তাহা ভাগবত ব্যতীত আর কোন গ্রন্থই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। উপরন্তু এই প্রকার দীর্ঘ বিরহের পর মিলনেরও কোন নিশানা দেখা যায় নাই। যিনি এক নিমিষের অদর্শনকে যুগ পরিমিত কাল বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহার পক্ষে এই দীর্ঘ বিরহ যে কত মর্মন্তুদ তাহা মন এবং বাক্যের অগোচর।

প্রেমের পরিণতি কেবল দুঃখ আর দুঃখ। ইহা প্রাকৃত জগতেই হউক আর অপ্রাকৃত জগতেই হউক, উভয় জগতে সত্য। যাঁহারা ভালবাসার ছবি আঁকিয়াছেন, তাঁহারা তাহা কেবল দুঃখাত্মক করিয়া রাখিয়াছেন। তাই কোন ভক্ত ব্যাজস্তুতি-চ্ছলে বলিয়াছেন, "যদি সংসারে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে চাও, তাহা হইলে গোপবধূবিট্ শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিও না। অপর দিকে জগতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কবিগুরু গাহিয়াছেন —

> "ভালবেসে যদি সুখ নাহি
> তবে কেন, তবে কেন
> মিছে এ ভালবাসা।"

ভাগবতের মধ্যদিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ফিরিয়াছিলেন কি না, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায় না। সে কারণ ভাগবত বিয়োগান্তক কাব্য রূপে পর্যবসিত হইয়াছে। পরবর্তীতরঙ্গে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

সপ্তদশ তরঙ্গ

ভাগবত

জগতের ইতিহাসে শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আর নাই। সাম্প্রদায়িকতার ভাব বর্জন করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে বুঝা যায় যে ইহা যে কেবল হিন্দুদের অথবা ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহা নহে, ইহা বিশ্বের দরবারে এক অমূল্য সম্পদ। কি সাহিত্যে, কি ভাব মাধুর্যে, কি দার্শনিক তত্ত্ব বিচারে ইহা অনবদ্য। মহাপুরাণের যে দশটি লক্ষণ যথা—সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয় সবগুলিই এই গ্রন্থে উপলক্ষিত। দশম অর্থাৎ আশ্রয় লক্ষণটি প্রধান এবং অন্য নয়টি আশ্রিত। শ্রীকৃষ্ণই এই আশ্রয় তত্ত্ব এবং অন্য লক্ষণগুলি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত তত্ত্ব। এই দশম পদার্থটিই দশম স্কন্ধে বর্ণিত।

ইহা নিখিল শ্রুতি শাস্ত্রের সার বস্তু। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে ইহা 'বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য'। শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভাষায় ইহা 'সর্বশাস্ত্রাব্ধিপীযুষ' সর্ব বৈদিক সৎফল এবং সর্ব সিদ্ধান্ত রত্নাঢ্য'। সর্বোপরি ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। যে ধর্ম পূর্বে আলোচিত হয় নাই, যাহা প্রোজ্ঝিতকৈতব অর্থাৎ সর্বপ্রকার স্বার্থানুসন্ধান বর্জিত এবং জগতে অবিদিত, সেই ধর্ম শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচ্য বিষয়। বর্ণিত বিষয়গুলি অসাধারণ কাব্যসম্পদে বিভূষিত। ইহা মহাকাব্য। মহাকাব্যের যে সকল লক্ষণ, সেগুলিও এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট। এই গ্রন্থ দ্বাদশ স্কন্ধ, ৩৩৫টি অধ্যায় এবং ১৮০০০ শ্লোক সমন্বিত বিরাট মহীরুহ। দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব। দশম স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ। শ্রীচক্রবর্তী মহাশয়ের ভাষায়—শ্রীভাগবত কৃষ্ণস্য দশমো মঞ্জুহাস্যতাম। অর্থাৎ দশম স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জু হাস্য। এই স্কন্ধ বৃন্দাবনের অফুরন্ত প্রেম মাধুর্য-ভাণ্ডার। যাঁহারা ইহাকে 'কাল্পনিক' বলেন, তাঁহাদের কথাতে বলা যায় যে এই গ্রন্থ কল্পনার কত ঊর্ধ্বে উড্ডীয়মান, আমাদের নিকট তাহাও কল্পনাতীত। এই গ্রন্থের প্রণেতা, বক্তা এবং শ্রোতা সকলেই বিলক্ষণ।

অবশ্য শ্রীমহাভারতের তুলনায় ইহা আকৃতিতে ক্ষুদ্র। মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ব এবং এক লক্ষ শ্লোক আছে। ঈশানুকথা অর্থাৎ বংশানুচরিত প্রভৃতি মহাপুরাণের অন্যান্য লক্ষণে মহাভারত সর্বোচ্চ, কিন্তু আশ্রয় তত্ত্ব নিরূপণে ভাগবত অদ্বিতীয়।

এই গ্রন্থের দশম স্কন্ধে ব্রজরমণীগণের তথা শ্রীরাধার বিরহবেদনার যে করুণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, সেই প্রকার করুণ দৃশ্য জগতের কোন সাহিত্যে, কোন চিত্রকলায় কিম্বা কোন ভাস্কর্য শিল্পে দৃষ্ট হয় না। অজন্তা গুহায় 'মুমূর্ষু রাজকুমারীর' করুণ দৃশ্য রূপে যে চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা অতীব মর্মস্পর্শী বলিয়া খ্যাত। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত দুঃখের ছবি আঁকা হয়েছে এটি তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু রাধার বিরহব্যথা যে কত মর্মস্পর্শী, ভাগবত ব্যতিরেকে অন্য কুত্রাপি এই প্রকার করুণ দৃশ্য প্রদর্শিত হয় নাই। ইহা অলৌকিক এবং অপার্থিব।

তৎপরে ইহার করুণ কাহিনী এই কারণে আরও মর্মন্তুদ হইয়াছে, যে ঋষি প্রবর শ্রীব্যাসদেব কৃষ্ণকান্তাগণের সহিত দীর্ঘ বিরহের পর শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করাননি। তিনি দশমস্কন্ধকে অসমাপ্ত রাখিয়া, তাঁহার মহাকাব্যকে বিয়োগান্ত মহাকাব্যে (Tragedy) পরিণত করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জগতে মিলনান্ত অপেক্ষা বিয়োগান্ত কাব্য এবং নাটকের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। যাঁহারা তাহাতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আমাদের দেশের ইতিহাসে প্রাচীনযুগে যে-রামায়ণ এবং মহাভারত রচিত হইয়াছিল এবং যাহা মহাপুরাণ এবং মহাকাব্যরূপে পরিগণিত, তাহা শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত মহাকাব্য। মনে হয়, তৎপরে বিয়োগদুঃখ অসহনীয় বলিয়া আলঙ্কারিকগণ বিয়োগান্ত কাব্য বা নাটক প্রণয়ন বিধিবহির্ভূত করিয়া দিয়াছিলেন। তাই কালিদাস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিগণ দুঃখের মর্মান্তিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া পরিশেষে দুঃখের অবসান করিয়া দিয়াছেন। সে কারণ তাহার কাব্য বা নাটক 'মিলনান্তক' হইয়াছে।

বৈষ্ণব কীর্তনীয়াগণ এই নীতি অনুসারে বিরহকীর্তন গাহিয়া, পরে মিলন কীর্তন গাহিয়া পালা শেষ করিয়া দেন। আমাদের দেশে একটি চলিত কথা আছে— 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। তাই পরিশেষে তাঁহারা শ্রোতাদের মনে আনন্দরসের সঞ্চার করিয়া যুগল মিলন করাইয়া দেন।

যাঁহারা যুগলের ভজনা করেন, তাঁহাদের নিকট মিলনই কাম্য, বিরহ কাম্য নয়। বিরহ মিলনকে সমুজ্জ্বল করে বলিয়া বিরহের প্রয়োজনীয়তা, নতুবা বিরহ আপনা হইতে মধুর নয়।

গোস্বামিপাদগণ ভাগবতের এই ত্রুটি লক্ষ্য করিলেন এবং সেই অসমাপ্ত অধ্যায়কে সমাপ্ত করিলেন। যে সকল বিষয় ভাগবতে কেবল উট্টঙ্কিত এবং নির্দেশিত হইয়াছে, যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, সেই অসামান্য গোস্বামিপ্রবরগণ সেই সেই বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন, এবং

তন্মধ্য দিয়া ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার 'চৈতন্য চন্দ্রামৃতে' লিখিয়াছেন :—

ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন ক্ষিতিমণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ।
যন্নকাপি কৃপাময়েন চ নিজেপ্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বল ভক্তি বর্ত্মনি খেলন্তি গৌর প্রিয়াঃ॥" (চৈতন্যভক্ত মহিমা ১৮)

যে মধুর ভক্তি পথে ব্যাসদেব প্রমুখ মুনীন্দ্রগণও ভ্রান্ত হইয়াছেন, যাহাতে পরে পৃথিবীতলে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই, যাহা শুকদেবও অবগত ছিলেন না এবং যাহা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তগণের নিকটও প্রকাশ করেন নাই, সেই মধুর ভক্তিরস মার্গে গৌরভক্তগণ সুখে ক্রীড়া করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের মহতী কৃপায় বলীয়ান হইযা তাঁহারা ভাগবতের সূত্রগুলির মধ্য হইতে নিগূঢ় অর্থ বাহির করিয়াছেন এবং প্রাচীন পুরাণাদি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিযা যাহা ভাগবত বিশেষ ভাবে প্রকাশিত করেন নাই, সেই সকল বিষয় তাঁহারা সবিস্তারে তাঁহাদের বিবিধ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের হস্তে বৃন্দাবনের লীলা মাধুর্য অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে এবং তন্মধ্য দিযা নিগূঢ় রসোজ্জ্বল প্রেমভক্তির পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহাদের ভক্তি সরস ছিল, শুষ্ক ছিল না। সে কারণ তাঁহাদের গ্রন্থগুলি অপূর্ব কবিত্বরসে পরিসিঞ্চিত। ইহাও শ্রীচৈতন্যদেবের অপার করুণার নিদর্শন। যেমন ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধের শরাঘাতে বিদ্ধ দেখিযা বাল্মিকীমুনির সহসা কবিত্ব শক্তির উন্মেষ হইল এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া তাহার মুখ হইতে প্রথম শ্লোক নির্গত হইল :—

"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেক মবধীঃ কাম মোহিতম্॥"

সেই প্রকার শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্র, যাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু আদর করিয়া 'পুরীদাস' বলিযা সম্বোধন করিতেন, সেই সপ্তমবর্ষ বয়স্ক বালক তাঁহার চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লেহন করিয়া, অপূর্ব কবিত্ব শক্তি লাভ করেন। তাঁহার মুখ হইতে সেই প্রকার প্রথম শ্লোক বাহির হইল :—

"শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষো রঞ্জন
মুরসো মহেন্দ্র মণিদাম।
বৃন্দাবন রমণীনাং মণ্ডন
মখিলং হরির্জয়তি॥"

যিনি ব্রজরমণীগণের কর্ণে নীলোৎপল কুণ্ডল সদৃশ, যিনি তাঁহাদের নয়নের কজ্জল, যিনি তাঁহাদের বক্ষঃস্থলে মরকত হার, যিনি তাঁহাদের সর্বাঙ্গের ভূষণ, সেই হরি সর্বোৎকর্ষরূপে বিরাজ করুন। তাহার 'আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ' নামক গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের একটি মূল্যবান অবদান। বৃন্দাবনের অপূর্ব মাধুর্য, যাহা ভাগবত বিশেষ করিয়া বর্ণন করেন নাই, তাহা এই গ্রন্থে অপূর্ব কবিত্ব ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেই হইতে তিনি কবি কর্ণপূর নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

শ্রীরাধারাণী যেমন সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার কান্তের জন্য বিলাপ করিতেন, গোস্বামিচরণগণ সেইপ্রকার সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, বনবাসী হইয়া এবং রাগানুগা ভক্তির অধিকারী হইয়া শ্রীরাধার দাস্য প্রাপ্তির নিমিত্ত বিলাপ করিতেন। শ্রীরঘুনাথ দাস কৃত 'বিলাপ কুসুমাঞ্জলি', শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিবিধ কবিতাবলী', শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর—'রাধা সুধা নিধি' গ্রন্থ তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

গোস্বামিপাদগণ দেখিলেন যে কৃষ্ণকান্তাগণকে যদি তীব্র অসংযোগের মধ্যে চিরকাল ফেলিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে নানাপ্রকার বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রথম বিরোধ—তিনি বলিয়া গিয়াছেন, তিনি আবার ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন। তাহার দূত উদ্ধব মহাশয়, তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া সেই কথাই বলিয়াছেন। ভ্রমররূপী দূত কিম্বা ভ্রমররূপী তিনি স্বয়ং সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন। তিনি যদি না আসেন, তাহা হইলে সব মিথ্যা হইয়া যায়; শ্রুতি বলিয়াছেন—তিনি সত্যসংকল্প। তাহা হইলে শ্রুতি বাক্যও মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু শ্রুতি বাক্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না।

দ্বিতীয় বিরোধ—পরকীয়া ভাব চিরকাল থাকিতে পারে না। রসের উল্লাসের নিমিত্ত যতদিন ইহার প্রয়োজন, ততদিন ইহার প্রয়োজনীয়তা। পরকীয়া ভাব জুগুপ্সিত এবং শাস্ত্রে নিন্দিত। অতএব ইহার একটি সমাধানের প্রয়োজন। পরকীয়া ভাবে, সবসময় মিলন সংঘটিত হয় না, সে কারণ নিশ্চিন্ত এবং শাশ্বত মিলনের অভাব।

তৃতীয় বিরোধ—ভগবান নির্মম এবং নিষ্করুণ নন। ভক্তের সামান্য দুঃখ দেখিয়া, যাঁহার হৃদয় বিগলিত হয় এবং তাহা দূর করিবার জন্য যিনি ছুটিয়া আসেন, তিনি কি করিয়া যাঁহারা ভক্তি এবং প্রেমের সমাশ্রয় তাঁহাদিগকে চিরকাল দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া রাখেন। তাহা হইলে তাহার ভক্ত বাৎসল্য গুণ ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়।

চতুর্থ বিরোধ—বিপ্রলম্ভের প্রয়োজন কেবল মিলনকে সমৃদ্ধিমান করিবার নিমিত্ত। কিন্তু মিলন সংঘটিত না হইলে বিপ্রলম্ভের অর্থ কি? বিরহ যদি বিরহে পর্যবসিত হয় তাহা হইলে বিরহ রসপদ বাচ্য হয় না।

এই সকল বিবেচনা করিয়া গোস্বমগণ পুরাণাদি হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া এবং পুরাণ সমর্থিত বচন হইতে প্রমাণ করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপাল এবং দন্তবক্র নিধন করিয়া দ্বারকা হইতে মথুরা দিয়া ব্রজে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। ব্রজে আসিয়া তিনি জনক-জননীর শোক অপনোদন করিয়াছিলেন। ব্রজবাসিগণকে অমূল্য ধনরত্নাদি উপঢৌকন দিয়াছিলেন, এবং তৎপরে শাস্ত্রানুসারে বিধিপূর্বক নন্দ যশোদা প্রমুখ সমুদয় ব্রজবাসিগণের সম্মুখে মহা সমারোহে কৃষ্ণানুরাগিনী ব্রজবধূগণের পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইখানেই পরকীয়াবাদের যবনিকা পতন হইল। অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়া দেবী আসিয়া তাঁহার ইন্দ্রজাল গুটাইয়া লইলেন। যাঁহাদের প্রতীতি ছিল, ব্রজবধূগণ পরবধূ, তাঁহাদের, ভ্রান্তি অপনোদিত হইল। সকলের দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে তাঁহারা কৃষ্ণ বধূ। যাঁহারা নিজদিগকে পতি বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাদের মন হইতে সেই প্রকার মনন অপসারিত হইল। পূর্বস্মৃতিও চিরতরে বিলুপ্ত হইল। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের সকলকে লইয়া অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিলেন। ইহাই স্বকীয়ায় পরকীয়া বাদ। ইহাই বৈষ্ণবগণের চরম সিদ্ধান্ত। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার গোপাল চম্পূ নামক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীগণের বিবাহ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন।

(গোপাল চম্পূ উত্তর খণ্ডে ৩৭ পূরণ)

ব্রহ্মসংহিতার বচন হইতেও ইহা সমর্থিত হয়।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ। ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ। অগণিত লক্ষ্মীগণ তাঁহার কান্তা। তিনি গোকুলপতি গোপীপতি, যদুপতি এবং নিখিল জগতের পতি।

শ্রীশুকদেব রাসলীলার মধ্যে 'কৃষ্ণবধ্বঃ' শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও স্বকীয়াত্ব প্রতিপন্ন করে।

কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথ প্রমুখ নিত্য পরকীয়াবাদিগণ ইহা সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে কি প্রকট কি অপ্রকট উভয়লীলায় পরকীয়া বোধ সত্য। ইহা নিত্য সত্য। ইহা মায়া বিজৃম্ভিত কিম্বা মায়া প্রত্যায়িত নহে।

তবে বিদ্বদ জনগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহার একটি মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীরাধারাণীর পারমৈশ্বর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলেন, রাধারাণী যে কি বস্তু তাহা মনবুদ্ধির অগোচর। ইহা অচিন্ত্য, সে কারণ বলিতে হয় যে তিনি স্বকীয়াও বটেন এবং পরকীয়াও বটেন এবং অপরদিক দিয়া তিনি স্বকীয়াও নন এবং পরকীয়াও নন। এতদুভয়ের উর্ধ্বে তাঁহার স্থান। তিনি অদ্বিতীয়া এবং অনির্বচনীয়া।

অষ্টাদশ তরঙ্গ

কৃষ্ণের পূর্বরাগ

পদকর্তাগণ যদিও শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি কেহ কেহ মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ ততটা মর্মস্পর্শী নয়। নায়িকার ন্যায় নায়কের পূর্ব রাগে সে প্রকার বেদনার অনুভূতি এবং মাদকতা নাই।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় সাহিত্য দর্পণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "আদৌ বাচাঃ স্ত্রীয়াঃ রাগঃ।' অর্থাৎ নায়িকার পূর্ব রাগ প্রথমে বর্ণন করিতে হয়।

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার 'উজ্জলে' সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ প্রথমতঃ উদ্ভূত হইলেও তৎপ্রিয়াগণের পূর্বরাগ যদি প্রথমতঃ বর্ণিত হয়, তাহা হইলে অধিক মনোরম হয়। প্রাচীন উক্তি অনুসারে প্রথমতঃ নারী অনুরক্তা হয়, তৎপরে তাহার ইঙ্গিতে পুরুষ অনুরক্ত হয়। সে কারণ নায়িকার পূর্বরাগ পূর্বে বর্ণনা করিতে হয়। কিন্তু যদি উভয়ের প্রেম সমপর্যায়ে থাকে তাহা হইলে এই ক্রমের বিপর্যয়ে কোন দোষ হয় না।

প্রাকৃত নরনারীর যেমন বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃ মিলন পিপাসার উদ্রেক হয়, নরলীল ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও তদ্রূপ অবস্থা।

এখন তাঁহার বয়ঃসন্ধিকাল। বয়ঃসন্ধিকাল অর্থে বাল্যাবস্থার অবসান এবং নবোদিত সূর্যের ন্যায় নব কৈশোরের আবির্ভাব। আচার্যগণ প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের কেবল তিনটি বয়সের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যথা: কৌমার পৌগণ্ড এবং কৈশোর। "বয়ঃকৌমারং পৌগণ্ড কৈশোর মিতি তত্ত্রিধা" (ভঃ রঃ সিঃ দক্ষিণ বিভাগ ১ম লহরী ১৫৭) পাঁচ বৎসর বয়সের নাম কৌমার, দশ বৎসর পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং পঞ্চদশ বৎসর পর্যন্ত কৈশোর। তৎপরে ষোড়শ বৎসর হইতে যৌবন। কৈশোর বয়ঃকাল যৌবনের প্রারম্ভ এবং কৌমার ও পৌগণ্ডের অবসান।

কৈশোর বয়সই মধুর রসে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তি রসামৃত সিন্ধু বলিয়াছেন :—

বয়সো ত্রিবিধত্বেপি সবভক্তি রসাশ্রয়ঃ।
ধর্মী কৈশোরঃ এবাত্র নিত্য নানা বিলাসবান্।

(দক্ষিণ বিভাগ ১ম লহরী ২৭)

যদিও শ্রীকৃষ্ণের কৌমার পৌগণ্ড এবং কিশোরাদি ত্রিবিধ বয়স আছে, তথাপি কৈশোর বয়সই ধর্মী। ইহা সর্বভক্তিরসাশ্রয়, সর্বগুণান্বিত এবং নিত্য নূতন বিলাস বিশিষ্ট। তাঁহার প্রিয়তমা শ্রীরাধাও নিত্য কিশোরী। উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই, ভেদ কেবল রসাস্বাদনের নিমিত্ত। কিশোর বয়স ধর্মী হওয়ায় ইহা বাল্য বয়সে এবং পৌগণ্ড বয়সেও প্রকটিত হয়। সে কারণ পুরাণাদি হইতে জানিতে পারা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ বাল্য এবং পৌগণ্ড বয়সেও কিশোর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া নবীনা কিশোরীর সহিত নিভৃত নিকুঞ্জে কেলিরস আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাহার 'কৃষ্ণ কর্ণামৃত' গ্রন্থে যে যে স্থলে শৈশব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কৈশোর বয়সকেই বুঝায়।

কৈশোর বয়সে অঙ্গসকলের অপূর্ব শ্যামলতা, নেত্রান্তে অরুণবর্ণকান্তি লোমাবলীর প্রকাশ, চঞ্চল ভ্রূধনু প্রভৃতি অপূর্ব মোহনতা প্রকাশ পাইয়াছে। এখন তাঁহার শৈশবের চঞ্চলতা দূরীভূত হইয়াছে। মাতৃক্রোড়ে আবদ্ধ থাকিতে আর ভাল লাগে না। পৌগণ্ড বয়সে সখাদিগের সঙ্গে গোষ্ঠে গমন করিতে ইচ্ছা করে না। একাকী বনে বনে বিচরণ করিতে ভাল লাগে। কে যেন তাঁহার হৃদয় মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে এবং তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কোন একটি মূর্তি তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে।

তিনিও যমুনার কূলে দূর হইতে অপূর্ব লাবণ্যবতী শ্রীরাধাকে ঈষৎ দর্শন করিয়া মর্মে মর্মে বিদ্ধ হইলেন। কবি বিদ্যাপতি সে মর্মবেদনার পরিচয় তাঁহার সুমধুর পদাবলীর মধ্য দিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন :—

গেল কামিনী, গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক, কুসুম সায়ক
কুহকীভেলি বরনারী॥
জোরি ভুজ যুগ, মোরি বেঢল
ততহি বদন সুছন্দ।
দাম চম্পক, কামপূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥

উরহি অঞ্চল, ঝাঁপি চঞ্চল
আধপয়োধর হেরু।
পবন গরাভবে, শারদ ঘনজনু
বেকত করল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে, জীবন জুড়ায়ব
টুটব বিরহক ওর।
চরণ যাবক, হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর

ভনয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যদুপতি
চিত থির নাহি হোয়।

সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুনু কি মিলব তোয় ॥"

শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের কি প্রকার ভাব বিকার হইয়াছে, পৌর্ণমাসিদেবী যেন শ্রীরাধিকাকে তিরস্কার ছলে বলিতেছেন :—

শুনলো রাজার ঝি !
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণেবধিলি
একাজ করিলি কি ?
বেলি অবসান কালে,
গিয়াছিলি নাকি জলে
তাহাবে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া
ধরিলি তার গলে।

দেখাইয়া বদন চাঁদে
তাহে ফেলিলা বিষম ফাঁদে।
ভুঁই অবিতে আঙুলি লখিতে নারিল
ওই ওই করে কাঁদে ॥
তাহে সুন্দর দরশি থোরি
মন কোরিলি চোরি।
বিদ্যাপতি কহে, শুনহ সুন্দরী
কি করিবে কি করি ॥

শ্রীরূপ গোস্বামী বিদগ্ধ মাধব নাটকে কৃষ্ণের পূর্বরাগের যে সকল চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা পূর্বরাগজনিত বিভ্রমের পরাকাষ্ঠা এবং অতীব মর্মস্পর্শী। লালবর্ণের জবাকুসুম দেখিয়া রাধিকাভ্রম। তাঁহার সম্মুখে রাধিকা, পশ্চাতে রাধিকা, দক্ষিণে রাধিকা, আকাশে বাতাসে সর্বদিকে রাধিকা, সমস্ত ত্রিভুবন তাহার নিকট 'রাধাময়' বলিয়া অনুভব।

"রাধাপুবঃস্ফুরতি, পশ্চিমতশ্চ রাধা।
রাধাদিসত্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা।
রাধা খলুক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা
রাধাময়ীবভূব কুতস্ত্রিলোকী। (পঞ্চম অঙ্ক ২৭ অনুচ্ছেদ)

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ঐ ভাবাবলম্বনে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করিয়াছেন :—

"পুরো রাধা পশ্চাদপি চ মম রাধা ততইতঃ।
স্ফুরত্যেষা সম্যাগ্ বসতি মম রাধান্তরং গতা।
অধশ্চোর্দ্ধং রাধাবিটপিষু রাধা কিমপরম্
সমস্তং মে রাধাময়মিদ মহোভবতি ভুবনম্।"

(সংগীত মাধব ৭ম সর্গ ৭নং শ্লোক)

অমর কবি চণ্ডীদাস তাহাদের পূর্ব হইতেই এই ভাবের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, যথা,— "উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন, কিশোরী নয়নতারা ॥

গৃহমাঝে রাধা, কাননেতে রাধা, রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা রাধাময় হল আঁখি॥
স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা, রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া 'রাধাবল্লভ' নাম পেয়েছি অনেক আশে॥
শ্যামের বচন মাধুরী শুনিয়া প্রেমানন্দে বহে রাধা।
চণ্ডীদাস কহে দোঁহার পিরীতি পরাণে-পরাণে বাঁধা॥"

যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রেমভক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখ কবিগণের সুললিত পদাবলী বাঙ্গালীর শুষ্ক প্রাণে অমিয়ধারা বর্ষণ করিয়া তুলিবে। মনে হয় অমর-কবি চণ্ডীদাসের এই কবিতার ছায়াবলম্বনে শ্রীরূপ প্রমুখ আচার্যগণ তাঁহাদের সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'কৃষ্ণঃ পুরঃ স্ফুরতি, পার্শ্বযুগেচ' ইত্যাদি রূপে শ্রীরাধার পূর্বরাগের যে সংস্কৃত শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন এবং যাহা শ্রীরাধার পূর্বরাগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাও মনে হয় শ্রীরূপের বর্ণিত কৃষ্ণের পূর্বরাগের 'রাধা পুরঃ স্ফুরতি' শ্লোকের পাল্টাপাল্টি উত্তর। মোট কথা এই শ্লোকগুলি একই সুরে গাঁথা।

পূর্ব-রাগের অর্থ মিলনের তীব্রোৎকণ্ঠা। শ্রীরাধার মধ্যে এই উৎকণ্ঠা এতই প্রবল যে তাহা অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সে কারণ 'প্রৌঢ় অনুরাগ' বলিতে রাধার পূর্বরাগকে বুঝায়। কিন্তু তাহা হইলেও বৈষ্ণবাচার্যগণ এবং চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখ ভক্ত কবিগণ রাধা এবং কৃষ্ণের পূর্বরাগ সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনিও শ্রীরাধার প্রতি গভীর অনুরাগের মর্মন্তুদ বেদনায় অভিভূত হইয়া বিভ্রান্তচিত্ত হইয়াছেন। দেহ গেহ মন সকলি ভুলিয়া গিয়াছেন। কখন যে শিখণ্ডচূড়া তাঁহার মস্তক হইতে ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। যে বংশীকে তিনি পরিহার করিতে পারেন না, সেই বংশীও আজ কোথায় এবং কখন তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছে, সে বিষয়েও তাঁহার জ্ঞান নাই। তিনি রাধাবিরহে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। তাঁহার দেহ অবশ, কুসুমশরে জর্জরিত হইয়া তাঁহার গণ্ডস্থল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দেহ অনলঙ্কৃত এবং অমার্জিত। পরিধানে উজ্জ্বল পীত বসন এখন মলিন এবং দেহ ধূলি ধূসরিত। নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া একমনে, এক প্রাণে রাধা নাম জপ করিতেছেন—সর্বদাই শ্রীরাধার রূপ বিলাসে মগ্ন। শ্রীরাধিকাকে পাইবার মানসে পথে পথে তাঁহার সখীগণের পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। নয়ন

হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে। অসংখ্য কান্তা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কেহই এমন কি চন্দ্রাবলী পর্যন্ত তাঁহাকে আনন্দ দিতে পারিতেছেন না। সর্বকান্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শ্রীরাধার প্রেমরস লালসায় এবং তাঁহার আলিঙ্গনের প্রত্যাশায় জীবন ধারণ করিতেছেন।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, যিনি পূর্বে প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামে খ্যাত ছিলেন, যাঁহার পাণ্ডিত্য গৌরব ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল, যিনি তৎপরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার্ণবে স্নাত হইয়া শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমের ন্যায় জ্ঞানমার্গ হইতে ভক্তিমার্গে আনীত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার 'সঙ্গীত মাধবে' পূর্বরাগের বেদনা রাধাকে জানাইয়া, প্রসন্না হইয়া শ্রীকৃষ্ণাভিসারে তাঁহাকে অবিলম্বে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতেছেন। নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃত হইল। ইহা শ্রীজয়দেবকৃত 'গীতগোবিন্দে'র অনুরূপ ছন্দালঙ্কারে রচিত এবং তদনুসারে গীত।

সন্ততমভিলাষুক— কমলাদিক-সকল বিলাসিনীবৃন্দম।
চিরমপহায় তবৈব পদাম্বুজ পরিমলকৃত রতি বন্ধম্।
রাধে ভজ ব্রজ রাজ কুমারম।
সত্বর মভিসর মম বচনেন কুমা কুরু মনসি বিচারম্।
পথি পথি তব দাসীজন-পদতল বিলুণ্ঠিত-মৌলিশিখণ্ডম্।
সাশ্রুবিলোচনমবনী লোচনমাত পাণ্ডুর মৃদুগণ্ডম্।
বিষম কুসুম-শর-শরভর জর্জ্জরমতি সুকুমার শরীরম্।
নিরবধি তব সঙ্গম—রসলালস মানসনবশমধীরম্।
অদ্ভুত কোটি মনোভব-মোহন গুণ-লাবণ্য নিধানম্।
তব পদ দাসত্বমাপিতবন্তং স্বয়ং পুলকদভিধানম।
নিভৃত নিকুঞ্জতলে তব নাগারনাম পদানি জপন্তম।
ধ্যায়ন্তং তব রূপবিলাসং সাশ্রুতয়া নিবসন্তম্॥
ত্বয়ি সহজানুরাগ রস বহুবলমপি ন স্মৃত তনু গেহম।
অনলঙ্কৃতামাজ্জিত কলিতোজ্জ্বল পীতাম্বর বর দেহম্॥
প্রাণকোটিসুনীরাজিত সুললিত ত্বৎপদ নখ রুচিলেশম্।
তব পরিরম্ভন-রস পরমাশা-ধৃতজীবনমণিমেষম্।
শ্রীবৃষভানুসুতা-পদজীবন-রসদ সরস্বতীগীতম্।
জনয়তুতদ্রসমূর্ত্তি-পদাম্বুজ-ভাবমুদারমধীতম্॥" (৪র্থ সর্গ ২নং গীত)

সরস্বতিপাদ বলিলেন,—শ্রীরাধে! তুমি আমার কথা শুন। তিনি সকল

বিলাসিনীবৃন্দ পরিহার করিয়া তোমার চরণ-কমলের মধু পান করিবার জন্য উৎসুক নয়নে তোমার পথের দিকে চাহিয়া আছেন। অতএব তুমি কালবিলম্ব না করিয়া ব্রজরাজ কুমারকে ভজনা কর। কবি বিদ্যাপতি বলিলেন,—"রাধে, তুমি যে কৃষ্ণকে তোমার অপরূপ রূপ মাধুরী দেখাইয়া উন্মত্ত করিয়া তুলিলে, এখন বল দেখি কানু কি করিয়া বাঁচে?" এই দুইটি বাক্য একই ছাঁচে ঢালা।

ইহা হইতে মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বুঝি প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল। শ্রীরূপ গোস্বামীরও নাকি ইহাতে ইঙ্গিত আছে। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধ মাধব নাটকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ প্রথমে বর্ণনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্যগণ রাধাপ্রেমের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে শ্রীরাধার প্রেমের মধ্যে স্বসুখ বাসনা পূরণ রূপ বিন্দুমাত্র কালিমা নাই। সে কারণ কৃষ্ণ যদি তাহাকে পূর্ব হইতে অঙ্গীকার না করিতেন, তাহা হইলে অন্যান্য ভাগ্যবতী নায়িকাগণের ন্যায় স্বসুখ বাঞ্ছা আরোপ করিয়া, প্রেমের পসরা মস্তকে বহন করিয়া, তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করিতে যাইতেন না। অপর পক্ষে তিনি কৃষ্ণকে এতই ভালবাসিতেন যে যদি তাঁহা অপেক্ষা অপর কোন গুণশালিনী শ্রেষ্ঠা নায়িকা থাকেন, যাঁহার রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রিয়তম সেই নায়িকার অধিক বশীভূত হন এবং অধিক সুখলাভ করেন, তাহা হইলে শ্রীরাধা তাঁহার দাসীত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সকল কারণে মনে হয় যেন **শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল।**

শ্রীরাধার পূর্বরাগ কৃষ্ণের উপর কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করে এবং তাঁহার পূর্বরাগকে কি ভাবে উদ্দীপিত করিয়া তুলে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এস্থলে কয়েকটি কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

একদা শ্রীকৃষ্ণ পূর্বরাগ ভাবাক্রান্ত চিত্তে তাঁহার প্রাসাদের চন্দ্রশালিকার উপর বসিয়া ভাবে মগ্ন হইয়া বিচরণ করিতেছেন, প্রাণে তিলার্ধ শান্তি নাই, রাধা বিরহানল প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে, এমন সময় একটা শুক পক্ষী রাধার নিকট হইতে উড়িয়া আসিল। তিনি শুক পক্ষীকে সমাদরে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখ হইতে শুনিতে লাগিলেন যে তাঁহার বিরহে শ্রীরাধার কি অবস্থা ঘটিয়াছে এবং কি অপরিসীম বেদনায় তিনি অভিভূতা হইয়া কাল কাটাইতেছেন। শুক পক্ষীর নিকট হইতে যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার তুলনায় শ্রীরাধার পূর্বরাগের প্রতাপ কত বেশী। অন্তরে অন্তরে তাহা অনুভব করিয়া তাঁহার বিরহানল আরও প্রজ্বলিত হইল এবং রাধাকে পাইবার নিমিত্ত তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইল।

অপর এক দিবস তিনি সখাবৃন্দের সঙ্গ পরিহার করিয়া গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার রাধামযভাব হৃদয়ের মধ্যে অনবরত স্ফুরিত হইতে লাগিল। যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই মনে হয়, তাঁহার প্রিয়তমার মূর্তি আকাশে, বাতাসে, বিটপীবৃন্দে, জলে স্থলে সকল বস্তুতেই যেন সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। তিনি দেখিলেন অদূরে একটি নীলকমল সদ্য প্রস্ফুটিত হইয়া বায়ু সঞ্চালনে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছে। তাঁহার মনে হইল নীলকমলটি যেন তাঁহাকে ডাক দিতেছে। তিনি নীলকমলের দিকে আগুয়ান হইলেন এবং যমুনার জলে অবতরণ করিয়া নীলকমলের সমীপে পৌঁছাইলেন। নীল কমল যেন তাঁহাকে বলিতেছে 'তুমি আমার উপর উপর কি দেখিতেছ? আমার দলগুলি ঈষদুন্মুক্ত করিয়া অভ্যন্তরে দেখ। তুমি যাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ তাহার সন্ধান মিলিবে।' তিনি নীল কমলের দলগুলি উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন যেন তাঁহার প্রিয়তমা তাঁহার বপুসাম্যে নীল কমলকে প্রাণের আবেগে এবং প্রেমোন্মত্তা হইয়া চুম্বন করিয়া তাহার দলগুলিকে রক্তিমাভায় রঞ্জিত করিয়া দিয়াছেন। এতদ্দর্শনে তাঁহার পূর্বরাগ দ্বিগুণায়িত হইয়া উঠিল এবং রাধাকে পাইবার লালসে তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল।

তৎপরে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি একটি তমালবৃক্ষের সন্নিকটস্থ হইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন যেন তমালবৃক্ষের শরীরে কতকগুলি রেখা অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার ধারণা হইল যে তাঁহার প্রিয়তমা অনুরাগের আতিশয্যে ভ্রমপূর্বক তমালবৃক্ষকে তাঁহাকে মনে করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার বিরহসন্তপ্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিয়াছেন। তদ্দ্বারা রাধার প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। রাধার প্রৌঢ় পূর্বরাগ তাঁহার পূর্বরাগকে উদ্দীপিত এবং সন্দীপিত করিতে লাগিল।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ রূপ পঞ্চ বিষয় হইতে সাক্ষাৎভাবের কথাতো দূরে, অসাক্ষাৎ ভাবেও যে কি প্রকার আনন্দ অনুভব করিতেন, তাহা নিম্নোক্ত পয়ার ছন্দে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা রাধার প্রেমানুরাগের উৎকর্ষ জ্ঞাপক শ্রীকৃষ্ণের স্বীকারোক্তি।

"রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে আগেয়ান॥
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন।

কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে কৃষ্ণ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হঞা অন্ধ।

তাম্বুল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন কিছুই না জানে।"

(আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২০০-২০৪)

এই সকল হইতে মনে হয় যেন শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাঁহার ইঙ্গিতে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুরক্ত হইয়াছিলেন। ইহা প্রাচীন উক্তি অনুসারে সত্য, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধ মাধব নাটকে উভয়ের পূর্বরাগ বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যদিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ প্রথমে বর্ণন করিয়াছেন।

বিদগ্ধ মাধব নাটক রস বাদের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যদেব যখন নীলাচলে তখনই এই গ্রন্থ বিশেষভাবে আলোচিত, অনুমোদিত এবং প্রশংসিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে শ্রীরাধা পূর্বরাগের বেদনায় ক্লিষ্টা হইয়া এবং গভীর অনুরাগের বশবর্তিনী হইয়া তাঁহার প্রিয়সখী ললিতা বিশাখার মারফৎ শ্রীকৃষ্ণের নিকট একটি কন্দর্পলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,

ধরিঅ পবিচ্ছন্দ গুণং
সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং
জহ জহ চইদ পলাএম্হি॥ (২-৪৮)

পত্রখানি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ইহার সংস্কৃতের রূপান্তর—

ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দ গুণং
সুন্দর মম মন্দিরে ত্বম বসসি।
তথা তথা রুনৎসি বলিতম্
যথা যথা চকিতাহং পলায়ে॥

"হে সুন্দর! তুমি প্রতিচ্ছন্দগুণ অর্থাৎ চিত্র পট রূপ ধারণ করিয়া আমার হৃদয়ে বাস করিতেছ। আমি ভীত হইয়া (ধর্মহানি বা কুল লজ্জার ভয়ে) যে যে স্থানে পলায়ন করি তুমি সেই সেই স্থান হইতে আমাকে বলপূর্বক রোধ কর।" ইহা তাঁহার সর্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্তির নিদর্শন।

যাহা হউক, শ্রীরাধার পূর্বরাগের আতিশয্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। যাঁহাকে প্রথমে তিনি সাগরের মণি আকাশের চাঁদ মনে করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে পাওয়া বিশেষ কষ্ট সাধ্য হইবে না, এই প্রকার প্রত্যয় তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল।

শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ এতদুভয়ের মধ্যে কাহার পূর্বরাগ প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল, এই প্রশ্নের সমালোচনা করিলে আমাদের প্রথমতঃ স্মরণ রাখা উচিত যে তাহাদের পারস্পরিক প্রেম নিত্যসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত এবং অন্য নিরপেক্ষ। জন্মলীলা প্রকটন করিয়াই তাহাদের পারস্পরিক আকর্ষণ স্বভাবজ। উভয়ের পূর্বরাগ একটির মধ্যে অপরটি এমনি ভাবে অনুপ্রবিষ্ট যে একটিকে অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ভক্ত কবি চণ্ডীদাস লিখিলেন—'চণ্ডীদাস কহে দোঁহার পিরীতি পরাণে পরাণে বেড়া। [illegible] প্রেম একই ডোরে গাঁথা।' সে কারণ কাহার পূর্বরাগ অগ্রে এবং কাহার পশ্চাতে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অতএব ইহাই স্বীকার্য যে উভয়ের পূর্বরাগ যুগপৎ উত্থিত।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ যত প্রৌঢ় কৃষ্ণের পূর্বরাগ তত প্রৌঢ় নয়। কারণ ভগবানের মধ্যে মহাভাবের বিকাশ নাই। মহাভাব পূর্বরাগকে সমৃদ্ধিমান করিয়া তুলে। পূর্বরাগের যে দশ দশা উল্লিখিত হইয়াছে, সে সকলের প্রত্যেকটি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের মধ্যে প্রতিফলিত হয় নাই। শ্রীরাধা প্রেম ভক্তির আশ্রয়স্থানীয়া বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয়। যদিও তিনি সমস্ত পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান তথাপি আশ্রয় জাতীয় প্রেমের যে কি অদ্ভুত প্রভাব এবং কি প্রকার তাঁহার মাধুর্য তাহা জানিবার জন্য তিনি লোলুপ হন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে উভয়ের প্রেম যদি নিত্যসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বভাবজ হয়, তাহা হইলে পূর্বরাগের অর্থ কি? পূর্বরাগের সংজ্ঞায় বর্ণিত হইয়াছে নায়ক এবং নায়িকার মিলনের পূর্বে দর্শন এবং শ্রবণাদি হইতে যে রতির উৎপত্তি হয় এবং যাহা বিভাবাদি সম্মেলনের দ্বারা বিশেষ আস্বাদময়ী হয় তাহাকে পূর্বরাগ বলে। তাহা হইলে সাধারণতঃ ধারণা জন্মে বুঝি তৎপূর্বে তাহাদের মিলন ঘটে নাই। কিন্তু বস্তুতঃ এ প্রকার নহে। শ্রীরাধা অন্ধ হইয়া জন্মলীলা প্রকটন করিলে বালকৃষ্ণ তাঁহার শিয়রে বসিয়া বক্ষস্থল স্পর্শ করিয়া জানাইয়া দিলেন,—"প্রিয়ে, এখন চক্ষুরুন্মীলিত কর—একবার চেয়ে দেখ আমি আসিয়াছি।" পুরাণাদি গ্রন্থের বহুস্থলে বর্ণিত আছে, যে শৈশব বয়সে শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর রূপ ধারণ

করিয়া নিভৃত নিকুঞ্জে রহঃকেলি সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী প্রত্যহ নন্দালয়ে গিয়া শিশু কৃষ্ণের জন্য পাককর্ম সমাধা করিতেন। সখাবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া যখন কৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেন, তখন শ্রীরাধা প্রমুখ ব্রজযুবতিগণ অট্টালিকার উপরিভাগ হইতে কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিতেন, এবং কৃষ্ণও প্রেম সম্পুটিত নয়নে তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। অতএব তাঁহাদের নিগূঢ় পরিচয় এবং মিলন যখন পূর্ব হইতে সংঘটিত হইয়াছে, তখন পূর্ব রাগের প্রয়োজন কি? ইহার অর্থ মনে হয় এই যে, উন্নত প্রেমের স্বভাবে যিনি পরিচিত, তিনি অপরিচিত বলিয়া অনুভূত হন, যিনি পূর্ণ রূপে জ্ঞাত, তিনি অজ্ঞাত হইয়া যান এবং সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে নব নবরূপে পাইবার জন্য প্রাণের মধ্যে প্রবল উৎকণ্ঠা এবং ঔৎসুক্য জাগিয়া উঠে। প্রেম ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া নব নব রসের সঞ্চার করে। অতএব পূর্বরাগ প্রেমের এক মনোরম বৈচিত্র্য।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ অতীব আশ্চর্যজনক। যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, যিনি সর্বজ্ঞ, অনন্ত বিভু, যাঁহার পদরজঃ লাভ করিবার নিমিত্ত যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র প্রমুখ পুণ্যাত্মাগণ গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, তিনি কি করিয়া রাধা পদরজঃ লাভ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হন। যিনি সমগ্র বিশ্বকে বিমোহিত করিয়া রাখেন, তিনি কি করিয়া শ্রীরাধার প্রেমরসের কণিকা আস্বাদন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করেন? ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় আর কি আছে।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার সঙ্গীতমাধবের ৭ম সর্গে লিখিয়াছেন :—

যোগীন্দ্রাঃ মৃগয়ন্তি যং পদরজঃস্নেনাপি-যন্মৃগ্যতে,
বিশ্বং যেন বিমোহিতং চলদৃশা তস্যাপি যন্মোহনম্।
পূর্ণানন্দ ময়োঽপি যদ্রসলবাস্বাদেন ধন্যায়তে
তদ্ধামস্ফুট চম্পক চ্ছবি চিরং রাধাভিধং পাতু বঃ॥ (১ নং শ্লোক)

তত্ত্বের দিক হইতে উভয়ে এক, কিন্তু লীলার দিক হইতে যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তিনি দুই মূর্তিতে প্রকটিত হন। একটি বিষয়প্রেম রূপে অপরটি আশ্রয়প্রেম রূপে। বিষয়প্রেম আশ্রয়প্রেমের মাধুর্য (অর্থাৎ স্ব-মাধুর্য) আস্বাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়েন।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ রাধাপ্রেমের বিজয় দুন্দুভি। "রসোবৈসঃ" এই শ্রুত্যুক্ত সূত্রের পূর্ণ তাৎপর্য ভগবানের রসলিপ্সুতার দিক দিয়া। অতএব যাঁহারা বলেন যে বৈষ্ণবগণ ভগবানকে ক্ষুদ্র, হীন এবং পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা প্রেমের তাৎপর্য গ্রহণ করেন না। যিনি গম্ভীরাশয়, তিনি প্রেমের দ্বারা হন তরল।

যিনি দীনার্ত বন্ধু তিনি নিজে হন দীন এবং আর্ত, ইহা কেবল রস লোলুপতার নিমিত্ত, অপর কোন কারণে নয়। অন্যত্র তিনি কেবল 'মহতো মহীয়ান্' হইয়া আছেন। কিন্তু 'অনোরনীয়ান্' হন কেবল প্রেমের নিকট। ভগবানের এই দিকটা শ্রীমহাপ্রভুর অনুগৃহীত পার্ষদগণ সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়া, জগতে তাঁহার রসলিপ্সুতা ধর্মের পরিচয় দিয়াছেন।

উনবিংশ তরঙ্গ

শ্রীরাধার প্রেম মাহাত্ম্য

শ্রীরাধা হলাদিনীশক্তির মূর্তিমতী দেবী। সর্বশক্তি গরীয়সী হলাদিনীশক্তি-রূপা মহাশক্তির সারস্বরূপ যে মাদনাখ্য মহাভাব অর্থাৎ যাহা প্রেমের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধা তাঁহার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্তা। রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্বাধিকা। সর্বলক্ষ্মীময়ী দেবী, সবকান্তাশিরোমণি এবং অখণ্ডরসবল্লভা।

শাস্ত্রকারগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে শৃঙ্গার রসের বর্ণ শ্যাম। সাহিত্য দর্পণে লিখিত আছে 'শ্যামোঽয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ'। শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল অর্থাৎ শৃঙ্গার রস রূপ কস্তুরীর দ্বারা তাঁহার কলেবর বিচিত্রিত। শ্যামসুন্দরকে নিরন্তর শ্যাম মধু পান করাইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম শ্যামা অর্থাৎ কিশোর বয়স্কা উত্তমা নারীর লক্ষণে সুলক্ষিতা।

শ্যামা শব্দে আমরা সাধারণতঃ 'মা কালীকে' বুঝি। কিন্তু গোস্বামি-চরণগণ শ্যামা শব্দের একটি নূতন অর্থ করিয়াছেন। যথা, যে নায়িকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল থাকে শ্যামা শব্দে সেই নায়িকাকে বুঝায়। এই নায়িকা বৃষভানুসুতা শ্রীমতী রাধিকা। 'শ্যামা শ্যাম' অর্থে রাধাকৃষ্ণকে বুঝায়। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন, 'শ্যামযো নববয়ঃ সুষমাভ্যাং।" শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ, হে রাধিকে, তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন শ্যামা অর্থাৎ অভিনব বয়সহেতু উত্তমা যুবতী নারীর লক্ষণে লক্ষিতা আর একজন শ্যাম অর্থাৎ মরকতমণির ন্যায় মনোহর এবং উজ্জ্বল। (উৎকলিকা বল্লরী স্তবের ১৭নং শ্লোকের অংশ।)

তিনি নিত্য নবকিশোরী, নিত্য নবযৌবনা এবং বয়সে মধ্যমা। তিনি 'ব্রজ-নবযৌবতমৌলিমালিকা' অর্থাৎ লক্ষ্মীদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা যে ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহাদের শিরোভূষণ পুষ্পমালা স্বরূপা। তিনি কৃষ্ণের সর্ব কাম পূর্ণ করেন বলিয়া সর্বকান্তিময়ী।

বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রের বচন :—

'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥' (চৈঃ চঃ উদ্ধৃত বচন ১।৪।১৩)

তত্ত্ব বচনের ব্যাখ্যা

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকের প্রতি পদের অর্থ করিয়াছেন। প্রথমে দেবী শব্দের অর্থ করিয়াছেন :—

"দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণ পূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী॥"

দিব্ ধাতু হইতে দেবী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দিব্ ধাতুর বহু অর্থ আছে, তন্মধ্য হইতে কবিরাজ গোস্বামী তিনটি অর্থ লইয়াছেন, যথা দ্যুতি, ক্রীড়া এবং প্রীতি। দেবী শব্দের অর্থ করিতেছেন, অতিশয় দ্যুতিশালিনী পরমাসুন্দরী। অপর অর্থ ক্রীড়া এবং প্রীতি। কৃষ্ণ পূজা ক্রীড়ার বসতি নগরীর অর্থ যাঁহাকে পূজা করা হয় তাহাতে তাঁহার প্রীতিবিধান হয়। কৃষ্ণ পূজার যাবতীয় সামগ্রী শ্রীরাধিকাতে দৃষ্ট হয়, এবং কৃষ্ণ পূজা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে প্রীতি, সেই প্রীতির পরমস্থান স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা। আর ক্রীড়া অর্থে লীলা বুঝায়। লীলার অর্থ 'অনায়াসেন যা হর্ষাৎ সা এবলীলা।' অর্থাৎ যাহা অনায়াসে এবং আনন্দ নিবন্ধন করা হয় তাহাকে লীলা বলে। এই লীলার বা ক্রীড়ার আশ্রয়রূপা শ্রীরাধা। অতএব তিনি শ্রীকৃষ্ণ লীলার বসতি স্বরূপা। নগরীতে যেমন বহু প্রকার মূল্যবান বস্তু পাওয়া যায়, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির এবং কৃষ্ণ লীলার বাসস্থান নগরীতুল্যা শ্রীরাধিকাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির এবং লীলার সর্ব প্রকার উপকরণ আছে। সে কারণ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত কান্তাগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই সবশ্রেষ্ঠা প্রেয়সী।

দেবী শব্দের অর্থ করিয়া 'কৃষ্ণময়ী' শব্দের অর্থ করিতেছেন :—

"কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥"

বাহিরের স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেন না কেন, সবত্রই তিনি কৃষ্ণকে দর্শন করেন। আকাশে নব জলধরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার কৃষ্ণস্ফূর্তি হয়। তমালবৃক্ষের দিকে তাকাইলে তাঁহার কৃষ্ণের রূপের কথা মনে হয়। ইন্দ্রধনুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শ্রীকৃষ্ণের নবরাগে রঞ্জিত বিচিত্র ময়ূর পুচ্ছের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। আকাশের বক পংক্তি কৃষ্ণবক্ষস্থ মুক্তামালার স্মরণ করাইয়া দেয়। গাভীগণকে দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণের কথা মনে হয়। এই প্রকারে যে কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন না কেন, সকল বিষয়ই তাঁহার মনে কৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপিত করে।

তিনি দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্বত্র কৃষ্ণকেই দেখেন, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণের

গুণগান শ্রবণ করেন, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ গন্ধ আঘ্রাণ করেন, বাগেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণ-নাম যশ কীর্তন করেন এবং ত্বগেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শ অনুভব করেন।

শ্রীরাধা যখন জন্মলীলা প্রকটন করিলেন তখন তিনি অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছিলেন। তৎপরে যখন বালগোপাল তাঁহার শিয়রে গিয়া করকমল দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিলেন, তখন শ্রীরাধা নয়নদ্বয় উন্মীলন করিলেন এবং দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে কৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। সেই হইতেই তিনি কেবল কৃষ্ণকে দেখেন, অপর কেহ তাঁহার নেত্র পথে আসিতে পারে না। ধ্যানে, জ্ঞানে, শযনে, স্বপনে, জাগরণে, আহারে, বিহারে সর্বাবস্থায় তাঁহার কৃষ্ণস্ফূর্তি। চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেও তাঁহার চিত্ত প্রাঙ্গনে আসিয়া কৃষ্ণ উঁকিঝুঁকি মারেন, নয়ন নিমীলিত করিলেও তিনি কেবল হৃদযে কৃষ্ণের দেখা পান। তাঁহার অগ্রে, পশ্চাতে, উভয় পার্শ্বে, উর্ধ্বে নিম্নে সকল স্থলেই তাঁহার কৃষ্ণস্ফূর্তি। অতএব তিনি যে 'কৃষ্ণময়ী' সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সব কামনা পরিপূরণ রূপ আরাধনা করেন বলিযা তাঁহার নাম রাধিকা। 'আরাধয়তি' ইতি রাধিকা।

"কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তি রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥"

অপর পক্ষে তিনিও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আরাধ্য হন বলিযা 'রাধা' নামে খ্যাতা। 'আরাধ্যতে ইতি রাধা'। উভয়ই তুল্য মূল্য ভাবে রাধিকা বা রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।

শ্রীরাধিকা পর দেবতা। তিনি পরাশক্তি, মূল কান্তাশক্তি এবং সর্ব শক্তির অংশিনী। দুর্গাদি তাঁহার অংশ স্বরূপা। 'যস্যাংশো লক্ষ্মী দুর্গাদিশক্তিঃ।" অপর পক্ষে দেবতা শব্দে যিনি ক্রীড়াবিস্তার করেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় মধুর লীলার সহকারিণী। রাধিকা বা রাধা নামের ইহাই মুখ্যার্থ। অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যেমন সকল জগতের পিতা এবং ধাতা, সেই প্রকার শ্রীরাধিকাও সর্ব পূজ্যা, পরম দেবতা, সর্ব পালিকা এবং সব জগতের মাতা। "অতএব সর্ব পূজ্যা পরম দেবতা। সর্ব পালিকা সর্ব জগতের মাতা ॥"

উভয়ের মধ্যে স্বল্প ভেদও নাই। পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন, "নৈতয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ স্বল্পোঽপি মুনি সত্তম।" একটিকে বাদ দিয়া অপরটির উপলব্ধি হয় না। একজন অখিল রসামৃত সিন্ধু, অপর জন অখণ্ডরসবল্লভা।

তিনি সর্ব লক্ষ্মীময়ী দেবী। ত্রিলোকে যত যত লক্ষ্মীগণ আছেন তাঁহারা সকলেই শ্রীরাধার অংশ স্বরূপা। সর্ব লক্ষ্মীগণের শোভা সম্পদ এবং ঐশ্বর্যের মূল উৎস শ্রীরাধিকা।

কথিত আছে যে এক সময় কোপন স্বভাব মহামুনি দুর্বাসা শ্রীরাধার হস্তে প্রস্তুত অন্ন দ্রব্য ভোজন করিবার মানসে বৃষভানু রাজার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃষভানু রাজা মুনি দুর্বাসাকে কোপন স্বভাব বলিয়া জানিতেন। সে কারণ একটু শঙ্কিত হইয়াছিলেন। শ্রীরাধা সেই সময় সখীগণের সহিত ধূলা মাটি লইয়া খেলা করিতেছিলেন। ধূলিরাশি সংগ্রহ করিয়া অন্নের স্তূপ প্রস্তুত করিতেছিলেন। মৃত্তিকা দ্বারা নানাবিধ মিষ্টান্ন তৈয়ারী করিতেছিলেন, যেমন বালিকারা স্বভাবতঃ ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেই প্রকার। এমন সময় দুর্বাসা মুনি তাঁহার নিকট আসিয়া অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন এবং মনে করিতেছেন—যাঁহার কথা তিনি শুনিয়াছেন, ইনিই সেই সর্ব লক্ষ্মীময়ী দেবী। তিনি শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মা আমি তোমার হস্তে প্রস্তুত দ্রব্য আহার করিব। শ্রীরাধা ক্রীড়ামোদে তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সম্বর্ধনা করিলেন। তৎপরে তিনি ধূলি মাটি দিয়া যাহা যাহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই সকল একে একে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার চিন্ময় করকমল স্পর্শে ধূলিকণা দ্বারা প্রস্তুত অন্ন, কদম দিয়া তৈয়ারী মিষ্টান্ন প্রভৃতি সকলই নানাবিধ উপাদেয় সুমিষ্ট ভোজ্যদ্রব্যে পরিণত হইল। দুর্বাসা মুনি সে সকল ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন, এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেলেন, 'মা তোমার হস্তে প্রস্তুত দ্রব্য যদি কেহ আহার করে, তাহা হইলে সে দীর্ঘায়ু হইবে।"

মা যশোদা এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকাকে প্রত্যহ নিজালয়ে আনয়ন করাইয়া তাঁহার গোপালের নিমিত্ত তাঁহার দ্বারা বিবিধ পাক কর্ম নিষ্পন্ন করাইতেন। অতএব তিনি যে সর্ব লক্ষ্মীময়ী দেবী তাহাতে আর সন্দেহ কি? দুর্ব্বাসা মুনির এই আশীর্বাদ লীলার দিক হইতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ শ্রীরাধা প্রতি দিন এই কার্য ব্যপদেশে নন্দালয়ে গিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের দর্শন লাভ করার সুযোগ পাইতেন।

তাঁহার হস্তে ধূলি মাটিও যে বিবিধ ভোজ্য দ্রব্যে পরিণত হইতে পারে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কারণ লৌকিক জগতে যখন শুনিতে পাওয়া যায় যে স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোনা হইয়া যায়, তখন তাঁহার চিন্ময় করস্পর্শে, ধূলা মাটিও যে বিবিধ ভোজ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত হইবে তাহাতেই বা সন্দেহ কি?

প্রেম অন্তর্যামী

শ্রীরাধিকা যেমন সর্ব লক্ষ্মীময়ী, তেমনি সর্বকান্তি। কান্তি শব্দের এক অর্থে যেমন অঙ্গের শ্যামলতা, দ্যুতিশীলতা, লাবণ্য এবং ঔজ্জ্বল্য বুঝায়, তেমনি আর এক অর্থে ইচ্ছা বা অভিলাষ বুঝায়। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী সর্বকান্তি শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধিকাতেই রহে॥"

শ্রীরাধাই কেবল শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় অভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থা। তিনিই শ্রীকৃষ্ণের মনোগত বাসনা কি এবং ক্ষণে ক্ষণে কোন্ কোন্ বাসনা তাঁহার চিত্তে উদিত হইতেছে যাহা শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বুঝিতে পারেন না সেই সকল অভিলাষ—শ্রীরাধিকাই তাঁহার মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া বাহির করিতে পারেন। কারণ প্রেম অন্তর্যামী। তিনি তাঁহার সকল অভিলাষ পূর্ণ করেন বলিয়া সর্বকান্তি।

যদিও কাম এবং প্রেমে সুদূর ব্যবধান, তথাপি এস্থলে কাম এবং প্রেমের একত্র মিলন। কামের হৃদগত বাসনা প্রেমের মাধুর্য নব নব রূপে ভোগ করে এবং প্রেম তাহার সন্ধান পাইয়া তাহা পূর্ণ করেন। অতএব এখানে কামে প্রেমে যেমন মধুর মিলন, তেমনি প্রেম অন্তর্যামী এবং সর্বজ্ঞ।

শ্রীরাধা তাঁহার অঙ্গ সৌরভের দ্বারা এবং চঞ্চল অপাঙ্গ মাধুর্য বিকিরণ করিয়া মাধবকে উন্মাদিত করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :

"জগৎমোহন কৃষ্ণ—তাঁহার মোহিনী।
অতএব সকলের পরা ঠাকুরাণী॥"

শ্রীকৃষ্ণ তাহার অসমোর্ধ্ব মাধুর্য্য শক্তির দ্বারা সকলকেই আকর্ষণ করেন তাই তাঁহার নাম কৃষ্ণ। শ্রীরাধিকাও সেই সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সুদৃঢ় প্রেম শৃঙ্খল দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম "কৃষ্ণা"।

শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনত্ব রূপ শ্রীরাধার অসমোর্ধ্ব প্রেমের বিজয় ঘোষণা করে। কারণ—

"রাধা সঙ্গে যদাভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্ব মোহোঽপি স্বযং মদন মোহিতঃ॥"

(গোবিন্দলীলামৃতং ৮ম সর্গ ৩২)

শ্রীরাধার সহিত বিরাজমান থাকিলেই, তাঁহার মদনমোহনত্ব রূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, নতুবা তিনি বিশ্বমোহন হইলেও মদন মোহিত হইয়া পড়েন।

অহৈতুকী করুণা (আলী কিশোরী)

শ্রীরাধার অশেষ গুণাবলীর মধ্যে, তাঁহার অহৈতুকী করুণার বহু উজ্জ্বল কাহিনী আছে। অজামিল মৃত্যুকালে তাঁহার নারায়ণ নাম্নী পুত্রকে 'নারায়ণ' সম্বোধন করিয়া নামাভাসে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ এবং সুবিদিত। কিন্তু শ্রীরাধার অহৈতুকী করুণার বহু দৃষ্টান্ত থাকিলেও সেগুলি গুহ্য। এস্থলে একটি কাহিনী বিবৃত হইতেছে।

এক ব্যক্তির কিশোরী নামে এক পত্নী ছিল। তাঁহার পত্নীর অকালে প্রাণ বিয়োগ হওয়ায় তিনি তাঁহার শোকে অতিশয় মুহ্যমান হইযাছিলেন। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্বসময়ে এবং সর্বাবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে 'কিশোরী কিশোরী' বলিয়া ক্রন্দন করিতেন। একদা বৃন্দাবনের কোন নিভৃত স্থলে বসিয়া 'কিশোরি, কিশোরি' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন এবং নয়নের জলে বদন সিক্ত করিতেছেন, এমন সময় শ্রীরাধা সখীবৃন্দে পরিবৃতা হইয়া, তাঁহার প্রিয়তমের সহিত বনবিহারের নিমিত্ত সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। লোকটির 'কিশোরি, কিশোরি' আর্তনাদে তাঁহার কোমল হৃদয় বিগলিত হইল। তাঁহার প্রিয়তমের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি লোকটির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই, কিশোরি, কিশোরি' বলিযা চীৎকার করছিস্ কেন? এই দেখ না আমিই তো কিশোরী – তোর নিকট আসিযাছি। তুই আমার সঙ্গে চল্—কত আনন্দে কত হাস্য পরিহাসে দিন কাটাতে পারবি। তোর ব্যথিত জীবনে অফুরন্ত আনন্দ ধারা বয়ে যাবে।" এই বলিয়া তিনি তাহার গুণময় দেহ পরিত্যাগ করাইয়া তাহাকে চিন্ময় দেহ প্রদান করিলেন এবং তাহাকে তাঁহার চরণের দাস্য দিয়া তাঁহার সখীবৃন্দের করে সমর্পণ করিলেন। সেই হইতে তাহার নাম হইল 'আলী কিশোরী'।

শ্রীরাধার চরণের দাস্য যাহা কোটি জন্ম সাধন করিয়াও লভ্য হয় না, তাহা সেই ব্যক্তি শ্রীরাধার অহৈতুকী কৃপার বলে, নামাভাসে অনায়াসে লাভ করিলেন। ইহা শ্রীরাধার অহৈতুকী কৃপার একটি নিদর্শন।

অনেকে প্রশ্ন করিবেন যে মুক্তি অপেক্ষা শ্রীরাধার চরণ দাস্য কি বড়? গোস্বামিগণ বলিবেন, সহস্র গুণে বড়। তাঁহারা মুক্তিকে শুক্তিবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহার 'বিলাপ কুসুমাঞ্জলি' কবিতায় ইহাকে 'বরদাস্য' বলিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি' নামক স্তোত্রে নিম্নোক্ত শ্লোকে শ্রীরাধার দাস্য প্রার্থনা করিতেছেন :—

অপার করুণাপূর পূরিতান্তর্মনো হ্রদে।
প্রসীদাস্মিন জনে দেবি নিজ দাস্যস্পৃহা জুষী ॥ ১৭।

হে মহাভাগে শ্রীরাধে! তোমার মনঃ রূপ সরোবর সর্বদা করুণা বারি দ্বারা পরিপূর্ণ। অতএব দয়া করিয়া আমাকে তোমার চরণের দাস্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর। ইহাই আমার কাতর প্রার্থনা, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ।

ভাগবতে রাধা নাম গুপ্ত কেন?

যদিও রাধানাম বা অন্য কোন গোপীর নাম শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হয় নাই, তথাপি ব্যঞ্জনা বৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ বিশেষ ভঙ্গী প্রয়োগে রাধানাম এবং তাঁহার মহিমা বিবিধভাবে কীর্তিত হইয়াছে। টীকাকারগণ পরীক্ষিতের মহতীসভায় রাধানাম গোপন রাখিবার বিবিধ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি কারণ ব্রজ রমণিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলা অতিশয় গুহ্য এবং রহস্য জনক। কথিত আছে যে যোগমায়া দেবী শ্রীশুকদেবকে পরীক্ষিতের মহতীসভায় ব্রজ কান্তাগণের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কারণ যে সকল লীলা বেদেরও অগোচর, সেই সব লীলা পরীক্ষিতের সভায় যেখানে কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, ন্যাসী প্রভৃতি বহুবিধ রুচি-সম্পন্ন ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে, সেখানে হয়তো তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন না এবং এ সকল লীলার পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিবেন না।

অপর একটি কারণ শ্রীরাধা নাম শুকদেবের এতই হৃদ্য ছিল যে সে নাম উচ্চারণ করিলে হয়তো প্রেমবৈবশ্যবশতঃ তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিবেন এবং তাহা হইলে মহারাজ পরীক্ষিতকে আর শ্রীমদ্ভাগবত শুনাইতে পারিবেন না এই আশঙ্কায় তিনি রাধানাম বা অন্য কোন গোপীর নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন নাই।

তবে ব্যঞ্জনা বৃত্তির দ্বারা বিশেষ কৌশল সহকারে ব্রজযুবতীগণের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বভাবের পরিচয় দিয়া 'কাচিৎ' 'কা' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা যাহাকিছু বলার প্রয়োজন সব কিছুই বলিয়া ফেলিয়াছেন। পত্রান্তরালে বিকশিত কুসুম লুক্কায়িত থাকিলেও তাহার সৌগন্ধ যেমন তাহার ঠিকানা বাহির করিয়া দেয়, তিনিও সেই প্রকার ব্রজরামাগণের নাম সংগোপন করিয়া রাখিলেও ভঙ্গিক্রমে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন।

ব্যঞ্জনা বৃত্তিই রাধানাম সংগোপনের মুখ্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়। ব্যঞ্জনা বৃত্তির মধ্যে তীব্র অনুসন্ধান পিপাসা এবং জানিবার প্রবল উৎকণ্ঠা থাকে, ফলে যখন গোপনীয় বস্তু উদ্ঘাটিত হয় তখন তাহা অতীব চিত্তাকর্ষক

এবং মধুর হইয়া উঠে। গুহ্য এবং রহস্য বস্তু পরম আদরণীয়। Mystic ভাবগুলি প্রাণের মধ্যে গভীর ঔৎসুক্য জাগাইয়া তুলে। Mysticism কাব্যের একটি মধুর উপাদান।

কিন্তু ভাগবতে রাধানাম প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলেও যেমন ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়া অরুণ কিরণ সহসা আবির্ভূত হয়, সেই প্রকার রাধানাম ভাগবতের শ্লোকের অন্তরালে থাকিয়া স্থান বিশেষে অলক্ষিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যথা—

"অনযারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহ.॥" (ভাঃ ১০।৩০।২৮)

শ্রীকৃষ্ণান্বেষণেরতা ব্রজগোপীগণ বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ পদচিহ্নের সহিত মিলিতভাবে কোন গোপরমণীর চরণ চিহ্ন রহিয়াছে তখন বিপক্ষপক্ষীয় গোপীগণ ক্ষোভে এবং ঈর্ষায় অধীর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সুহৃদপক্ষীয়া ব্রজ রমণীগণ সেই রমণীর পরম সৌভাগ্য জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—এই কৃষ্ণসহগামিনী রমণী নিশ্চয়ই সর্বদুঃখহারী (হরি) সর্ববাঞ্ছাপূর্ণকারী (ঈশ্বর) শ্রীনারায়ণকে (ভগবানকে) আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছে। তাহা না হইলে গোবিন্দ আমাদের মত সুন্দরী যুবতীগণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রমণীকে সঙ্গে লইয়া নির্জন স্থানে গমন করিবেন কেন? হরি, ঈশ্বর এবং ভগবান শব্দে 'নারায়ণকে' বুঝায়। কারণ নরলীলায় গোপীগণের উপাস্য দেবতা শ্রীনারায়ণ। তাঁহাদের ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন, শুদ্ধ মাধুর্যময় প্রেম শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ভাবে ভগবত্তা পোষণ করিতে পারে না। এস্থলে সুহৃদপক্ষীয় ব্রজরমণীগণ সেই পরম সৌভাগ্যবতী রমণীর নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন নাই। তাহার স্বপক্ষীয় রমণীগণ অবশ্য সেই রমণী যে 'কে' তাহা পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

যাহা হউক, 'অনয়া' শব্দের দ্বারা কোন্ রমণীকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং কাহার সৌভাগ্য বর্ণিত হইয়াছে এবং এই শ্লোকের দ্বারা কাহার মধুর ছবি মানস পটে অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞজনের জানিতে বাকী থাকে না। এস্থলে রাধিকা নাম গুপ্ত থাকিলেও বিশেষ কৌশল ভঙ্গীদ্বারা শ্রীশুকদেব গোস্বামী ব্রজগোপীদিগের মুখ দিয়া প্রকারান্তরে শ্রীরাধানাম প্রকাশ করিলেন। রাধিকা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যিনি আরাধনা করেন। অতএব কৌশল ক্রমে 'আরাধিত' শব্দের দ্বারা 'রাধিকা' নামই সূচনা করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের উক্ত শ্লোকের টীকা হইতে 'রাধা' নাম আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা শ্রীরাধার স্বপক্ষীয়া ব্রজ রমণীগণের

উক্তি। তাঁহারা বিপক্ষীয়া গোপীগণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—হে অনয়াগণ! অর্থাৎ অতি মহীয়সী সেই রমণীর সহিত তোমরা বৃথা সাম্যাভিমান পোষণ করিতেছ, অতএব তোমরা প্রেমপ্রীতিজ্ঞানহীনা। প্রাণমন হরণকারী তোমাদিগকে বঞ্চনে সমর্থ (ঈশ্বর) এবং সুন্দর কামাতুর (ভগবান) এই হরি (কৃষ্ণ) নিশ্চয়ই রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন (রাধিতঃ), যেহেতু তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রমণীর (রাধার) ইন্দ্রিয় সমূহের রমণার্থ (গোবিন্দ) প্রীতমনে তাঁহাকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।

ভগবানের এক অর্থ সুন্দর এবং কামাতুর। "ভগং শ্রীকাম-মাহাত্ম্য-বীর্য্য-যত্নার্ক কীর্ত্তিষিত্যময়ঃ।" গোপরমণীগণের প্রেমকে 'কাম' বলার রীতি আছে। "প্রেমৈব গোপরামানাং কামঃ ইত্যগমৎ প্রথাম্।" (ভঃ রঃ সি) কিন্তু ইহা প্রাকৃত কাম নয়। কারণ পর ছত্রে ভক্তি রসামৃত সিন্ধু বলিয়াছেন—'ইত্যুদ্ধবাদয়ো ? প্যোতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ।' উদ্ধবাদি শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ এই প্রেম প্রার্থনা করিয়াছেন।

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম ক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥" (চৈঃ চঃ ২ ৮।১৭৪)

'ঈশ্বর' অর্থে যিনি বঞ্চনা কবিতে সমর্থ। গোবিন্দ শব্দের অর্থ যিনি ইন্দ্রিয় বৃত্তির পরিচালক। 'গো' শব্দের এক অর্থে ইন্দ্রিয় বুঝায়।

অতএব শ্রীরাধার যূথবৃন্দ বিপক্ষীয় রমণীগণ যথা চন্দ্রাবলী, ভদ্রা, শৈব্যা প্রমুখ সকলকে সম্বোধন করিয়া যেন স্পষ্টাক্ষরে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছেন:—

"হে অসূয়াপরায়ণ ব্রজ রমণিগণ! তোমরা কি বুঝিতে পারিতেছ না এই পদচিহ্ন কাহার? ইহা পরম সৌভাগ্যবতী শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন। তোমরা তাঁহার সহিত নিজদিগকে তুল্য মনে কর। তিনি যে কত মহীয়সী তাহা তোমাদের ধারণা নাই, অতএব তোমরা প্রেমনীতি জ্ঞানশূন্যা। তাই তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না, কেন প্রেমপিপাসু গোবিন্দ তোমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া রাধিকাকে সঙ্গে লইয়া নিভৃত নিকুঞ্জে তাঁহার সহিত রমণ করিতেছেন।" 'রাধিত' শব্দার্থের দ্বারা রাধানাম সুস্পষ্ট হইয়াছে।

প্রাচীন পুরাণাদিতে রাধা নাম

গোপালোত্তর তাপনীতে তিনি 'গান্ধর্বা' নামে খ্যাতা। ঋক্ পরিশিষ্টে রাধা নাম পাওয়া যায়। যথা 'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।' পদ্ম পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, গর্গপুরাণ, নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বিবিধ প্রাচীন পুরাণাদিতে রাধা নাম এবং তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণের একটি বচন :—

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ংতথা।
সর্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা ॥ (উঃ নীঃ রাধা প্রঃ ৫)

নারদ পঞ্চ রাত্রে শ্রীমহাদেবের উক্তি :—

"রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা।
বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণ তমা সতী।"

সে কারণ শ্রীরাধা নাম আধুনিক বৈষ্ণবদিগের নব প্রবর্তিত নাম নহে। রাধা নাম প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত।

লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর মহাশয় তাঁহার কৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থে রাধা নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন নাই। তথাপি ভঙ্গীক্রমে 'জয়শ্রী, কমলা, লক্ষ্মী প্রভৃতি ঐশ্বর্যাত্মক শব্দের মাধ্যমে রাধার প্রণয় মহিমা বিঘোষিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থ রাসলীলার ভাবে বিভাবিত লীলাশুক মহাশয়ের ভাবোচ্ছ্বাসময়ী কবিতা। রাধা প্রেমে রসায়িত রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য তিনি শ্লোকে শ্লোকে উদগীরণ করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থের প্রথমদিকে রাধা নাম সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করেন নাই। পরে ৭৬ নং শ্লোকে প্রথম রাধা নাম ব্যক্ত করিলেন, যথা—

"তেজ সেহস্ত নমো ধেনু পালিনে লোক পালনে।
রাধা-পয়োধরোৎসঙ্গ-শায়িনে শেষ শায়িনে ॥"

যিনি একই দেহে অনন্ত ধেনু পালক রূপে এবং চর্তুভূজ রূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পালক রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, যিনি অখণ্ডলোকসমূহের পালক, যিনি অনন্ত-শায়ী এবং শ্রীরাধার পয়োধরোৎসঙ্গশায়ী, সেই অনির্বচনীয় পুরুষের তেজঃ পুঞ্জকে প্রণাম করি।

তৎপরে পুনরায় অন্তিমের দিকে যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ ঘটিল এবং যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন এবং উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল, তখন লীলাশুক তাঁহার নিম্নোক্ত ১০৬ নং পদ্যবন্ধে রাধা নাম সুস্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়া স্বাভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন :-

যানি তচ্চরিতামৃতানি রসনা লেহ্যানি ধন্যাত্মনাম্।
যে বা শৈশব চাপল ব্যতিকরা রাধা বরোধোন্মুখাঃ
যা ভাবা ভাবিত বেণুগীত গতয়ো লীলামুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিকয়া বহন্ত হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে ॥"

ওহে কৃষ্ণচন্দ্র! যদি তুমি আমাকে বর দিতে চাও, তাহা হইলে আমাকে

এই বর দাও যে তুমি শ্রীরাধার সহিত নিরন্তর যে মনোহারী কুঞ্জলীলা করিয়া থাক, শুকদেব আদি ধন্যাত্মাগণ যে সকল লীলামৃত রসনায় লেহন করিয়া অপার সুখ আস্বাদন করেন, কৈশোর চাপল্য হেতু দানঘাটী পথে পুষ্পচয়ন কালে তুমি যে শ্রীরাধাকে অবরোধ করিয়াছিলে এবং তোমার কামমদোদ্গারীস্মিত মুখারবিন্দে বিরাজিত বেণুগীতের নব নব মাধুর্য সম্বলিত লীলা সমুদয় আমার হৃদয়ে যেন ধারাবাহিকরূপে প্রবাহিত হয়। ইহা ব্যতীত আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই।

নিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রাচীনকাল হইতে রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা করিতেন। দাক্ষিণাত্যে রাধা নাম কি ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন। কাহারও কাহারও মতে শ্রী নিম্বার্ক সম্প্রদায় দ্বারা দাক্ষিণাত্যে রাধা নাম প্রচলিত হইয়াছিল। শ্রীনিম্বাদিত্যের জন্মস্থান লইয়া মতবিরোধ আছে। কেহ কেহ বলেন তৈলঙ্গ দেশে মুঙ্গের পত্তন নামক স্থানে তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। অন্য মতে তিনি গোবর্ধনে নিম্ব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেকারণ তাঁহার নাম নিম্বাদিত্য। ইহাই প্রচলিত মতবাদ। অপর কেহ কেহ বলেন, তিনি যমুনার তীরে বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করেন।

জয়দেব কৃত শ্রীগীতগোবিন্দ রাধা নামের দ্বারা মুখরিত। এবং বাসন্ত মহারাসে তাঁহার প্রেম মাহাত্ম্য সুচারুভাবে কীর্তিত। তৎপরে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখ ভক্ত কবিগণের মধুর পদাবলীতে রাধা নাম এবং তাহার মহিমা যে ভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া বাঙ্গালীর উষর প্রাণে প্রেমের মন্দাকিনী বহাইয়া দিয়াছে তাহার তুলনা মিলে না। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী।

শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক রাধা নামের মাহাত্ম্য খ্যাপন।

অতএব যাঁহারা বলেন যে রাধা নাম ভাগবতে নাই, ইহা গৌরের আমদানী করা নাম, তাঁহারা যে কত ভ্রান্ত তাহা পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায়। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে তিনি যে ভাবে রাধার প্রেম মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছিলেন এবং রাধাপ্রেমকে সাধ্য শিরোমণিরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন তাহা অদৃষ্টপূর্ব এবং অননুভূতপূর্ব, এবং যে উন্নত এবং উজ্জল ভক্তি রসের সন্ধান দিয়াছিলেন তাহা 'অনর্পিত চরী' বলিয়া প্রখ্যাত।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার চৈতন্যচন্দ্রামৃত কাব্যে লিখিয়াছেন :—

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্য মুটঙ্কিতম্
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।

যত্রাধারতিকেলিনাগর রসাস্বাদৈক সদ্ভাজনম্
তদ্বস্তু প্রথনায় গৌর বপুষা লোকেঽবতীর্ণোহরিঃ ॥ (দশম বিভাগ ১২২)

প্রেম নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণ পথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ।
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবন বিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ ॥
কো বা জানাতি রাধাং পরম রস চমৎকার মাধুর্য্য সীমা
মেতশ্চৈতন্য চন্দ্রঃ পরম করুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥" (দশম বিভাগ ১৩০)

শ্রীমদ্ভাগবতের পরম তাৎপর্য যাহা শ্রীশুকদেব রাসপ্রসঙ্গে উট্টঙ্কিত করিয়াছেন তাহার বিস্তার কেবল চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রেম নামক পরম পুরুষার্থ, যাহা পূর্বে কাহারও শ্রবণ পথে গমন করে নাই, নাম মহিমা যাহা কেহ জানিতেন না, বৃন্দাবনের পরম মাধুরী যাহাতে কেহই প্রবেশ করিতে পারে নাই, পরমাশ্চর্য মাধুর্য রসের পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধা যাহা পূর্বে কেহই অবগত ছিলেন না, এক চৈতন্য চন্দ্র প্রকটিত হইয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রাধা নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের নব প্রবর্তিত নাম নহে। ইহা প্রাচীন যুগ হইতেই আছে বটে কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে শ্রীরাধা নাম এবং তাঁহার প্রণয় মহিমা জগতে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছে।

সংযোগাবস্থা

পূর্বে বিয়োগের মধ্য দিয়া রাধা প্রেম যে কত উচ্চস্তরে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। এখন সংযোগে সেই প্রেমের অবস্থা কিরূপ তাহার সামান্য আলোকপাত করা হইতেছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে সমর্থা রতিতে কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবা ব্যতীত নিজ সুখভোগের বিন্দুমাত্র কালিমা নাই। সর্ব নায়িকা শিরোমণি শ্রীরাধার মধ্যেই সমর্থারতির সর্বোৎকর্ষ। সে কারণ তাঁহার নিকটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একান্ত বশীভূত। কৃষ্ণ যখন রাধিকাকে 'আমি তোমার' বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তখনি শ্রীরাধা তাঁহার অতুলনীয় প্রেম সম্পত্তির দ্বারা 'তুমি আমার' বলিয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করিলেন। এই প্রকারে 'তদীয়তাময়' এবং মদীয়তা ময়' ভাব সংযোগে প্রেমের অপূর্ব উচ্ছলন হইল এবং প্রেমের যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পাদিত হইল, পবিত্র দেব দুর্লভ ব্রজলোকে।

সর্ববিধ লীলার মধ্যে মিলন বা সম্ভোগ মুখ্যরস। সম্ভোগকে পুষ্টি দান করে বলিয়া বিপ্রলম্ভের প্রয়োজন। সমর্থারতির মধ্যে সম্ভোগেচ্ছা নিত্য বিদ্যমান। কিন্তু ইহা সাধারণী এবং সমঞ্জসা রতির সম্ভোগেচ্ছা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ

সাধারণী এবং সমঞ্জসা রতির সম্ভোগেচ্ছা স্বতন্ত্রভাবে উদিত হয়। কিন্তু সমর্থা-রতির সম্ভোগেচ্ছা রতির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত। ইহাকে রতি হইতে কখন বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং ইহা কখন পৃথকভাবে প্রতীতিগোচর হয় না। ইহা এতই অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক যে ইহাতে নায়ক নায়িকার অর্থাৎ কাহারও স্বসুখবাসনার লেশমাত্র নাই। সম্ভোগের মধ্যে থাকে কেবল পারস্পরিক রসাস্বাদন চমৎকারিতা। নায়ক চাহেন নায়িকার সুখ সম্পাদন, নায়িকা চান নায়কের সুখ বিধান। কেহই নিজের জন্য সুখাভিলাষ করেন না। ইহা উন্নত প্রেমের স্বভাব। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি সমর্থারতির বিশ্লেষণে বলিয়াছেন, সাধারণী এবং সমঞ্জসা রতি হইতে বিশেষভাব-যুক্ত যে রতির দ্বারা সম্ভোগেচ্ছা তাদাত্ম্য, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগেচ্ছার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয় তাহাকে সমর্থা রতি বলে। এই প্রকার শৃঙ্গার রসোচিত সমর্থা রতি একমাত্র শ্রীরাধাতে বিদ্যমান। [কঞ্চিদ্ বিশেষ মায়াস্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ। রত্যাতাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভন্যতে ।।" (স্থায়িভাব প্রঃ ২৬)]

রসশাস্ত্রবেত্তাগণ সম্ভোগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান। পূর্বরাগের পর যে সম্ভোগ অর্থাৎ যে সম্ভোগে লজ্জা ভয় বিজড়িত থাকে তাহা সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ। মান ভঙ্গের পর যে সম্ভোগ তাহা সংকীর্ণ সম্ভোগ। অদূর প্রবাসের পর যে সম্ভোগ ত হা সম্পন্ন এবং দীর্ঘ বিরহের পর যে সম্ভোগ তাহা সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ।

সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে বিলাস সুখের তন্ময়তা নিবন্ধন কেহ কাহারও অস্তিত্বের সন্ধান রাখেন না। রমণ এবং রমণীত্বের অনুভব পযন্ত বিলুপ্ত হয়। থাকে কেবল বিলাস মাধুর্যের অভূতপূর্ব অনুভূতি। শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাধ্য সাধন তত্ত্ব শুনাইতে শুনাইতে যখন কিছুতেই পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি তাঁহার স্বরচিত 'প্রেম বৈবর্ত্ত' সূচক একটি গীত শুনাইয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তাহার একটি চরণ—'না সো রমণ না হাম রমণী।'

ইহা প্রেমের পরিপক্ক অবস্থা। ইহাতে আত্মাবিস্মৃতি, ভ্রম এবং বৈপরীত্য জড়িত আছে। অপর পক্ষে ইহা উভয়ের চিত্তের নির্ধূত ভেদ ভ্রমের অবস্থা। দুইখণ্ড লাক্ষা যেমন অগ্নির উত্তাপে গলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়, তদ্রূপ তাঁহাদের চিত্ত গলিয়া মিশিয়া এমন ভাবে একত্ব প্রাপ্ত হয় যে পৃথকত্বের কথা ভ্রমেও কখন উদিত হইতে পারে না। কে যে রমণ এবং কে যে রমণী এ ভেদ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়। থাকে কেবল মিলনানন্দ চমৎকারিতা। ইহা অনুরাগের ভাবস্বরূপে স্বসম্বেদ্য দশা। শ্রীরাধার অনুরাগ এতই উৎকর্ষ লাভ করে যে ইহা স্বসম্বেদ্য দশা এবং যাবদাশ্রয় বৃত্তি

প্রাপ্ত হইয়া উদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিক ভাব দ্বারা প্রকাশিত হয়। ইহা অনুরাগের পরবর্তী স্তর ভাব। ভাব সম্বন্ধে উজ্জ্বল নীলমণি বলিয়াছেন :—

"অনুরাগঃ স্বসম্বেদ্য দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয় বৃত্তিশ্চেৎ ভাবঃ ইত্যভিধীয়তে।" (স্থায়িভাব প্রঃ ৫৪)

স্বসম্বেদ্য দশা

এখন স্বসম্বেদ্য দশার অর্থ কি তাহার আলোচনা করা হইতেছে।

সম্বেদন শব্দের অর্থ সম্যকরূপে জানা বা সম্যকরূপে অনুভব করা। স্বসম্বেদ্য অর্থে নিজের দ্বারা নিজের যে অনুভব। অনুরাগের স্বসম্বেদ্য দশা অর্থে অনুরাগের যে দশাটি অনুরাগের নিজের অনুভববেদ্য।

অনুরাগের তিনটি অবস্থা, যথা ভাব, করণ এবং কর্ম। ভাবস্বরূপে ভেদ-ভ্রম দূরীকরণই অনুরাগের স্বসম্বেদ্য দশা প্রাপ্তি।

উজ্জ্বল নীলমণি ইহার উদাহরণ দিয়াছেন, যথা :—

"রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্যক্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূত ভ্রমম।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ড হর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভবৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥

(স্থায়িভাবঃ ১৫৫)

গোবর্ধন পর্বতের তটকুঞ্জে ক্রীড়াশীল শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুরাগ পরাকাষ্ঠা দেখিয়া শ্রীমতী বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

হে শৈল কুঞ্জচারি মত্ত গজরাজ। শৃঙ্গার রূপ সুনিপুণ শিল্পী ভাবোষ্মারূপ অগ্নি তাপে রাধা ও তোমার চিত্তদ্বয় রূপ লাক্ষা দুইটিকে দ্রবীভূত করিয়া ধীরে ধীরে একত্র করিয়া ভেদভ্রম দূরীভূত করিয়াছেন। ইহা ভাবস্বরূপে অনুরাগের স্বসম্বেদ্য দশা। এই শ্লোকটির মধ্যে স্বসম্বেদ্যদশা এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তি উভয় লক্ষণই বর্তমান। প্রথম দুইটি চরণ স্বসম্বেদ্য দশা এবং শেষের দুইটি চরণ যাবদাশ্রয়বৃত্তি।

এই শ্লোকের মর্মার্থ এই যে, নিপুণ শিল্পী যেমন ধনী লোকদিগের অট্টালিকা চিত্রিত করিবার নিমিত্ত হিঙ্গুলাভ লাক্ষাকে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তাহার উপর আবার প্রচুর পরিমাণে হিঙ্গুল মিশাইয়া পাকা রং প্রস্তুত করেন এবং তদ্দারা অট্টালিকাদিগকে অপরের চিত্তাকর্ষক রূপে অনুরঞ্জিত করেন, সেই প্রকার শৃঙ্গার রসরূপ সুনিপুণ শিল্পী শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তরূপ লাক্ষাকে স্বেদরূপ উত্তাপের দ্বারা গলাইয়া মিশাইয়া একীভূত করিয়া দেন, যাহাতে তাঁহাদের উভয়ের পৃথক সত্তা

কাহারও চিত্রপটে উদিত হইতে না পারে এবং পুনরায় তাঁহাদের চিত্তের উপরে নিত্যনবনবায়মান রসরূপ হিঙ্গুল দ্বারা রঞ্জিত করিয়া থাকেন, যাহাতে উভয়ে উভয়ের প্রতি অসীম অনুরাগ বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তকে লাক্ষার সহিত তুলনা করিবার হেতু এই যে উভয়ের চিত্তস্থিত মঞ্জিষ্ঠা রাগই লাক্ষা, যদ্বারা মহাভাবের বিকাশ সাধিত হয় এবং তদ্বারা অপরের চিত্তও দ্রবীভূত হইয়া যায়।

ইহা ভাবস্বরূপে অনুরাগের স্বসম্বেদ্য দশা। শ্রীরামানন্দ রায়ের 'দুঁহু মনোভব পেষল জানি' গীতের এই বচনটিও অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করে। পূর্ণগীতটি অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে।

করণস্বরূপে—যাহা দ্বারা কিছু করা যায় তাহাই তাহার করণ। স্ববিদংশে অনুরাগ দ্বারা মাধুর্য্য অনুভূত হয় বলিয়া ইহা তাহার করণ। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ;—

"প্রৌঢ় নির্মলভাব প্রেম সর্বোত্তম
শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের করণ।" (১।৪।৪৪)

কর্মস্বরূপে—অনুরাগোৎকর্ষ দ্বারা যেমন শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করা হয়, তেমনি আবার শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যাদির ফলে, অনুরাগ যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহাও অনুভব হয়। যথা

"মন্মাধুর্য্য রাধা প্রেম দোঁহে হোড় করি।
অন্যোন্যে বাড়য়ে সদা কেহ নাহি হারি॥" (১।৪।১২৪)

যে অবস্থায় ভাব, করণ এবং কর্মস্বরূপে অনুরাগের চরম অভিব্যক্তি এবং তাহার অনুভবে চরম আনন্দ, অনুরাগের সেই অবস্থাকেই স্বসম্বেদ্য দশা বলে। ইহা শ্রীরাধাদি ব্রজদেবীগণের অনুভববেদ্য—ইহা ভাবের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু ইহার চরমোৎকর্ষ একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই পর্য্যবসিত। অন্য কোন ধামের মধুরা রতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। ইহা শ্রীচক্রবর্তী মহাশয়ের আনন্দ চন্দ্রিকা টীকারূপ ব্যাখ্যা।

যাবদাশ্রয় বৃত্তি।

যাবৎ শব্দের অর্থ—যে পর্য্যন্ত বা যে পরিমাণ বা যত যত। আশ্রয় অর্থে অনুরাগের আশ্রয়। সাধকভক্ত, সিদ্ধভক্ত সকলেই অনুরাগের আশ্রয়। বৃত্তি শব্দে ব্যাপার বা ক্রিয়া। যাবদাশ্রয় বৃত্তির অর্থ—অনুরাগ নিজের অনুভবাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যখন সুদ্দীপ্তাদি ভাব বিকাশের দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং তাহা যদি সজাতীয়াশয় সিদ্ধ এবং সাধক ভক্তগণের উপর ব্যাপ্তি এবং প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ যাহার অনুভবে তাঁহারাও অনুরাগে বিবশ হইয়া পড়েন, তখন বলা যায় যে অনুরাগ যাবদাশ্রয়

বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র মিলনে ব্রজসুন্দরীগণের অনুরাগোৎকর্ষ দর্শন করিয়া নিকটস্থ সকলকার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। শ্রীরাধার বিরহ দশায় তির্যক জাতি যে রোদন করিত, দ্যুলোক, ভূলোক প্রভৃতি তাঁহার দুঃখে অভিভূত হইত তাহা শ্রীরাধার অনুরাগের যাবদাশ্রয় বৃত্তি। ইহা স্বানুরাগের অপরের উপর ক্রিয়া। ইহাও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকানুসারে ব্যাখ্যা।

শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার 'লোচন রোচনী' টীকায় অপর একটি অর্থ করিয়াছেন। তিনি আশ্রয় শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অনুরাগের আশ্রয় অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া অনুরাগের উৎকর্ষ। প্রেমের ক্রমবিকাশে রাগ অনুরাগের পূর্ব কক্ষা। অতএব রাগ অনুরাগের আশ্রয় বা ভিত্তি। যাবৎ শব্দে ইয়ত্তা বা সীমা বুঝায়। বৃত্তি শব্দের অর্থ সত্তা। "যাবদাশ্রয়মিতি ইয়ত্তাথামব্যয়ীভাবঃ। যাবৎ পাত্রং তাবৎ ব্রাহ্মণানামন্ত্রয়স্ব ইতিবৎ।" অর্থাৎ যাবৎ পাত্র থাকে, তাবৎ ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ কর—এই বাক্যে যাবৎ শব্দের যে অর্থ, যাবদাশ্রয়েরও সেই অর্থ প্রযুক্ত হইবে। অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া যখন রাগবিকাশের চরমসীমান্তে গিয়া পৌঁছায় তখনই অনুরাগের যাবদাশ্রয়বৃত্তি। উজ্জ্বল নীলমণি রাগের সংজ্ঞা দিয়াছেন—যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গাদিলাভের জন্য অত্যন্ত দুঃখকেও চিত্তে অতীব সুখ বলিয়া মনে হয়, সেই প্রণয়োৎকর্ষ অবস্থাটির নাম রাগ। "দুঃখমত্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে। যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগঃ ইতি কীর্ত্যতে।" দুঃখের পরমকাষ্ঠাকে যে অবস্থায় সুখের পরমকাষ্ঠা বলি। মনে হয় সেই অবস্থাটিই রাগের চরম ইয়ত্তা বা সীমা। অতএব অনুরাগ যখন এই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা অনুরাগের যাবদাশ্রয় বৃত্তি।

উদাহরণ—ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গলাভের জন্য কুলধর্ম, বেদধর্ম স্বজন আর্য্যপথ সকলি অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু কুলবতী রমণীগণের পক্ষে কুলধর্ম বিসর্জ্জনের ন্যায় অধিকতর দুঃখ আর নাই। ইহা মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখ দায়ক। কিন্তু রাগের বশবর্ত্তী হইয়াও তাঁহারা অম্লান বদনে তাহা বিসর্জন দিয়াছেন। ব্রজ সুন্দরিগণের এই অবস্থাটাই তাঁহাদের অনুরাগের যাবদাশ্রয়বৃত্তি। শ্রীরাধারাণী 'কৃষ্ণ কলঙ্কিনী' এই অপবাদ হইতে যে সুখ লাভ করেন তাহা তাঁহার রাগের চরম ইয়ত্তা।

অপর একটি উদাহরণ—

একদা বিরহখিন্না শ্রীরাধারাণী রাগের বশবর্তিনী হইয়া তাঁহার প্রিয়তমকে সন্দর্শন করিবার মানসে প্রবল উৎকণ্ঠার সহিত গৃহ হইতে গোষ্ঠের দিকে নিষ্ক্রান্ত

হইলেন। তখন ছিল নিদাঘকালীন মধ্যাহ্ন সময়। মার্ত্তণ্ডের প্রবল উত্তাপে চারিদিক ধূ ধূ করিতেছিল। তাহা উপেক্ষা করিয়া তিনি উত্তপ্ত বালুকা এবং কঙ্করময় পথে পদব্রজে চলিতে চলিতে গিরি গোবর্ধন তটে আসিয়া উপনীতা হইলেন। প্রিয়তমকে সুষ্ঠু ভাবে নিরীক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে উত্তপ্ত, সুতীক্ষ্ণ এবং বন্ধুর শিলারাশি অতিক্রম করিয়া পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। তিনি যে শিলার উপর তাঁহার কোমল চরণদ্বয় বিন্যস্ত করিলেন সেই স্থানে ছিল এক সূর্য্যকান্ত মণি। কথিত আছে, সূর্য্যকান্ত মণির উপর সূর্য্য কিরণ পতিত হইলে তাহার উত্তাপ সহস্র গুণে বর্ধিত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই দুর্বিসহ উত্তাপকে দুঃখ বলিয়া মনে না করিয়া গভীর অনুরাগের সহিত আনন্দাতিশয্যে কৃষ্ণমুখারবিন্দ পান করিতেছেন এবং অনবরত নয়নের জলে সে স্থল অভিষিক্ত করিতেছেন। ইহা শ্রীরাধার রাগের চরম ইয়ত্তা, অর্থাৎ অনুরাগের যাবদাশ্রয় বৃত্তি।

উজ্জ্বলের শেষ চরণ দুইটি অনুরাগের প্রভাব কিরূপ তাহাও দেখান হইয়াছে। ইহার প্রভাব এইরূপ যে ইহা ব্রহ্মাণ্ডবাসি স্বজাতীয়াশয় ভক্তবৃন্দের চিত্তে সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে বিস্তৃত হয়।

চন্দ্র সর্বত্র তাহার কিরণজাল বিস্তার করিলেও যেমন তাহার স্নিগ্ধতা এবং শীতলতা আধারের উপর নির্ভর করে, সূর্য্য যেমন নিরপেক্ষ ভাবে কিরণ বিকিরণ করিলেও তাহার উত্তাপ সর্বত্র সমভাবে অনুভূত হয় না, বস্তুর গ্রহণ যোগ্যতার উপর নির্ভর করে, সেই প্রকার যাহার যে ভাব, তাহার উপর সেই প্রকার ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহা যাবদাশ্রয় বৃত্তি। অনুরাগ যখন স্বসম্বেদ্য দশা এবং যাবদাশ্রয় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া সুদ্দীপ্ত ভাব বিভাদির দ্বারা প্রকাশিত হয়, তখনই তাহা ভাব নামে অভিহিত।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে উজ্জ্বল নীলমণি ভাব এবং মহাভাবের মধ্যে একটা বিশেষ সীমানা দেখান নাই। প্রেমের একই অবস্থার দুইটি নাম ভাব এবং মহাভাব। মহাভাবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, মহাভাব অপার্থিব অমৃতের স্বরূপ-শক্তি-বিশিষ্ট এবং ঐ বরামৃত স্বরূপের প্রতি নিজের মনকে আকৃষ্ট করে এবং নিজের সহিত ঐক্য প্রাপ্তি করায়। অনুরাগের স্বসম্বেদ্য দশার মধ্যে এই প্রকার ঐক্য নিহিত আছে। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া সরল ভাষায় লিখিলেন যে মহাভাব ভাবের পরাকাষ্ঠা।

"হ্লাদিনীর সার প্রেম—প্রেম সার "ভাব"।
ভাবের পরমকাষ্ঠা-নাম "মহাভাব॥" (১।৪।৫৯)

উজ্জ্বল নীল মণি ভাব এবং মহাভাবকে একত্র সম্মিলিতকরিয়া রতি হইতে প্রেম বিকাশের আটটি স্তর দেখাইয়াছেন কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী ভাব এবং মহাভাবকে পৃথক করিয়া প্রেম বিকাশের নয়টি স্তর দেখাইয়াছেন।

বিরহের মধ্যে শ্রীরাধায় যেমন অধিরূঢ় মোহনাখ্য মহাভাবের পরাকাষ্ঠা, তেমনি বিলাসে অধিরূঢ় মাদনাখ্য মহাভাবের পরাকাষ্ঠা। মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধার মধ্যে পরিদৃষ্ট। অন্যত্র ইহার কোন স্থান নাই।

বিলাস মহত্ত্ব

তাঁহারা উভয়ে বিলাস মহত্ত্বে এবং বিলাস মাধুর্য্যে এতই নিমগ্ন থাকেন যে কাহারও আত্মানুসন্ধান করিবার জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না। সে কারণ কাহারও মনে ক্ষণিকের জন্যও আত্ম সুখ বাঞ্ছার প্রশ্ন জাগরিত হয় না। এ বিলাস প্রেম সমুদ্র হইতে উত্থিত, প্রেম তরঙ্গ দ্বারা তরঙ্গায়িত এবং প্রেম উচ্ছলনে ফেনায়িত। এ বিলাসের উপরতি নাই—সমাপ্তি নাই। আলিঙ্গন, চুম্বন এবং সংপ্রয়োগাদির দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সুখী করিবার উদ্দাম বাসনা ব্যতীত আর কিছু থাকে না। নিজে সুখী হইবার বাসনা দ্বারা এ রতি কখন ভেদ প্রাপ্ত হয় না।

এবম্বিধ পরিপক্ক প্রেমের আর একটি মাধুর্য্য এই যে সংযোগেও আবার অসংযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। কান্ত কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হইলেও শ্রীরাধা মনে করেন, তাঁহার প্রিয়তম বুঝি তাঁহার নিকটে নাই, কোন্ দূর দূরান্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহা প্রেম বৈচিত্ত্য, ইহা বিলাস বিভ্রম। বিলাস বিবর্ত্ত বা বিলাস মহত্ত্বের মধ্যে এই প্রকার ভ্রম নিহিত। প্রেমের পরিপক্ক অবস্থায় ইহা সম্ভব হয়।

শ্রীরাধার মধ্যে যে প্রকার আনন্দ চমৎকারিতা এবং যে যে ভাব গুলি প্রকাশিত হয়, কৃষ্ণের মধ্যে সে প্রকার ভাব দৃষ্ট হয় না। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল —

'আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥
লীলা অন্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গ মাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাশরি
দোঁহার যে সমরস ভরতমুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে॥
অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হইতে রাধা সুখ শত অধিকাই॥

(১।৪।২১২-২১৫)

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, যে শ্রীরাধার মাধুর্য্য তাঁহার মাধুর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। কারণ ত্রিজগতে শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু তৎপরে পুনরায় বিচার করিয়া স্থির করিলেন যে না, তাহা নহে।

তাঁহার পঞ্চবিধ মাধুর্য্য শ্রীরাধার মাধুর্য্য হইতে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ হইবে, নতুবা শ্রীরাধা তাঁহাতে কেন এত আকৃষ্টা হইবেন। তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া শ্রীরাধা আনন্দাতিশয্যে বিভোর হন। কীচকরন্ধ্রে বায়ু প্রবেশ করিয়া ধ্বনি উত্থিত হইলে এ তাঁহার বংশীধ্বনি মনে করিয়া তিনি অচৈতন্য হন। ভ্রমবশতঃ তমাল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া সুখে মগ্ন হন। বায়ুতে তাঁহার গন্ধ অনুভব করিয়া প্রেমে অন্ধ হন, এবং তাঁহার চর্বিত তাম্বুল আস্বাদন করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হন। পরোক্ষভাবে তিনি যদি এই প্রকার আনন্দলাভ করেন, তখন সাক্ষাৎ ভাবে যে কি পরিমাণ সুখ অনুভব করিতে পারেন, তাহা কল্পনাতীত।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া এ প্রকার সুখ অনুভব করিতে পারেন না। প্রাকৃত আদিরস শাস্ত্র প্রণেতা ভরত মুনি বলেন—প্রাকৃত নায়ক নায়িকার সম্ভোগ কালে উভয়ে সমপরিমাণ সুখ উপভোগ করেন কিন্তু ভরত মুনির ব্রজের রস সম্বন্ধে ধারণা নাই তাই তিনি একথা বলিয়াছেন।

সৌন্দর্য্য এবং প্রেম

প্রেমের সহিত সৌন্দর্য্যের মিলন মণিকাঞ্চন সংযোগবৎ পরম রমণীয়। একটির অভাবে অপরটি নিস্ফল। শ্রুতি বলিয়াছেন, "**সৌন্দর্য্যমানন্দমমৃতম্**" গৌড়ীয় আচার্য্যগণ সৌন্দর্য্য এবং প্রেমের মিলন পরাকাষ্ঠার উপাসক। যিনি তাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের দ্বারা চিৎসুন্দরকে পূজা করেন, তাঁহারা তাঁহার অনুগত দাসী। প্রেম সৌন্দর্য্যকে বর্ধিত করে এবং সৌন্দর্য্যও প্রেমকে বর্ধিত করে। উভয়ই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

শ্রীমতী বিরহদশায় তাঁহার সখীগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'সখিগণ! তোরা যে আমাকে প্রবোধ দিস্ যে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার নিকটে ফিরে আস্‌বে। আমি জানি সে আস্‌বে। সে আমা ছাড়া অন্যত্র কোথাও অবস্থান করিতে পারে না। কিন্তু তোরা বল্ দেখি যদি আমার যৌবন ফুরাইয়া যায় এবং তখন সে আসে, তাহা হইলে আমি কি দিয়া তাহার সম্বর্ধনা করিব।"

কবিগুরু প্রকারান্তরে এইভাব ব্যক্ত করিয়া তাহার 'গুপ্ত প্রেম' নামক কবিতায় লিখিয়াছেন;—

"তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে?
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে?

মনে গোপনে থাকে প্রেম যায় না দেখা
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তারে
কী বলে আপনারে দিব তায়॥"

মর্ত জগতে প্রেম এবং সৌন্দর্য্যের সমাবেশ নাই। যেখানে প্রেম আছে, সেখানে হয়তো সৌন্দর্য নাই এবং যেখানে সৌন্দর্য আছে সেখানে প্রেম নাই। উপরের কবিতা হইতে পরিচয় পাওয়া যায়, প্রেম সৌন্দর্য্য বিহনে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। তাই গুপ্ত ভাবে আছে। সে কারণ লোকে দেবতাকে কুসুম দিয়া পূজা করে। সৌন্দর্য্য না থাকায় লজ্জায় হেঁটমুখে দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে তাহার প্রিয়তমকে চাহিয়া দেখে। তাহার কাছে যাইতে সাহস করে না। কারণ সে সৌন্দর্য্যের ডালি লইয়া তাহাকে পূজা করিতে পারিবে না, এই আশঙ্কায়।

এই কবিতাটি শ্রীরাধার উক্তির তুলনামূলক অর্থ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারা যায়। ইহা আক্ষেপের সুরে বাঁধা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভাবধারায় যে কতদূর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে।"

ইহা অতি উন্নত স্তরের কথা। কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য্য আছে, প্রেম নাই তাহা অতিশয় ভয়াবহ। প্রস্ফুটিত সুগন্ধি কুসুম রাজীর নিম্নভাগে যেমন বিষধর সর্প লুক্কায়িত থাকে, তেমনি যেখানে সৌন্দর্য্য আছে অথচ প্রেম নাই, তাহা পৈশাচিক ভাব সমূহের আবাস স্থল। যাঁহারা এবম্বিধ সৌন্দর্য্যে লুব্ধ হইয়া নিজেদের আহুতি দেন, তাঁহাদের দশা প্রজ্বলিত অগ্নিতে পতঙ্গ যেমন ঝাঁপ দিয়া দগ্ধীভূত হয় সেই প্রকার। কোন এক কবি রূপ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়া গাহিয়াছেন, "তুমি রূপ দেখে যদি ভালবাস সখা, ভালবেসে সুখ পাবে না।" এখানে তিনি মর্তলোকের রূপ যে ক্ষণস্থায়ী তাহাই স্মরণ করিয়া দিতেছেন।

লৌকিক জগতে প্রেম এবং সৌন্দর্য্যের মিলন নাই এবং উভয়ই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু ব্রজলোক প্রেম এবং সৌন্দর্য্যের মহামিলন ক্ষেত্র। এখানে প্রেম এবং সৌন্দর্য্য উভয়ই চিরস্থায়ী, অটুট এবং অক্ষয়। তবে শ্রীরাধা যে তাঁহার যৌবন ফুরাইয়া যাইবে বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মোহনাখ্য মহাভাবোত্থিত শঙ্কা। প্রেম সর্বদা আশঙ্কা করে, পাছে সে তাহার প্রেমাস্পদকে হারায়ে ফেলে। 'হবাই, হারাই সদা ভয় হয়, হারায়ে ফেলি চকিতে'—এই প্রকার শঙ্কা আসিয়া তাহাকে অভিভূত করে। প্রেমের মধ্যে একাধারে দৃঢ় প্রত্যয় এবং লজ্জা ভয় বিজড়িত থাকে। শ্রীরাধা নিত্য নবকিশোরী, যেমন তাঁহার প্রিয়তম

নিত্য নব কিশোর। তিনি চির নব যৌবন সম্পন্না। অতএব তাঁহার সৌন্দর্য্য অফুরন্ত।

শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য

কবি বলিলেন, মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য্য নাই বলিয়া তাহারা কুসুম দিয়া ভগবানকে পূজা করে। একথা সত্য। কিন্তু শ্রীরাধারাণী তাঁহার অফুরন্ত সৌন্দর্য্যরাশির দ্বারা তাঁহার সুন্দরকে পূজা করেন। তাহার একটি মনোরম কাহিনী নিম্নে উল্লিখিত হইল ;—

এক সময় শ্রীরাধার এক দাসী মঞ্জরী তাঁহাকে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে এমনি ভাবে বিভূষিতা করিলেন যে তাহাতে তাঁহার সৌন্দর্য্য সহস্র ধারায় উচ্ছ্বলিত হইয়া চারিদিক ঝলকিত করিল। তদ্দর্শনে সেই মঞ্জরী অতিশয় পুলকিতা হইয়া সেই সৌন্দর্য্য শ্রীরাধাকে দেখাইবার লালসায়, তাঁহার সম্মুখে একটি দর্পণ ধারলেন। কিন্তু শ্রীরাধা তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে বিমোহিতা হইয়া এবং অশ্রুজলে বসনভূষণ সিক্ত করিয়া আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিলেন, "হায়! এ সৌন্দর্য্যের দ্বারা যদি আমি আমার প্রিয়তমকে পূজা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার সৌন্দর্য্যের সার্থকতা হইত।" প্রায় সকলেই নিজের সৌন্দর্য্যে গর্ব এবং অভিমান পোষণ করেন, কিন্তু শ্রীরাধারাণী তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের দ্বারা প্রিয়তমকে যদি পূজা করিবার অবকাশ না পান, তাহা হইলে তাঁহার সৌন্দর্য্য যে ব্যর্থ হইবে এই আশঙ্কা করিয়া খেদোক্তি করেন। ইহা শ্রীরাধার সুগভীর প্রেমের এক উন্নত অবস্থা।

সৌন্দর্য্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে সৌন্দর্য্য কখন একাকী ভোগ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে না। ইহা নিজ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। ইহা ব্যষ্টিগত নয়, ইহা সমষ্টিগত। যিনি সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হন, তিনি তাঁহার সহৃদয় বন্ধুবর্গকে সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করেন। যখন সম্মিলিত ভাবে সৌন্দর্য্য উপভোগ করা হয়, তখন সৌন্দর্য্য উপভোগের সম্যক চরিতার্থতা সম্পাদিত হয়। তাই শ্রীরাধা তাঁহার প্রিয়তমের অপরূপরূপ দেখিয়া তাঁহার সখীবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলেন —'সখিগণ! তোরা সকলে এসে দেখ—সুন্দরের কী অপরিসীম ভুবন ভুলান রূপ!" ইহা আত্মতৃপ্তিতে পর্য্যবসিত হয় না, ইহা বিশ্বতৃপ্তির উদ্দেশ্যে। ইহা সার্বজনীন।

ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন—'সত্যই সুন্দর এবং সুন্দরই সত্য। (Truth is Beauty and Beauty is Truth.) আমাদের শাস্ত্র বলিয়াছেন—'সত্যং শিবং

সুন্দরম্।' যিনি সত্য, তিনি মঙ্গল এবং তিনিই সুন্দর। সুন্দরী রাধিকা স্বীয় সৌন্দর্য্যের দ্বারা চিরসুন্দরের পূজা করেন।

শ্রীকৃষ্ণের উপরের কথা হইতে মনে হয় যে শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য বুঝি তাঁহা হইতে কম হইবে, কারণ শ্রীরাধা তাঁহার মাধুর্য্য যে ভাবে আস্বাদন করেন, তিনি সে প্রকার পারেন না। লৌকিক জগতের দৃষ্টান্ত হইতে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র অনুমান করিয়া বলিয়াছিলেন, যে পুরুষ সৌন্দর্য্যে এবং কৃতিত্বে নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যদিও আজকাল নারী সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে, তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে সিংহ সিংহী অপেক্ষা অধিক সুন্দর। সিংহের কেশর আছে, সিংহীর নাই। ময়ূর ময়ূরী অপেক্ষা অধিক সুন্দর। ময়ূর তাহার বিচিত্র রংএ রঞ্জিত পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া নৃত্য করে এবং মধুর কেকারবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করে। ময়ূরীর পুচ্ছ নাই এবং তাহার স্বর মধুর নয়। কোকিল পঞ্চমতানে গান গাহিয়া প্রাণ মাতাইয়া তুলে। কোকিলা তাহা পারে না, নীরব হইয়া কোকিলের গান শুনে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে তিনি অনুমান করিলেন যে বিধাতা তাহা হইলে মনুষ্য জাতির সম্বন্ধে যে এই নীতির ব্যতিক্রম করিয়াছেন, তাহা বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, আমাদের শাস্ত্রে নারীর সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যের প্রাধান্য কীর্ত্তিত আছে। যদিও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সৌন্দর্য্য অধিক বলিয়াছেন, আবার অন্যস্থলে নিজ মুখে শ্রীরাধার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার 'কুঞ্জ বিহারী' নামক অষ্টকের সপ্তমস্তবকে শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত রূপে বর্ণন করিয়াছেন,—

"তব চিকুর কদম্বং স্তৌতে প্রেক্ষ্যকেকী,
নয়ন কমল লক্ষ্মী বন্দতে কৃষ্ণ সারঃ
অলিরলমলকান্তং নৌতি পশ্যেতি রাধাম্
সুমধুর মনুশংসন্ ভাতি কুঞ্জে বিহারী॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন; রাধে দেখ দেখ, তোমার বিবিধ কুসুমাকীর্ণ কেশ পাশ সন্দর্শন করিয়া ময়ূরগণ স্তব্ধ হইতেছে। কৃষ্ণসার নামক মৃগগণ তোমার নয়ন কমল শোভার প্রশংসা করিতেছে। ভ্রমরগণ তোমার অলকাবলীর স্তব করিতেছে। শ্রীরাধিকাকে যিনি এই প্রকার প্রশংসার বাণী বলিয়া থাকেন, সেই কৃষ্ণ কুঞ্জে বিরাজ করিতেছেন।

প্রেমের বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণের মনে শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য এক এক সময় এক এক প্রকার বলিয়া অনুভূত হয়। সকল নায়িকাগত মাধুর্য্যাদি গুণ শ্রীরাধার

পাদপদ্ম নির্মঞ্ছন করিতেছে। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যে সৌন্দর্য্য প্রার্থনা করেন তাহা তাঁহার পাদ পদ্মের নখ প্রান্তে বিরাজিত।

"সর্ব মাধুর্য্য বিঞ্ছোলি নির্মঞ্ছিত পদাম্বুজে !
ইন্দিরা মৃগ্য সৌন্দর্য্য স্ফুরদঙ্ঘ্রি নখাঞ্চলে ॥"

(শ্রীরূপগোস্বামি পাদকৃত 'চাটু পুষ্পাঞ্জলি' নামক স্তোত্র। ১৪নং শ্লোক)

শ্রীরাধার রূপ মাধুরী যে কত কবিগণের দ্বারা কতভাবে গীত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

রসানুভূতির দিক দিয়া কিম্বা রসাস্বাদনের দিক দিয়া, হলাদিনীশক্তিরমূর্ত্তিমতী দেবী এবং মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা সুখের যে আধিক্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয়। বিষয়রূপে বিষযজাতীয় সুখ অনুভব করেন বটে কিন্তু শ্রীরাধার আশ্রয় জাতীয় সুখের পরিমাণ যে কতদূর তাহা অনুভব করিতে পারেন না। সে কারণ তিনি আশ্রয় প্রেমের নিকট নতি স্বীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সর্বচিত্তহর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অন্যত্র প্রতিফলিত দেখিযা লোভবশতঃ তাহা আস্বাদন করিতে চান বটে, কিন্তু স্বমাধুর্য্য তিনি সম্যগ্ আস্বাদন করিতে পারেন না। বৃক্ষ তাহার ছায়ার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইযা থাকে কিন্তু সে স্বমাধুর্য্যের আস্বাদন করিতে পারে না। **The tree gazes in love at the beautiful shadow, who is his own and yet whom he never can grasp.**

"সুন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে।
সে তার আপন তবু পায় না তাহাকে ॥"

—কবিগুরু

সে কারণ কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্রেমের মাধুর্য্যাস্বাদন করিবার লোভে রাধার ভাবকান্তি পরিগ্রহ করিয়া গৌররূপে আবির্ভাব। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি স্বমাধুর্য্য সম্যক আস্বাদন করিতে পারেন নাই।

স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকা

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ধীর ললিত নাগর এবং শ্রীমতীরাধিকা স্বাধীনভর্তৃকা। রাধিকা কৃষ্ণকে বেশ রচনা করিতে বলেন। পুষ্পের দ্বারা মনোহর সাজে সজ্জিত করিতে বলেন। কুঙ্কুম অবলেপন করিতে আদেশ দেন এবং কখন কখন বক্ষে কেলি মকরাদি অঙ্কিত করিতে বলেন। যিনি সর্বগ, অনন্ত, বিভু, বিলাসের এমনি দুর্দমনীয় লালসা যে তাঁহার ভগবত্তাকে আচ্ছাদিত করিয়া, নিবিড়তম মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া দিয়া,

প্রেয়সীর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করে। তাই রাত্রিদিন রাধাসঙ্গ লোভে নিভৃত নিকুঞ্জে অবস্থান করিতে ভালবাসেন এবং মুহুর্মুহু কেলি বাসনায় উন্মাদমত্তা চলিতে থাকে। সে কারণ কখন জলকেলি, কখন লুকোচুরি, কখন নৌকা বিলাস, কখন দ্যূতক্রীড়া এবং কখন সখীদিগের রচিত বিবিধ কুঞ্জে স্বচ্ছন্দে বিহার করিবার জন্য লালায়িত হন।

ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা

প্রত্যেকটী ক্রীড়া কোন একটি পণ রাখিয়া আরম্ভ হয় এবং লক্ষ্য করিবার বিষয় যে প্রায় সকল ক্রীড়াতেই কৃষ্ণচন্দ্রের হার হয় এবং তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপিনী শ্রীরাধিকারই জয়গান হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের কুরঙ্গ পণ রাখিয়া অক্ষ ক্রীড়া আরম্ভ হইল এবং ক্রীড়ান্তে রাধারাণী জয়লাভ করিলে, তাঁহার সহচরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সখাদিগের নিকট হইতে কুরঙ্গ কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে তুমুল বাদানুবাদরূপ আনন্দ কোলাহলের সৃষ্টি হইল।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ যাহা সকলকে বিমোহিত করে, যে বংশীনাদে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট এবং ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়ে এবং যাহা ধর্মবিপর্যয়কারী, সেই বংশীর সহিত শ্রীরাধার বীণার প্রতিযোগিতা হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রীরাধার বীণাবাদন অপূর্ব ঝঙ্কারে, গমকে, মূর্চ্ছনায় এবং নব নব রাগে এতই উৎকর্ষ লাভ করিল যে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীর স্বরভঙ্গ হইল। এক্ষেত্রেও শ্রীরাধার জয়গানে দিগ্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রীরূপ তাঁহার 'উৎকলিকা বল্লরী' নামক স্তোত্রে লিখিয়াছেন ;—

"স্তম্ভং প্রপঞ্চয়তি যঃ শিখি পিঞ্ছমৌলি
বেণোরপি প্রবলয়ন্ স্বরভঙ্গমুচ্চৈঃ।
নাদঃ কদাক্ষণমবাপ্স্যতি তে মহত্যা
বৃন্দাবনেশ্বরি স মে শ্রবণাতিথিত্বম্॥ ২৮

হে বৃন্দাবনেশ্বরি শ্রীরাধিকে! শ্রীকৃষ্ণের বংশীর স্বরভঙ্গকারী ও স্তম্ভসম্পাদনকারী তদীয় বীণাধ্বনি কবে আমার শ্রবণপথের অতিথি হইবে অর্থাৎ আমার শ্রবণ গোচর হইবে।

তিনি সব বিষয়ে অজিত বলিয়াই তাঁহার প্রেমের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া এবং সেই পরাজয়ের মধ্য হইতে অপূর্ব আনন্দ ভোগ করিতে পারেন। অপরের পক্ষে পরাজয় কেবল হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ এবং বিষাদের সৃষ্টি করে। তিনি বিজয়ী হইয়া জয় হেতু যে আনন্দ তাহা সবত্র ভোগ করিতে পারেন, কিন্তু পরাজয়ের মধ্যে যে

আনন্দ তাহা কেবল ব্রজের সমর্থা রতির সংস্পর্শে আসিয়া ভোগ করেন। তিনি সখাদের সঙ্গে খেলায় হারিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে স্কন্ধে বহন করেন। বাৎসল্য রতির আধার মা যশোমতীর হস্তে ধৃত হইয়া বন্ধন স্বীকার করেন, এবং মধুরা রতির নিকট কতভাবে যে পরাজিত হন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অক্ষক্রীড়া, লুকোচুরি খেলা, সঙ্গীতপ্রতিযোগিতা প্রভৃতি প্রত্যেকটি ক্রীড়ায় তিনি পরাজিত হন। যদিও শৃঙ্গাররসপ্রকরণে মধুরা রতিকেই সমর্থা রতি বলা হয়, তথাপি ব্রজের কোন রতির সামর্থ্য কম নহে। সে কারণ ব্রজের রতি চতুষ্টয়কে ব্যাপক অর্থে সমর্থারতি পদ বাচ্য বলিয়া গণ্য করিলেও, মনে হয় কোন দোষ হয় না। দাস্য রতি স্বর্ণ তন্তুর ন্যায় সর্ব রতিতে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে অপরাপর রতির উৎকর্ষ, সেখানে দাস্যেরও উৎকর্ষ। দাস্যের ধর্ম সেবা- অকৃত্রিম সেবা, সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবা। সে কারণ মধুরে দাস্যের চরম কাষ্ঠা থাকায় মধুরারতির সর্বোৎকর্ষ। দাস্যকে বিচ্ছিন্ন-রূপে শুধু গৌরব বুদ্ধিময় সেবা বলিয়া সীমিত করিয়া রাখিলে তত্ত্বের যথাযথ নির্ণয় হয় না। দাস্যকে বাদ দিলে কোন রতির উৎকর্ষ হয় না। যেখানে দাস্যের উৎকর্ষ, সেখানে রতির উৎকর্ষ। যেখানে দাস্যের উৎকর্ষ নাই, সেখানে রতির উৎকর্ষ নাই। শ্রীরাধার মধুরা রতির দ্বারা তিনি সর্বপ্রকারে বশীভূত হন বলিয়া শ্রীরাধার রতি, সর্বোচ্চা মধুরা রতি, এবং সমর্থা রতি বলিয়া অভিহিত।

অপর পক্ষে যদি শ্রীকৃষ্ণের পরমাদৃত ভোগ্য বস্তু পণ রাখিয়া ক্রীড়া আরম্ভ হয় তখন কৃষ্ণচন্দ্রেরই জয় হয় এবং রাধারাণীর হার হইয়া যায়। কারণ যুগলের মিলনই কাম্য এবং তাঁহাদের পারস্পরিক রসাস্বাদন ভক্তবৃন্দের আনন্দবিধায়ক। অধরসুধা পণ রাখিয়া জলক্রীড়া আরম্ভ হইল এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ জয়ী হইয়া অধর সুধা পান করিবার জন্য, উৎফুল্লচিত্তে শ্রীরাধার কণ্ঠদেশ ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎকালোচিত শ্রীরাধার বহু প্রকার ভাব সম্মেলনে তাঁহার মুখারবিন্দ যে প্রকার মনোজ্ঞ হইয়াছিল, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত ভক্তগণ লালায়িত হন। শ্রীরূপ শ্রীরাধার একাধারে সস্মিত, রুদিত এবং বিবিধ ভাবোচ্ছ্বাসে উল্লসিত মনোহর মুখকমল দর্শন করিবার নিমিত্ত নিম্নোক্ত শ্লোক বর্ণন করিয়াছেন ;—

"ব্যাত্যুক্ষী রভসোৎসবেঽধর সুধা পান গ্রহে প্রস্তুতে
জিত্বা পাতু মথোৎসুকেন হরিণাকণ্ঠে ধৃতায়াঃ পুরঃ
ঈষৎ শোণিমমীলিতাক্ষ মনৃজুভ্রূবাল্লহেলোন্নতম্
প্রেক্ষিষ্যে তব সস্মিতং স রুদিতং তদ্দেবি বক্ত্রং কদা।

(উৎকলিকাবল্লরী ৪৪নং শ্লোক)

হে দেবি শ্রীরাধিকে! অধর সুধা পণ রাখিয়া তোমাদের জলক্রীড়া আরম্ভ হইলে ঐ ক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত মনে, অধর সুধা পান করিবার নিমিত্ত, সখীবৃন্দের সম্মুখে তোমার কণ্ঠদেশ ধারণ করিবেন, তখন বাহ্য কোপ প্রকাশ হেতু আরক্ত নয়ন এবং কুটিল ভ্রূলতার উৎক্ষেপ এবং ইষ্ট বস্তুতে অনাদর হেতু উন্নত হাস্য ও রোদন মিশ্রিত তোমার মুখপদ্ম আমি কবে দর্শন করিব।

এই শ্লোকে কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত এবং বিব্বোক নামক তিনটি সঞ্চারী ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

কিলকিঞ্চিত—নায়ক নায়িকার সঙ্গমকালে অতিশয় আনন্দ হেতু নায়িকার গর্ব, হাস্য এবং অভিলাষাদি যদি ভয়, কোপ প্রভৃতির দ্বারা বিমিশ্রিত হয়, তাহা হইলে এই ভাবকে কিলকিঞ্চিত বলে। এই ভাবে হর্ষ হেতু গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় এবং ক্রোধের এককালীন সপ্ত ভাবের সংমিশ্রন হয়।

কুট্টমিত—স্তনস্পর্শ এবং চুম্বনাদির দ্বারা যদি নায়িকার বাহিরে কোপ এবং অন্তরে আনন্দ প্রকাশ পায় তাহাহইলে সেই ভাবকে কুট্টমিত বলা হয়।

বিব্বোক—গর্ব হেতু ইষ্ট বস্তুতে বাহিরে অনাদর প্রকাশকে বিব্বোক বলে।

মান

সংযোগের মধ্যে যেমন শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্য, মানের দিক হইতেও সেই প্রকার বৈশিষ্ট্য। এই প্রকার দুর্দণ্ড মান কোন নায়িকার মধ্যে নাই। মান প্রেমসমুদ্রের একটি বিচিত্র তরঙ্গ। মানের সম্বন্ধে অন্যস্থলেও কিছু বলা হইয়াছে। পণ্ডিতেরা মানকে প্রেমের ক্রমানুসারে যে কক্ষায় রাখুন না কেন, একমাত্র মহাভাববতী রাধিকাতেই তাহার সার্থকতা। প্রগাঢ় প্রণয়ের উপর মান প্রতিষ্ঠিত। নতুবা মানের কোন অর্থ হয় না। কোথাও মানের জন্য কৃষ্ণ কর্তৃক মহিষীগণকে র্ভৎসনা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মহিষীদিগের মানের অন্তর্ধান, কিন্তু এস্থলে নায়িকার মান ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত সখীমঞ্জরীদিগের নিকট কত কাকুতি মিনতি, কত অনুরোধ, উপরোধ এবং কত আনুগত্য স্বীকার। কখন মালিনী বেশ ধরিয়া রাধিকার নিকট আগমন এবং তাঁহার করুণাদৃষ্টি প্রার্থনা এবং পরিশেষে 'দেহিপদপল্লবমুদারম্' বলিয়া রাতুল চরণে আত্মনিবেদন।

শ্রীরাধার মান অহেতুক এবং সহেতুক দুই হইতে পারে। ইহা প্রণয় ভঙ্গজনিত নহে। কখন যে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইবে তাহা নির্ধারণ করা দুষ্কর। সম্ভোগের মধ্যেও মান আবির্ভূত হইয়া মিলনানন্দকে স্তিমিত করে এবং মানময়ী স্বয়ং কান্তকে কটূক্তি দ্বারা কুঞ্জ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া পরিশেষে তাঁহার

নিমিত্ত বিলাপ করিতে থাকেন। তখন তিনি কলহান্তরিতা নায়িকা। কখন প্রিয়াসখী ললিতার অনুরোধেও মানবতী হইযা থাকেন। অন্তরে থাকে মিলনের তীব্রোৎকণ্ঠা এবং বাহ্যতঃ মান প্রদর্শন। একদিকে থাকে বাহ্য রোষ এবং ঔদাসীন্য এবং অন্তরে থাকে গভীর প্রণয়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রণয় এবং মানকে কঞ্চুলিকার সহিত তুলনা করিয়াছেন।

"কৃষ্ণ অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন।

প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন।" (২।৮।১৩০)

শ্রীরাধার পরিহিত বসন নীল বর্ণ শাড়ী। অপরটি রক্তবর্ণ ওড়না। অনুরাগকে রক্তবর্ণ ওড়নার সহিত তুলনা করিযাছেন। উজ্জ্বলের স্থায়িভাব প্রকরণে অনুরাগের সংজ্ঞা—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নব নবং প্রিয়ম্।

রাগোদ্ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ ১৪৬

রাগের পরবর্তী স্তর অনুরাগ। যে রাগ নূতন নূতন হইয়া প্রিয় ব্যক্তির রূপাদি সর্বদা অনুভূত হইলেও নিত্য নূতন নূতন রূপে প্রতীযমান করায, সেই রাগকে অনুরাগ বলে। কৃষ্ণের রূপ গুণাদি যাহাতে শ্রীরাধার নিকট নিত্য নূতন ভাবে অনুভূত হয, সেই কারণ তাঁহার পরিহিত রক্তবর্ণ ওড়না কৃষ্ণানুরাগের প্রতীক স্বরূপ। প্রণয় এবং মানরূপ কঞ্চুলিকার দ্বারা তাহার বক্ষস্থল আবৃত। কঞ্চুলিকা যেমন কুচদ্বয়কে আচ্ছাদিত করিযা রাখে মাত্র, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব গোপন করিতে পারে না, সেই প্রকার শ্রীরাধার মান বহিঃ কৌটিল্য বশতঃ হৃদ্গতভাবকে গোপন করিতে চেষ্টা করে বটে কিন্তু প্রণয বশতঃ তাহার অস্তিত্ব গোপন করিতে পারে না। এই ভাব মানের দ্বারা আবৃত থাকিযা আরও মধুর রূপে শোভা পায।

শ্রীরাধার মানের আরও বৈশিষ্ট্য যে হৃদযে মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার দূতিগণকে সতর্ক করিয়া দেন যে তাঁহারা যেন মানের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিযা মিলনের চেষ্টা না করেন। যদিও মিলনই তাঁহার একমাত্র কাম্য, তথাপি তিনি মানকে ক্ষুন্ন করিতে চান না।

নিরুপাধি প্রেম

শ্রীরাধার প্রেম নিরুপাধি। কোন কিছু উপলক্ষ্য করিযা তাঁহার প্রেমের উদয় হয় না। ইহা সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক। তাঁহার প্রেমে মিলন ঘটাইবার জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। মিলনের একমাত্র প্রবর্তক অত্যুগ্র উৎকণ্ঠা,

গভীরতম লালসা এবং অনুরাগ। এ প্রেম নিত্য সিদ্ধ এবং স্বয়ংসিদ্ধ। অনাদিকাল হইতে তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান।

"না খোঁজলু দূতি, না খোঁজলু আন।
দুহুঁ কেবি মিলনে মধ্যত পঞ্চবান॥"

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'স্বয়মুৎপ্রেক্ষিত লীলা' নামক একটি কবিতার মধ্যে শ্রীরাধিকার স্বয়ং অভিসারের বর্ণন করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;—

শ্যামলসুন্দর সৌহৃদ বদ্ধা
কামিত তৎপদ সঙ্গতি বদ্ধা।
ধৈর্য্যমসৌ স্মরবর্দ্ধিত বাধা,
প্রাপণ মন্দির কর্ম্মণি বাধা॥ ১

তংকমলোচ্চয়মীক্ষিতু কামা
স্বাচ্ছলতঃ স্বয়মুজ্‌ঝিত ধামা।
যামুন রোধসি চারু চরন্তী,
দূরমাবন্দত সুন্দর দন্তী॥ ২

প্রাপ্যোদারাং পরিমলধারাং
কংসারাতে সদয়তি বাতে।
সেয়ং মত্তা দিশি দিশি যত্তা
দৃষ্টিং কত্রা মকিরদনম্রা॥ ৩

ভৃঙ্গীরেষং তমপরিমেয়ং
মুগ্ধাগন্ধং হৃদিকৃতবন্ধং।
ব্যাগপ্রায়া পুলকিত কায়া
প্রেমোদ্ভ্রান্তা দ্রুত মভিযাতা॥ ৪

*   *   *   *

যাঁহার প্রেম চিরকাল তরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আবদ্ধ, সেই কৃষ্ণপদাভিসারিনী শ্রীমতীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম আস্বাদন করিবার নিমিত্ত অনঙ্গ বেদনায় অধীরা হইলেন। তখন তিনি নিজ গৃহকর্ম দ্বারা মনকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। ১॥ অনন্তর সেই কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া সূর্য পূজার নিমিত্ত পুষ্প চয়নচ্ছলে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আপনা আপনি আসিয়া যমুনা তীরে গমন করিলেন।২। তথায় মলয়ানিল শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সৌরভ বহন করিয়া তাঁহাকে মত্ত এবং সচকিত করিল এবং তিনি সোৎকণ্ঠে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।৩। শ্রীরাধা মধুমত্ত ভ্রমরীর ন্যায় সেই অপরিমেয় কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধে মুগ্ধা, উদ্‌ভ্রান্তা এবং পুলকিত-চিত্তা হইয়া, সেই গন্ধানুসারে অবিলম্বে সেই দিকে ধাবিতা হইলেন। ৪

এস্থলে বংশীধ্বনি নাই, কোন প্রকার উদ্দীপন বিভাব নাই, দৌত্য নাই। শ্রীরাধা স্বয়ং উদ্বুদ্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণাভিসারে গমন করিলেন। এই কবিতাটি "না খোজলু দূতি, না খোজলু আন ইত্যাদি গীতের অর্থ বোধক। 'স্বয়মুৎপ্রেক্ষিত' অর্থে যে লীলা নিজের দ্বারা নিষ্পাদিত হয় এবং কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয়না, সেই লীলাকে বুঝায়। অতএব তাঁহাদের প্রেম আরোপ সিদ্ধ নহে, ইহা স্বয়ং সিদ্ধ। তবে অপরকে

মিলনানন্দ দান করিবার নিমিত্ত এবং মিলনের দুর্লভতা প্রকাশ করিবার জন্য সখী, মঞ্জরী গণের দৌত্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

এ প্রেমে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। এ প্রেমে সম্বন্ধানুগা সেবা নাই। আছে কেবল অনাবিল এবং অফুরন্ত অশেষ বিশেষ গণ্ডীহারা সেবা। মুক্ত প্রগাঢ়বৃত্তি অনুসারে এ সেবার কোন বাঁধন নাই। কৃষ্ণকে আত্যন্তিক সুখ দিবার প্রগাঢ় বাসনা ভিন্ন অপর কোন বাসনা নাই। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি রতির মধ্যে সম্বন্ধানুগা সেবা আছে। সেখানকার সেবা নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। দ্বারকা লী .র মধুরা রতিতে পতিপত্নীর অভিমান বশতঃ সম্বন্ধানুগা সেবা আছে, স কারণে সম্বন্ধের সীমারেখাকে কোন স্থলে তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। কিন্তু ব্রজধামের মধুর রতি কামানুগা হওয়ায় তাহাতে কোন প্রকার বন্ধন নাই, একেবারে সীমাহারা মুক্ত-প্রগাঢ়। এ প্রেম অসীম এবং ভূমা। সে কারণ ইহা অসংগত।

রাসলীলা

রাসলীলার মধ্যে সম্ভোগের যতকিছু বৈচিত্র্য আছে, তৎসমুদয় জ ড ন মান রূপে যুগপৎ প্রকাশিত হয়। রাস সমগ্র রসের সমাহার—র কদম্বময়। এক এক গোপীর পার্শ্বে মহাযোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং মধ্যস্থলে রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ। রাসের মধ্যে অনন্ত ঐশ্বর্য নিহিত থাকিলেও ঐশ্বর্য্যের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। মাধুর্য আস্বাদনই রসের বৈশিষ্ট্য। রাধা গোবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া বর্তুলাকারে সকলেই নর্ত্তন করিতেছেন। প্রত্যেক গোপীই মনে করিতেছেন যে তাহার কাছে কেবল কৃষ্ণ আছেন। কৃষ্ণ যে সর্বত্র সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই, লক্ষ্য কেবল কৃষ্ণেরদিকে। রাসলীলা অপূর্ব ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য সম্পুটিত কিন্তু ঐশ্বর্য মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগুপ্ত।

আলিঙ্গন, চুম্বন, সংপ্রযোগাদি সম্ভোগের যত কিছু উপকরণ আছে, তৎসমস্ত লইয়া রাসলীলা গঠিত। বিদ্যুল্লতা এবং নীলইন্দিবরবিড়ম্বিত কান্তি সহযোগে বৃন্দাবন উদ্ভাসিত। বংশীধ্বনি, বীণাধ্বনি, মুরজধ্বনি, কিঙ্কিনী নূপুর এবং বলয়ের মধুর ঝঙ্কারে বৃন্দাবন মুখরিত। সমগ্র নাদ লক্ষ্মী বৃন্দাবনে অপূর্ব আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। আকাশে, বাতাসে প্রেমের হিল্লোল বহিতেছে। ময়ূর ময়ূরী আনন্দে নৃত্য করিতেছে। পক্ষিগণ বিপুল হর্ষভরে অস্ফুট ধ্বনি করিতেছে। অলিকুল মধুর গুঞ্জন করিতেছে। পিককুল পঞ্চম তানে গান করিয়া রাসলীলার আনুগত্য বিধান করিতেছে। বৃক্ষ সকল পুষ্প

ফলে সুশোভিত হইয়া রাসলীলার শোভা বর্ধন করিতেছে। মল্লিকা কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল সৌগন্ধে আমোদিত করিতেছে। যমুনার জল রাসলীলার আনন্দে এবং পূর্ণ চন্দ্রের কিরণ সম্পাতে স্ফীত হইয়া নৃত্য করিতেছে, প্রেমের স্পন্দন সর্বত্র সংক্রামিত হইয়াছে। সর্বত্র পুলক জাগিয়া উঠিয়াছে। দেবতাগণ দুন্দুভি বাদ্য সহকারে রাসলীলার জয় ঘোষনা করিতেছে। যাঁহারা বিশেষ সৌভাগ্য শালিনী, তাঁহারাই কেবল রাসলীলার প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

রাধিকার উৎকর্ষ

কিন্তু এ রাসলীলা কাহার ইঙ্গিত করিতেছে? কাহার প্রভাবে এ রাস-লীলার মাধুর্য্য? কোন্ নায়িকা রাসলীলার উৎস? রাসলীলা কাহার বিজয় ঘোষনা করিতেছে? ইহার অনুসন্ধানে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাসলীলা শত শত গোপীদ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও একই নায়িকার জয় ঘোষনা করিতেছে এবং সেই নায়িকা বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীমতীরাধিকা।

বাসন্ত মহারাস।

বাসন্ত মহারাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে বামা বশতঃ যখন শ্রীরাধা রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন, তখন রাসস্থলীর আনন্দ স্তিমিত এবং নিষ্প্রভ হইয়া গেল। রসের স্পন্দন থামিয়া গেল। শতকোটি গোপী থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণের কাম নির্বাপিত হইল না। ধীরললিতনাগর কৃষ্ণ তখন স্বাধীন ভর্তৃকা শ্রীরাধার অন্বেষনে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইহাই শ্রীরাধার সর্বাতিশায়ী প্রেমের মহিমা। কবি জয়দেবকৃত গীত গোবিন্দের তৃতীয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে।

> কংসারিরপি সংসার বাসনা বদ্ধ শৃঙ্খলাম্।
> রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ১
> ইতস্তত স্তামনুসৃত্য রাধিকা-মনঙ্গ-বাণ ব্রণখিন্ন মানসঃ।
> কৃতানু তাপঃ স কলিন্দ নন্দিনী তটান্ত কুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ২

এই কবিতার দ্বারা রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে। এস্থলে শ্রীরাধার জন্য কৃষ্ণের অন্যাপেক্ষা ত্যাগ এবং সে কারণ প্রেমের গাঢ়তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি রাধাকে ধ্যান করিতে করিতে অপরাপর ব্রজসুন্দরীদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। অনঙ্গ-বাণে খিন্ন হইয়া মাধব অতিশয় অনুতাপ সহকারে শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করিতে করিতে যমুনা তটবর্ত্তী কুঞ্জে বিষাদে মগ্ন হইলেন।

চৈতন্য চরিতামৃতকার কবি জয়দেবের উক্ত শ্লোকের বঙ্গভাষায় পয়ার ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন।

যথা—

"শতকোটি গোপী সঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা পাশ॥
সাধারণ প্রেমে দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামত॥
ক্রোধ করি রাসছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ইঁহা ব্যাকুল হইল হরি॥
সম্যক বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রম কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হইয়া॥
শত কোটী গোপীতে নহে কাম নির্বাপন।
ইহা হইতে অনুমানি শ্রীরাধার গুণ॥

শ্রীচৈতন্য দেব রাধাপ্রেম যে সাধ্য শিরোমণি, তাহা রায় রামানন্দকে বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"চরি করি রাধাকে লইল গোপিগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হইলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধালাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে মানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥

তদুত্তরে রায় রামানন্দ বলিলেন,

রায় কহে তবে শুন প্রেমের মহিমা।
এজগতে রাধা প্রেমের নাহিক উপমা॥
গোপীগণের রাস নৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরেন বিলাপ করিয়া॥

শ্রীরাধা প্রেমের গাঢ়তা প্রমাণ করিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণের অন্যাপেক্ষা ত্যাগের কথা আপনা হইতে উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার বিশেষ উল্লেখ নাই।

শ্রীরাধিকাকে সঙ্গে লইয়া তিনি যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত থাকিলেও সকল গোপীগণের সাক্ষাতে তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ নাই। তবে শ্রীরাধার যূথগণের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণের মধ্য দিয়া তাহা ধরা পড়িয়া যায়। তাঁহারা বিশেষ ভাবে জানিতেন যে কৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তমা রাধাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাহা গোপিগণের অলক্ষিতে। সে কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, গোপিগণের ভয়ে তিনি রাধাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে অন্যাপেক্ষা ত্যাগ না থাকায় প্রেমের গাঢ়তা স্ফুরিত হয় না। মনে হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু জয়দেব কৃত গীত গোবিন্দে বর্ণিত বাসন্ত মহারাসের কথা শ্রবণ করিতে উৎসুক হইলেন এবং শ্রীরায়ের মুখ দিয়া তাহা বাহির করিয়া লইলেন। 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থকে তিনি কি ভাবে সম্মান করিতেন, তাহাও 'চৈতন্য চরিতামৃতে' নিম্নোক্ত কবিতায় বর্ণিত আছে;

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কৃষ্ণ কর্ণামৃত আর শ্রীগীতগোবিন্দ।
রায় রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
নাচে গায় পরম আনন্দ ॥

জয়দেব কৃত বাসন্ত মহারাসে রাধার প্রেম মহিমা উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শারদীয় মহারাসের সহিত বাসন্ত মহারাসের প্রভেদ আছে। শারদীয় মহারাসে গোপীগণের গর্বানিরসন এবং মান প্রসাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন, অবশ্য সকলকার অলক্ষিতে রাধাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। গোপিগণ বিরহবিধুরা হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় বৃন্দারণ্যে প্রগাঢ় আর্তিভরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছিলেন। পাতি তরু, লতা গুল্ম প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণের বার্তা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। অপরদিকে বাসন্ত মহারাসে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সার্বজনীন প্রণয় ব্যবহারে রুষ্টা হইয়া মানভরে রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপী পরিত্যাগ করিয়া, অনঙ্গবাণে খিন্ন হইয়া, অনুতাপানলে দগ্ধ হইলেন এবং শ্রীরাধাকে বনে বনে খুঁজিতে লাগিলেন। ইহা সম্পূর্ণ পাল্টাপাল্টি ভাব। এস্থলে শ্রীরাধার প্রাধান্য প্রদর্শন করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বাসন্ত রাসের বর্ণনা নাই। শ্রীরূপ তাঁহার বিদগ্ধ মাধব নাটকে বাসন্ত মহারাসের বর্ণনা দিয়াছেন। [illegible]মীয় তন্ত্রে বাসন্ত মহারাসের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ সকল কান্তাগণের প্রেম পরীক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন যে রাধাপ্রেমের তুলনা নাই, তখন তিনি দন্তবক্র বধের পর দ্বারকা হইতে মথুরা দিয়া ব্রজে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং বাসন্ত মহারাসের অনুষ্ঠান করিয়া-

ছিলেন। যাহাহউক বাসন্ত মহারাসে রাধাপ্রেমের গাঢ়তা গীতগোবিন্দে যেভাবে পরিস্ফূট হইয়াছে অন্যত্র তাহা হয় নাই।

যদুনন্দন ঠাকুর মহাশয় কৃষ্ণ কর্ণামৃতের 'সারঙ্গ রঙ্গদা' টীকা অবলম্বনে নিম্নোক্ত কবিতার দ্বারা রাসলীলার জয় ঘোষণা করিয়াছেন।

"জয় জয় রাসলীলা জয় রাসলীলা।
অহর্নিশি এই লীলা যেহ প্রকাশিলা॥
কৃষ্ণ বিদগ্ধতা ভেরী সঘন বাজয়।
রাধার সৌভাগ্য ময় দুন্দুভি ঘোষয়॥"

("হরে বিদগ্ধতা ভের্য্যা রাধা সৌভাগ্য দুন্দুভিঃ।")

এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কৃষ্ণ বহু বল্লভ হইলেও এক বল্লভ অর্থাৎ রাধাবল্লভ। ব্রজলীলার নায়ক যেমন এক, নায়িকাও তেমনি একটী। কিন্তু রসের পুষ্টি বিধান করিবার নিমিত্ত বহু নায়িকার প্রয়োজন। অপরাপর গোপিগণ মধুর রসের পুষ্টি বিধায়ক এবং নিজেরাও সেই রসের আস্বাদক। এ প্রেম একনায়ক এবং এক ললনা নিষ্ঠ।

রাধা প্রেমের মহিমা জানিতে হইলে অনুসন্ধান করিতে হইবে, যে এই প্রেমা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে। চৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণের কথায় লিখিয়াছেন,

"পূর্ণ নন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেমগুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥" (১।৪।১০৬-১০৮)

গোবিন্দ লীলামৃতে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। ইহা বৃন্দাদেবীর সহিত শ্রীরাধার কথোপকথন।

কস্মাদ্ বৃন্দে প্রিয় সখি? হরেঃ পাদমূলাৎ, কুতোঽসৌ?
কুণ্ডারণ্যে, কিমিহ কুরুতে? নৃত্য শিক্ষাং, গুরুঃ কঃ?
তং ত্বন্মূর্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ॥" (অষ্টম সর্গ ৭৭)

একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে শ্রীরাধারাণীর সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে, শ্রীকৃষ্ণ

রাধাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী বনে উপস্থিত হইলেন। রাধা প্রেমে তিনি এতই বিহ্বল যে যেদিকে তিনি তাকান সেই দিকেই তাঁহার রাধাস্ফূর্ত্তি হয়। প্রতি বৃক্ষে, প্রতি লতায় যেন তিনি শ্রীরাধিকাকে দর্শন করেন। মন্দ-মন্দ বায়ু সঞ্চালনে তরুলতার অগ্রভাগ ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে দেখিয়া রাধা প্রেমে বিহ্বল শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন, বুঝি শ্রীরাধাই নৃত্য করিতেছে। অতএব তিনি সেই নৃত্যের অনুকরণ করিয়া, যেমন নৃত্যগুরুর নৃত্যের অনুকরণে নৃত্য শিক্ষার্থী নট নৃত্য করে, তদ্রূপভাবে তিনিও নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত যখন আসিতে লাগিলেন, তখন দূর হইতে তাঁহার অঙ্গ গন্ধ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আগমন বার্তা জানিতে পারিলেন। গভীর উৎকণ্ঠা বশতঃ, তাঁহাকে শীঘ্র আনিবার নিমিত্ত তিনি বৃন্দাদেবীকে পাঠাইয়া দিলেন। বৃন্দাদেবীকে দেখিয়া শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয় সখি বৃন্দে। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? বৃন্দা কহিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রান্ত হইতে।'

শ্রীরাধা— তিনি কোথায়?

বৃন্দা—তিনি রাধাকুণ্ডের সন্নিকটস্থ বনে।

শ্রীরাধা তিনি কি করিতেছেন?

বৃন্দা—তিনি নৃত্যশিক্ষা করিতেছেন।

শ্রীরাধা—তাঁহার নৃত্য শিক্ষার গুরু কে?

বৃন্দা—দিগ্বিদিকে প্রতি তরুলতায় স্ফূর্তি প্রাপ্তা তোমার মোহিনী মূর্ত্তিই প্রধানা নর্ত্তকীর ন্যায় স্বপশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণকে নাচাইয়া চারিদিকে ভ্রমণ করাইতেছে। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে যেদিকে তাকান, সেই দিকেই তিনি মনে করেন যে তোমার মূর্ত্তি নাচিতেছে এবং তদনুকরণে তিনিও নৃত্য করিতেছেন।

যে ভগবান বহিরঙ্গামায়াপাশে আবদ্ধকরিয়া বিশ্বচরাচর সকলকেই নাচাইতেছেন, "ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়যা, এবং অন্তরঙ্গা যোগমায়া প্রভাবে তাঁহার ভক্তগণকে প্রেমে বিহ্বল করাইয়া নাচাইতেছেন, রাধা প্রেমের এমনি মহীয়সী শক্তি যে তাহা সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত নাচাইতেছেন।

"কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম—ভক্তেরে নাচায়।
আপনি নাচয়ে—তিনে নাচে এক ঠাঁই ॥ (চৈঃ চঃ ।১৮।১৭)

রাধা প্রেমের কি এক অদ্ভুত স্বভাব যে কৃষ্ণকে নাচায়, ভক্তকে নাচায় এবং নিজেকেও নাচায়।

পরিশেষে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখিলেন,

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এ প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥"

বিংশ তরঙ্গ

রাধা—চন্দ্রাবলী

ব্রজধামে আর এক নায়িকার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনিও অতুল প্রেম সম্পত্তির দ্বারা বিখ্যাতা। এই নায়িকা শ্রীমতী চন্দ্রাবলী—দক্ষিণা নায়িকা। কৃষ্ণও তাঁহার প্রেমরস পান করিবার জন্য কখন কখন তাঁহার কুঞ্জে অভিসার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাও রাধা প্রেমের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিবার এবং রসের পুষ্টি বিধান করিবার নিমিত্ত। তাঁহার প্রেমের মধ্যে গভীর অনুরাগ আছে কিন্তু রাধা প্রেমের উদ্দামতা নাই বা মহাভাবের চূড়ান্ত বিকাশ নাই।

তাঁহার মধ্যে বাম্য নাই। তাঁহার আচরণ সরল, ব্যবহার সরল এবং দৃষ্টিও সরল। তিনি মান গ্রহণে অসমর্থা। নায়কের প্রতি যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করেন এবং কারণ বিদ্যমান থাকিলেও নায়কের স্তুতি বাক্যে অতিশয় মৃদু এবং মুগ্ধা হইয়া পড়েন। তাহার কৌটিল্য নাই। তিনি দক্ষিণা নায়িকা এবং মুগ্ধা নায়িকা। সে কারণ তাঁহার মধ্যে প্রেমের বহুমুখী বৈচিত্র্য নাই।

অপর পক্ষে শ্রীরাধা বামা নায়িকা। তিনি মান গ্রহণে সতত উদ্‌যুক্তা, মন শৈথিল্যে কোপন স্বভাবা। নায়ক কর্তৃক অভেদ্যা অর্থাৎ নায়ক তাঁহার মান প্রসাদন করিতে অসমর্থ। তিনি নায়কের প্রতি কঠিনারূপে প্রতীয়মানা।

উজ্জ্বল নীলমণি বামা, দক্ষিণা এবং মুগ্ধা নায়িকার নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

বামা নায়িকা।

"মানগ্রহে সদোদ্‌যুক্তা, তচ্ছৈথিল্যে চকোপনা।
অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রুরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে॥ (সখী প্রঃ ৩২)

দক্ষিণা নায়িকা।

"অসহামাননির্ব্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী।
সামভিস্তেন ভেদ্যা চ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা॥" (সখী প্রঃ ৩৮)

মুগ্ধা নায়িকা।

মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা সখীবশা।
রতিচেষ্টাসু সব্রীড়-চারু-গূঢ় প্রযত্নভাক্॥
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোচনা।
প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা-মানেচ বিমুখীসদা॥" (নায়িকা ভেদ প্রঃ ১৩-১৪)

যে নায়িকার নবীন বয়স ও নব্য কাম, কিন্তু রতি বিষয়ে বাম্যভাব অর্থাৎ সম্ভ্রম, লজ্জাদির দ্বারা আবৃত, যিনি সখীগণের অধীন, রতি চেষ্টাসমূহে অতিশয় লজ্জাশীলা, অতএব মনোজ্ঞ অথচ বাহ্যতঃ অব্যক্ত নির্বন্ধ, প্রিয়তম অপরাধ করিলে যিনি সাশ্রু নয়ন হন, প্রিয় বা অপ্রিয় বাক্যে যিনি অভ্যস্তা নন এবং মানে বিমুখী, তাঁহাকে মুগ্ধা নায়িকা বলে। শ্রীমতী চন্দ্রাবলী দক্ষিণা এবং মুগ্ধা নায়িকা।

রাসোৎসবে কৃষ্ণ যখন অন্তর্হিত হইয়া পুনরায় গোপীগণের সহিত মিলিত হইলেন, তখন দক্ষিণা নায়িকা শ্রীমতী চন্দ্রাবলী এবং তাঁহার সখীবৃন্দ তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিলেন। কিন্তু বাম্যস্বভাবা শ্রীরাধা তাঁহাকে অঙ্গীকার না করিয়া দশনে অধর দংশন করিয়া ভ্রুকুটীময় তীক্ষ্ণ বক্রদৃষ্টির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বক্রদৃষ্টিতে কৃষ্ণ জর্জ্জরিত হন বটে তথাপি সর্বদা এবং সর্বাবস্থাতেই এই নায়িকার আনুগত্য স্বীকার করেন। বেদ তাঁহার স্বরূপের যে সকল মহিমা গান করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষাও প্রিয়ার ভৎর্সন তাঁহার নিকট অধিক মনোহর।

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হইতে তাহে হরে মোর মন॥" (চৈঃ চ ১।৪।২৩)

শ্রীরাধার মান তাঁহার প্রেমরূপ নন্দন কাননের প্রস্ফুটিত পারিজাত কুসুম। শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলী এই দুই নায়িকার মধ্যে তুলনা করিয়া উজ্জ্বল নীলমণি লিখিয়াছেন :—

"তযোরপ্যুভযোর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাব স্বরূপেযং গুণৈরতি বরীযসী॥" (রাধা প্রঃ ৩)

এতদুভয়ের মধ্যে রাধিকা সর্ব্ববিধে অধিকা। তিনি মহাভাব স্বরূপা এবং সর্ব্বগুণ গরিষ্ঠা।

প্রেমসর্বস্বা ব্রজবধূগণের প্রেমের স্বরূপ আলোচনা করিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নির্ধারিত করিয়াছেন যে উহা দুইটি বিশিষ্ট ধারায় বিভক্ত। একটি **তদীয়তাময় ভাব** এবং অপরটি **মদীয়তাময় ভাব**। অভিমান ভেদ বশতঃ ইহাদের বৈশিষ্ট্য। যে

প্রেমাভিমানের অনুভূতি 'আমি শ্রীকৃষ্ণের' অতএব তাঁহার অধীন, তাঁহার সেবা যত্ন এবং তাঁহার আদরেই যে প্রেমের চরম সার্থকতা তাহাই তদীয়তাময় ভাব। তদীয়তাময় স্নেহকে আদরময় **'ঘৃত স্নেহ'** বলে। এই প্রেমে আদর, যত্ন এবং পরিচর্য্যার প্রাবল্য। এই সমুদয় ভাব বিশিষ্ট নায়িকার শিরোমণি শ্রীমতী চন্দ্রাবলী। তিনি ধীরস্বভাবা, আনুকূল্যপরায়ণা এবং দাক্ষিণ্যাদিভাবসম্পন্না। সে কারণ তিনি দক্ষিণা নায়িকা রূপে পরিগণিতা। অতিশয় সমাদর বুদ্ধিতে তিনি প্রেমিকের সেবা করিয়া থাকেন। এই প্রকার নায়িকা সর্ব্বদাই কান্তের অধীনা। এই প্রেমে বহুলাংশে সংকোচময় ভাব নিহিত আছে।

পক্ষান্তরে মদীয়তাময় প্রেমে "শ্রীকৃষ্ণ আমার" এই প্রকার হৃদয়ে সুদৃঢ় অভিমান আছে। ইহাই প্রেমের চূড়ান্ত বিকাশ। মদীয়তাময় ভাবের দ্বারা বিভাবিতা হইয়া প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধা মনে করেন—যদি আমার বলিতে জগতে কেহ কিছু থাকে তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণই কেবল আমার এবং তিনি আর কাহারও নন এবং তিনি ব্যতীত আমার আর কিছুই নাই। ইহা অনুরাগবাঞ্ছিত মদীয়তাময় প্রেমের চরম অভিমান। সে কারণ এই নায়িকার ভাবধাম্য, স্বভাব প্রখরা। এই নায়িকার সেবা যত্নকে **'মধু স্নেহ'** বলে। মধু স্নেহে আদর পরিচর্য্যারূপ সাধারণ ব্যবহারের প্রাচুর্য্য নাই। আছে প্রচুর মাদকতা শক্তি, যদ্দারা নায়ক তাঁহার বশীভূত হন। সে কারণ এই নায়িকা স্বাধীন ভর্তৃকা।

মধু যেমন অন্য বস্তুর সংযোগ ব্যতীত আপনা আপনি মধুর এবং মাদকতাপূর্ণ তেমনি মধু স্নেহ স্বীয় গুণেই মধুর। মাধুর্য্য সম্পাদনার্থ অন্য কোন ভাব সংযোগের প্রয়োজন হয় না। মধু স্নেহে সূক্ষ্মভাবে অশেষ বিশেষ রসের অবস্থিতি আছে। কিন্তু ঘৃত যেমন লবণ প্রভৃতি অন্য কোন বিজাতীয় বস্তুর সংযোগ ব্যতীত আপনা আপনি স্বাদু হয় না, তদ্রূপ ঘৃত স্নেহ অন্য ভাবসংযোগ ব্যতীত মধুর হয় না।

কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় গোবিন্দলীলামৃতে বিবিধ কাব্যালঙ্কারের দ্বারা চন্দ্রাবলী অপেক্ষা রাধার উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার সারার্থ এই স্থলে বিবৃত হইল।

একটি অলঙ্কার তিনি দেখাইয়াছেন তাহার নাম **সারান্যানের সার্ক্ষ্য।** ইহা নিম্নোক্ত শ্লোকের দ্বারা তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"গীর্ভূর্লীলা যুবতিষু বরৈঃ সদ্গুণৈঃ সারভূতা
স্তাভ্যঃ সা শ্রীস্তত ইহ মহাপ্রেমগোপাঙ্গনাস্তাঃ।

তাভ্যশ্চন্দ্রাবলিমুখলসদ্ যূথনাথা অমূভ্যঃ
শ্রীরাধাস্যাং যদিহ নিতরাং সোঽপি কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণঃ ॥ (১১ সর্গ ১৩০)
(সারানুমানাভ্যাং সঙ্করঃ)

যুবতিগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট সদ্‌গুণ দ্বারা গী' ভূ, লীলা (সরস্বতী, পৃথিবী এবং লীলা) প্রভৃতি শক্তি বর্গ সার স্বরূপা। তদপেক্ষা লক্ষ্মী সার স্বরূপা। তদপেক্ষা ব্রজমণ্ডলে সুমহৎপ্রেমসম্পন্ন ব্রজাঙ্গনাগণ সার স্বরূপা। তাঁহাদিগের হইতে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি যূথেশ্বরীগণ সার স্বরূপা, এবং তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রীরাধা সার স্বরূপা, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ এই রাধায় **অতিশয় সতৃষ্ণ** হইয়া থাকেন।

সার—উত্তরোত্তর কোনও বস্তুকে যদি ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট করা যায়, তাহাকে '**সার**' বলে। এস্থলে সরস্বতী প্রভৃতি লীলাশক্তি হইতে লক্ষ্মীদেবী শ্রেষ্ঠা। লক্ষ্মী হইতে ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের হইতে চন্দ্রাবলী শ্রেষ্ঠা এবং তাঁহা হইতে শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহা সারালঙ্কার।

অনুমান—সাধন দর্শন করিবা সাধ্যের স্থিরীকরণকে 'অনুমান' কহে। এস্থলে শ্রীরাধা নিখিল যুবতীগণের সার, তাহার কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাতে সতৃষ্ণ হইয়া থাকেন। এই বাক্যে 'শ্রীরাধা সার' ইহা সাধ্য এবং শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ ইহা কারণ বা হেতু। এইরূপে সাধন দর্শনে সাধ্যের স্থিরীকরণের নাম অনুমান। শ্রীরাধার উৎকর্ষ আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সতৃষ্ণ। এইরূপে সার হইতে অনুমান জন্মিয়াছে। সুতরাং সার অঙ্গী (প্রধান) এবং অনুমান (অঙ্গ, অপ্রধান)। অপর দিক দিয়া একথাও বলা চলে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ রাধায় সতৃষ্ণ সে হেতু শ্রীরাধার উৎকর্ষ। এস্থলে অনুমান (প্রধান) এবং সার অঙ্গ (অপ্রধান)। অতএব উভয়ের যখন অঙ্গাঙ্গিভাব হয় তখন তাহার নাম **সঙ্কর**। অর্থাৎ ইহা সার এবং অনুমানের যথাক্রমে অঙ্গাঙ্গিভাবে সমীকরণ।

পুনরায় তিনি **ব্যাঘাত অলঙ্কারের** সাহায্যে শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যথা ;—

'চন্দ্রাবলী প্রণয়রূপগুণৈঃ প্রযত্নাদ্
ব্যক্তীকৃতৈর্ব্যরচয়ৎ স্ববশং বকারিম্।
শ্রীরাধিকা তু সহজ প্রকটৈর্নিজৈস্তৈ—
র্ব্যস্মারয়ত্তমিহ তমপি হা কুতোঽন্যাঃ ॥ (১১ সর্গ ১৩১

চন্দ্রাবলী অতি যত্ন সহকারে প্রণয়, রূপ ও গুণ সমূহ ব্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আপনার বশীভূত করেন, কিন্তু শ্রীরাধা তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রণয়, রূপ ও গুণ দ্বারা

শ্রীকৃষ্ণকে এমনি ভাবে বশীভূত করেন যে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কথাও ভুলিয়া যান। তাহা হইলে কি আশ্চর্য্য, অপর নারীগণকে কিসে গণনা করি।

ব্যাঘাত অলঙ্কার। যে বস্তুকে যে উপায়ে সাধিত করা যায়, সেই উপায়েই যদি সেই বস্তুর অন্যথা বা খণ্ডন করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্যাঘাত অলঙ্কার বলে।

'যদ্বস্তু সাধিতং যেন করণেন তদন্যথা।
তেনৈব যদি তস্য স্যাত্তদা ব্যাঘাত ইষ্যতে॥"

এস্থলে চন্দ্রাবলী যে যে গুণে শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছিলেন, শ্রীরাধাও সেই সেই গুণে শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু এমনিভাবে বশীভূত করিয়াছিলেন, যে তাহাতে তিনি চন্দ্রাবলীর কথাও বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

এস্থলে উপাদানগত পার্থক্য নাই কিন্তু কারুকার্য্য এবং পরিবেশনের পার্থক্য প্রচুর। একটী স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং স্বাভাবিক, অপরটি ব্যক্ত এবং যত্ন সহকারে প্রকটিত। একটি মধু স্নেহ দ্বারা বশীভূত করা, অপরটি ঘৃত স্নেহের দ্বারা বশীভূত করা। মধু স্নেহের এমনি মাদকতা শক্তি যদ্দ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীকে পর্য্যন্ত বিস্মারিত করাইয়াছিলেন। সুতরাং যে উপায়ে বস্তু সাধিত হয়, সেই উপায়েরদ্বারা তাহা অন্যথা বা খণ্ডিত করা হইলে তাহাকে ব্যাঘাত অলঙ্কার বলে।

স্থূল কথা এই যে শ্রীরাধার 'ভিয়ান' পরিপাট্য এবং পরিবেশনের অপূর্ব কৃতিত্ব তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণবশীকরণের যোগ্যতা প্রদান করিয়াছে।

অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যখন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে অভিসার করিতেন, তখন তিনি শ্রীরাধার স্মৃতি হৃদয়ে বহন করিয়া যাইতেন। ফলে কি জ্ঞাতসারে, কি অজ্ঞাতসারে তাঁহার রসনা হইতে রাধা নাম সহসা ধ্বনিত হইয়া উঠিত। বিদগ্ধ মাধব নাটকে ইহার একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বর্ণিত আছে। এক সময়ে তিনি রাধার কুঞ্জ হইতে সহসা বহির্গত হইয়া চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে রাধা নাম নির্গত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি অপ্রতিভ হইলেন এবং রাধা নাম শুনিয়া চন্দ্রাবলী সাতিশয় রুষ্টা হইয়াছেন দেখিয়া কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে একটু সামলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার ছলে বলিলেন, 'প্রিয়ে, কই আমি তো রাধা বলি নাই, আমি ধারা বলিয়াছি। পথে আসিতে আসিতে একটি স্নিগ্ধ জলধারায় স্নাত হইয়া আসিয়াছি এই কথাই বলিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু তুমি সর্বদা রাধাকে ধ্যান কর বলিয়া সব সময় রাধা নাম শুনিয়া থাক। তবে হয়তো শুনিতে গিয়া তোমার শ্রুতিবিপর্য্যয় হইতে পারে,

কিম্বা আমার বলিতে গিয়া বর্ণবিপর্যয়ও হইতে পারে। যে কোন কারণেই হউক এই প্রকার ভ্রান্তির উদ্ভব হইয়াছে। এবম্প্রকার বাক্যে তিনি প্রতিপক্ষীয়া দক্ষিণা নায়িকা চন্দ্রাবলীকে সান্ত্বনা দিতেন। (৪র্থ অঙ্ক ১৩ অনুচ্ছেদ।) "বিপিনান্তরে মিলন্তীমধুরসা শীতলস্পর্শা। অমৃতময়ী তদ্বিরহেসমজনি তাপন্তয়ে রাধা॥ (ইতি-সসম্ভ্রমং) ধারাধারা॥"

শ্রীরাধাতেই যে শ্রীকৃষ্ণের চরমতম আকর্ষণ এবং শ্রীমতী চন্দ্রাবলী যে দক্ষিণা নায়িকা তাহার আর একটি বিচিত্র চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, শ্রীরূপ তাঁহার "উৎকলিকা বল্লরী" নামক স্তবের একটি স্তবকে। ইহা আরও প্রমাণিত করে যে রাধার কিঙ্করীগণই কেবল শ্রীকৃষ্ণ সুখাকাঙ্ক্ষিনী। শ্লোকটি এই ;—

"অঘহর বলীবর্দ্দঃ শ্রেয়ান্নবস্তব যো ব্রজে
বৃষভবপুষা দৈত্যেনাসৌ বলাদভি যদ্যতে।
ইতি কিল মৃষাগীর্ভিশ্চন্দ্রাবলী নিলয়স্থিতং
বনভুবি কদা নেষ্যামি ত্বাং মুকুন্দমদীশ্বরীম্॥" ৬০

শ্রীরাধা সঙ্গ লোলুপ নাগর রাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য বৃন্দাবনের বনপথে চলিতেছেন। পথিমধ্যে চন্দ্রাবলীর সখীদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাঁহারা বলপূর্বক তাঁহাকে তাঁহাদের প্রিয়সখী চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে উপনীত করাইলেন। বহুবল্লভ নাগর মনেমনে প্রিয়ারাধারসঙ্গাভাবে কাতর হইলেও চন্দ্রার সহিত কপট প্রেম সম্ভাষণ করিতে বাধ্য হইলেন। এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শ্রীরূপ মঞ্জরী ঐ কুঞ্জে আসিয়াই "অহে অঘহর, তোমার সেই প্রাণপ্রিয় বলীবর্দ্দটিকে বৃষভাসুর আক্রমণ করিয়াছে—যাহা করিতে হয় করিও আমি চলিলাম।" এই প্রকার মিথ্যা বাক্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে রাধার কুঞ্জে লইয়া আসিলেন।

এই শ্লোকটিতে দেখান হইয়াছে এক দিকে শ্রীকৃষ্ণের রাধাসঙ্গ লোলুপতা, আর একদিকে চন্দ্রাবলীর দাক্ষিণ্য স্বভাব এবং আর একদিকে রাধা কিঙ্করীগণের সেবার বিচিত্র কৌশল।

শ্রীরঘুনাথ দাস মহাশয় মনঃশিক্ষায় দশম শ্লোকে চন্দ্রাবলী এবং অপরাপর যুবতি বৃন্দ হইতে রাধার উৎকর্ষ দেখাইয়া দিয়াছেন ;—

"রতিং গৌরী লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্য কিরণৈঃ
শচী লক্ষ্মী সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলি মুখ নবীন ব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্যাতাং হরিদয়িত রাধাং ভজমনঃ॥"

যিনি সৌন্দর্য্য কিরণ-মালার দ্বারা কাম পত্নী রতিকে, ভবপত্নী গৌরীকে, শক্তি-রূপা লীলাদিগকে সন্তাপিত করিতেছেন, যিনি সৌভাগ্যের দ্বারা শচী লক্ষ্মী এবং কৃষ্ণ পত্নী সত্যভামাকে পরিভব করিতেছেন, যিনি বশীকারাদি স্বীয় ধর্ম দ্বারা চন্দ্রাবলী প্রমুখ নবীন ব্রজসতীদিগকে সন্তাপ দিতেছেন, হে মন তুমি সেই হরিপ্রিয়া রাধাকে সর্ব্বদা ভজনা কর।

"সৌন্দর্য্য কিরণ মালা, জিনে রতি গৌরীলীলা
অনায়াসে স্বরূপ বৈভবে।
শচীলক্ষ্মী সত্যভামা, যত ভাগ্যবতীরামা
সৌভাগ্য বলনে পরাভবে॥
ভজ মন চরণ তাঁহার।
চন্দ্রাবলী যূথ যত, নবীন নাগরীশত
বশীকারে করে তিরস্কার॥

রাগ—নীলিমা এবং রক্তিমা।

উজ্জ্বল নীলমণি গোপীগণের রাগকে রং এর সহিত তুলনা করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। একটা **নীলিমা** অপরটী **রক্তিমা**। নীলি বৃক্ষ এবং শ্যামা লতা হইতে উৎপন্ন রাগকে 'নীলিমা' বলে। যদিও এই রাগ শাপ্রতিরোহিত হয় না, তথাপি বাহ্যে ইহা তত প্রকাশশীল নহে। ইহা অবাহিত্থা অর্থাৎ আত্মগোপন দ্বারা মনের নিজস্ব ভাবকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সে কারণ ইহা বিশেষ উজ্জ্বল নয়। শ্যামা রাগও নীলিমা রাগের ন্যায়। শ্যামা রাগে প্রথমতঃ ওষধি বিশেষের 'পুট ভাবনা' দিলে নীল রাগ হইতে অধিকতর প্রকাশশীল হয়। কিন্তু শ্যামা রাগে অল্পতর মধু স্নেহ এবং অধিকতর ঘৃত স্নেহের সম্মেলন থাকায় ঔজ্জ্বল্য প্রকাশে দেরী হয়। নীলি রাগ এবং শ্যামা রাগ শ্রীমতী চন্দ্রাবলী এবং তাঁহার যূথ বৃন্দে দৃষ্ট হয়। সে কারণ চন্দ্রাবলীর রাগকে **নীলি রাগ** বলে।

রক্তিমা রাগ দুই প্রকারের—একটি কুসুম্ভকুসুমবৎ রক্তিমা, অপরটি রক্তবর্ণ মঞ্জিষ্ঠা নামক লতা বিশেষ হইতে উৎপন্ন রক্তিমা। কুসুম্ভ রাগ চিত্তে শীঘ্রই সঞ্চারিত হয় এবং নীলিরাগ এবং শ্যামা রাগ হইতে অধিকতর প্রকাশ শীল। কিন্তু ইহার ম্লান হইবার সম্ভাবনা আছে। তবে শ্রীরাধার সঙ্গিনী দিগের সঙ্গ রূপ 'পুট ভাবনা' দিলে ম্লান হয় না। সখী শ্যামলার রাগ কুসুম্ভ রাগ। তিনি তটস্থা নায়িকা; তিনি কখনও চন্দ্রাবলীর যূথে এবং কখন রাধা যূথের সহিত মিলিতা হন। তিনি যখন রাধার সঙ্গিনী গণের সংস্পর্শে থাকেন, তখন তাঁহার কুসুম্ভ রাগ ম্লান হয় না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইতেছে যে ব্রজে নায়িকা চতুর্বিধা যথা' স্বপক্ষা, বিপক্ষা, সুহৃদ পক্ষা এবং তটস্থপক্ষা। চন্দ্রাবলী এবং তাঁহার যূথ বৃন্দ যথা শৈব্যা, ভদ্রা প্রভৃতি শ্রীরাধার বিপক্ষা নায়িকা। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুরেখা, চম্পক লতা, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যা, এবং সুদেবী এই অষ্ট প্রধানা সখী শ্রীরাধার স্বপক্ষ নায়িকা। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক নায়িকার অনন্ত মঞ্জরী আছেন। আর যাঁহারা এই দুই নায়িকার মধ্যে কোন এক নায়িকার আনুকূল্য বিধান করেন, তাঁহারা সেই নায়িকার সুহৃদ পক্ষ। আর যাঁহারা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হউক আর চন্দ্রাবলীর সহিত মিলন হউক, তাহাতে কোন আপত্তি করেন না, তাঁহারা তটস্থা-পক্ষা।

ব্রজে রাধা এবং চন্দ্রাবলী এই দুই মুখ্যা নায়িকার মধ্যে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যাঁহারা যে পক্ষের অন্তর্ভুক্ত তাঁহারা সেই পক্ষীয়া। যাঁহারা যে পক্ষের প্রাতিকূল্য করেন, তাহারা সেই পক্ষের বিপক্ষীয়া, যাঁহারা যে পক্ষকে সমর্থন করেন, তাঁহারা সেই পক্ষের সুহৃদ পক্ষীয়া এবং যাঁহারা নিরপেক্ষ, তাহারা তটস্থাপক্ষীয়া।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে চন্দ্রাবলীর রাগ নীলিরাগ। শ্রীরাধার রাগ মঞ্জিষ্ঠা রাগ। মঞ্জিষ্ঠা রাগ যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনি স্থায়িত্বে, ঔজ্জ্বল্যে এবং শোভাসম্পদে নীলিরাগ এবং কুসুম্ভরাগ হইতে উৎকৃষ্ট। এই রাগক্রমে সঞ্জাত হয়, সর্বদা উজ্জ্বল থাকে এবং কখন ম্লান হয় না। ইহা অন্য নিরপেক্ষ অর্থাৎ ইহাকে স্থায়ী এবং উজ্জ্বল করিতে কোন প্রকার 'ভাবনা' দিতে হয় না। ইহা সততবর্ধন শীল এবং অতিশয় উজ্জ্বল। ইহা কেবল রাধাকৃষ্ণে বিদ্যমান। কিন্তু প্রেমোৎকর্ষ বশতঃ মঞ্জিষ্ঠা রাগের আধিক্য একমাত্র শ্রীরাধিকাতে। সে কারণ চন্দ্রাবলীর অপেক্ষা শ্রীরাধার প্রেম শ্রেষ্ঠ।

একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া শ্রীরাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে প্রদর্শিত হইতেছে।

এক সৌভাগ্য পূর্ণিমা তিথিতে রাধিকাকে কৃষ্ণে সংগত করিবার জন্য ললিতা বিশাখাদি কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাবনে ভ্রমন করিতেছিলেন। তখন চন্দ্রাবলীর সখী শৈব্যা ভদ্রা প্রভৃতিও চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণে সংগত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সে সময় উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের কথোপকথনের মধ্যে যে টুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা হইতে রাধা প্রেমের আধিক্য সূচিত হয়। ললিতা, বিশাখা জিজ্ঞাসা করিলেন—সখি শৈব্যে, আপনাদের প্রিয় সখী চন্দ্রাবলি যখন কৃষ্ণ বিরহে মুহ্যমানা হন তখন আপনারা কি করেন? শৈব্যা উত্তর করিলেন, "কেন

আমরা তখন আমাদের প্রিয় সখিকে কৃষ্ণ নাম গান করিয়া শুনাই। ললিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহাতে তিনি কি করেন? শৈব্যা উত্তর করিলেন—তিনি তাহাতে আশ্বস্তা হন।

একথা শ্রবণ করিয়া ললিতা বলিলেন—তাহলে দেখছি আপনারা পরম সৌভাগ্যবতী কিন্তু আমাদের অবস্থা বিপরীত। আমাদের এতই দুর্ভাগ্য যে যদি আমরা আমাদের প্রিয়সখীকে কৃষ্ণ নাম শুনাই, তাহা হইলে তাঁহার অবস্থা যে কি ভীষণ হয় তাহা আপনার কাছে আর কি জানাইব। তখন তিনি কখন হাসিতে থাকেন, কখন কাঁদিতে থাকেন, কখন গান করিতে থাকেন এবং কখনও নৃত্য করিতে থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি উন্মাদিনী হইয়া যান। তখন তাঁহার ধৈর্য্য রক্ষা করা আমাদের কঠিন হইয়া পড়ে।

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত রুচ্চৈ
হ'সতি, রোদিতি, রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ॥" (ভাং ১২।২।৪০)

বিপ্রলম্ভের মধ্যে নামের আস্বাদন যেন গরলামৃতের সম্মেলন। একদিকে মিলনের স্ফূর্ত্তিজাত অপূর্বআনন্দানুভব, অপরদিকে অপ্রাপ্তি নিবন্ধন মমন্তুদ যন্ত্রণা। এনাম ব্রজলোকে মহীয়তে। এ নাম ব্রজ বধূগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর নিজস্ব সম্পত্তি। ইহা হইতে রাধা প্রেমের উদ্দামতা বুঝা যায়।

রাধা প্রেমের উজ্জ্বলতা এবং নিষ্কামতা আরও অনুভূত হয়, যে রাধারাণী প্রায়ই বলিয়া থাকেন, কৃষ্ণ যদি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়া অধিক আনন্দ লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি চন্দ্রাবলীর দাসীত্ব স্বীকার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিবেন না। ইহা নিষ্কাম প্রেমের পরিচয়। কিন্তু তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেন যে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে গিয়া কোন সুখ লাভ করিতে পারেন না, তাঁহার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া যান এবং কোন প্রকারে তাঁহার সঙ্গে কালাতিপাত করেন, শুধু চন্দ্রাবলীকে সুখী করিবার নিমিত্ত। তিনি সেখানে থাকিয়া সুখী হন না বলিয়া তাঁহাকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে তাঁহার স্বপক্ষগণ—মিথ্যা কথা বলিয়াও বাহির করিয়া আনেন এবং রাধাসঙ্গ লাভ করাইয়া দেন।

তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে চন্দ্রাবলী উপেক্ষিতা নায়িকা? না, ব্রজধামে কেহই উপেক্ষিতা নন। প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও চন্দ্রাবলী কখনও মনে করিতে

পারেন না যে তিনি কৃষ্ণ কর্তৃক অনাদৃতা। কৃষ্ণ প্রেম তাঁহার মধ্যে এমনি ভাবে নিহিত যে তিনি কৃষ্ণকে ক্ষণ মাত্রও ভুলিতে পারেন না। যাঁহার যে প্রকার ও যে পরিমাণ প্রেম, কৃষ্ণ সেই প্রকার এবং ততটুকুই আস্বাদন করেন এবং তাঁহার কাছে সেই প্রকার বশীভূত। ব্রজধামে সকলেই কৃষ্ণগত প্রাণ। এমনকি যাঁহারা রাধাগোবিন্দের মিলনের প্রতিকূলতা করিতেন, তাঁহারাও কৃষ্ণকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। এমনকি জটিলা কুটিলা আয়ান প্রভৃতি সকলকার মধ্যে কৃষ্ণ প্রেম নিহিত। নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় কৃষ্ণের শত নামের মধ্যে লিখিয়াছেন ;

"আযান রাখিল নাম ক্রোধ নিবারণ।

জটিলা রাখিল নাম মদন মোহন॥"

জটিলা যখন পুত্রবধূ অন্বেষণে বহির্গতা হইযা কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিতেন, তখন তিনি অপলক দৃষ্টিতে চাহিযা আত্মহারা হইয়া কৃষ্ণের বদন মাধুর্য পান করিতেন এবং বলিতেন—এই মাধুর্যের জন্য আমার পুত্রবধূ পাগলিনী। লীলারস পুষ্ট করিবার জন্য ব্রজের সকলেরি প্রয়োজন, কাহাকেও উপেক্ষা করা চলেনা। বিপক্ষ, সপক্ষ সুহৃৎ পক্ষ প্রভৃতি সখীদিগের যে শ্রেণীবিভাগ, তৎসমুদয় রাধাকৃষ্ণের মিলন মাধুর্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এবং রসের পুষ্টি সাধন করিবার নিমিত্ত।

একবিংশ তরঙ্গ

রাধা প্রেমের উৎকর্ষ

পূর্বে উক্ত হইয়াছে মাঞ্জিষ্ঠ রাগবতী শ্রীরাধারার প্রেম সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক। ইহা আগন্তুক নহে, ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত কিন্তু বক্র গতিতে পরিচালিত। যদিও তাঁহার প্রেমে বাম্য, কৌটিল্য এবং অদাক্ষিণ্য জড়িত আছে, তথাপি সে বাম্য ভাব প্রেম রসের পুষ্টি বিধায়ক। কোন দ্বিধা নাই, ত্রাস নাই এবং সংকোচ নাই, আছে কেবল প্রাণভরা ভালবাসা। সুচতুর ভগবান সর্বত্রই তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে গিয়াছেন, প্রেমের গভীরতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত। সকল স্থানেই তিনি তাঁহার ভগবত্তা দর্শন করাইয়া প্রেমকে শিথিল করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু রাধা প্রেমের সম্মুখে তাঁহার ভগবত্তার প্রভাব স্তিমিত হইয়া যায়। তাহার বহু দৃষ্টান্ত বহু গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তন্মধ্য হইতে দুই-একটী কাহিনী এখানে বিবৃত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজত্ব

একদা বাসন্ত রাসোৎসবে, নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীরাধাকে পাইবার মানসে তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া কৃষ্ণ যখন রাসস্থলী পরিত্যাগ করিলেন, তখন গোপীগণ কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা প্রায় কৃষ্ণের সন্নিকটে আসিতে লাগিলেন, তখন কৃষ্ণ মনে করিলেন—আচ্ছা আমার যদি এই সময় আর দুই খানি হাত হইত, তাহা হইলে গোপীগণ আমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া নারায়ণ ভ্রমে অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। ইচ্ছা শক্তির আবির্ভাবে তখনি ঐশ্বর্য্য আসিয়া প্রভুর সেবায় রত হইলেন। তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজকৃষ্ণ শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপে প্রতিভাত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বাস্তব মূর্ত্তি বলিয়া ধারণা হইলনা, মনে হইল একটী নিশ্চল প্রস্তর নির্মিত প্রতিমা দাঁড়াইয়া আছে। গোপীগণ আসিয়া দেখিলেন যে ইনি নারায়ণ, তাঁহাদের কৃষ্ণ নহেন। তখন তাঁহারা তাঁহাদের উপাস্য দেবতা নারায়ণকে স্তবস্তুতি করিয়া কৃষ্ণ সঙ্গ প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে রাধিকা আসিতেছেন দেখিয়া কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন—"আচ্ছা এবার দেখা যাক্ রাধা কি করেন?" কিন্তু রাধা প্রেমের এমনি অদ্ভুত শক্তি যে

শ্রীরাধা যতই কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, অমনি কৃষ্ণ তাঁহার আগন্তুক হস্ত দুইখানি কোন ক্রমেই রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। যিনি অসীম শক্তিধর, যাঁহার ইঙ্গিতে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় চক্ষুর নিমিষে নিষ্পন্ন হয়, রাধা প্রেমের সম্মুখে তাঁহার চতুর্ভুজত্ব কোন ক্রমেই রক্ষিত হইল না। যেমনি শ্রীরাধা সম্মুখে আগমন করিলেন, অমনি আগন্তুক হস্ত দুইটা অন্তর্হিত হইল। রাধার সান্নিধ্যে আসিয়া চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বাভাবিক দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। রাধা প্রেমের সম্মুখে একদিকে ঐশ্বর্য্যের পরাভব স্বীকার, অপরদিকে মাধুর্য্যের পুষ্টি বিধান করিবার নিমিত্ত এবং রাধা প্রেমের গৌরব ঘোষণা করিবার নিমিত্ত, ঐশ্বর্য্যের সময়োচিত সেবা। রাধার উন্নত প্রেম ভগবানের ঐশ্বর্য্যকে স্তম্ভিত করিয়া দেন।

এই সুপরিচিত ঘটনা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত হয় নাই, গীত গোবিন্দে বর্ণিত হয় নাই, বাসন্ত মহারাসেও ইহার উল্লেখ নাই। গৌতমীয় তন্ত্রে বাসন্ত মহারাসের উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণ বসন্ত কালে কুসুম সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত পরম রমণীয় গিরি গোবর্ধন তটে গোপীগণের সহিত রাস ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

"বসন্ত কুসুমামোদ সুরভি কৃত দিঙ্মুখে
গোবর্ধন গিরৌ রম্যেস্থিতং রাস রসোৎসুকম্" ॥

শ্রীরূপ তাঁহার উজ্জ্বলে নায়িকা ভেদ প্রকরণে ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্লোকে রাধা প্রেমের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এই কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

"ভুজা চতুষ্টয়ং ক্বাপি নর্ম্মণা দর্শয়ন্নপি।
বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেম্না দ্বিভুজঃক্রিয়তে হরিঃ ॥"

যথা—

রাসারম্ভ বিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগর্ণৈ মূর্ত্তিং গোপয়িতুং
সমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্যশ্রিয়া রক্ষিতুং সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি
হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা।"

কোনও সময়ে পরিহাস পটু শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত পরিহাসরঙ্গরস আস্বাদন করিবার ছলে এবং তাঁহাদের প্রেম পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! শ্রীরাধা প্রেমের এমনি মহিমা যে শ্রীরাধার সম্মুখে তাঁহার কৃত্রিম হস্তদুইটি তিনি কোন ক্রমে রক্ষা করিতে পারেন নাই। রাধা প্রেমের আশ্চর্য্য প্রভাবে অসীমপ্রভাবশীল হরিরও ঐশ্বর্য্য স্তম্ভিত হয়। শ্রীচৈতন্য

চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণির উপবের শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (১।১৭।৯)

রাধা প্রেমের অসংকোচময় ভাব।

শ্রীবাধার স্বাভাবিক প্রেমে যে অসংকোচ মষ ভাব নিহিত আছে, তাহা নিম্নোক্ত আর একটী লীলা কাহিনীব দ্বাবা বর্ণিত হইতেছে। এখানে লক্ষ্য কবিবাব বিষয় এই যে, এই নায়িকাব বিবহে যে প্রকাব মর্মন্তুদ প্রলাপ, মিলনেও সেই প্রকার কৌতুকাবহ, লজ্জা, দ্বিধা এবং শঙ্কাহীন মধুর সংলাপ। কি বিযোগে কি-সংযোগে ইঁহাব প্রেম অতুলনীয।

এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বাধাকে সম্বোধন কবিযা বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমবা যে আমাব সহিত হাস্য পরিহাস কবিযা থাক, কিন্তু তোমবা কি জান আমি কে?' রাধিকা হাস্য সহকারে জিজ্ঞাসা কবিলেন, 'তুমি আবাব কে।' 'কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'জাননা, আমি স্বযং ভগবান।' বাধিকা প্রশ্ন কবিলেন, 'তাহাব প্রমাণ?' কৃষ্ণ বলিলেন, 'প্রমাণ? প্রমাণ দেখ্‌ছনা, আমাব পদযুগলে কত প্রকাব ধ্বজ বজাঙ্কুশ প্রভৃতি শুভ চিহ্ন দি অঙ্কিত রহিয়াছে।'

তদুত্তবে বাধিকা বলিলেন, 'ও', এই গুলি বুঝি ভগবত্তার প্রমাণ? তা যদি হয, তা'হলে আমার পদ যুগলে তোমাব অপেক্ষা ও অধিকতব সুন্দর সুন্দব রেখা অঙ্কিত বহিযাছে। ইহাই যদি ভগবত্তাব প্রমাণ হয, তাহা হইলে তোমাকে স্বীকাব কবিতে হইবে যে আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভগবান।' এই বলিযা নবীনা কিশোবী স্বীয চরণ কমল নবীন কিশোবেব পদ যুগলেব উপব অকুণ্ঠিত চিত্তে সংস্থাপন করিয়া প্রেমেব অসংকোচতা প্রমাণ ক'বলেন।

ভগবানেব ঐশ্বর্য্য সমঞ্জসা বতিমতী রুক্মিণ্যাদি পট্ট মহষীগণকে সম্বস্ত এবং কুণ্ঠিত কবে, কিন্তু সমর্থাব তিমতী শ্রীবাধাকে তাঁহাব প্রেমেব আসন হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত কবিতে পাবে না। রুক্মণী দেবীব নিকট শ্রীকৃষ্ণ যখন ভগবত্তা প্রকাশ কবেন তখন রুক্মিণীদেবী চঞ্চল হইযা পডেন এবং মনে করেন যিনি ভগবান, তিনি নিশ্চয়ই উদাসীন এবং সববিষযে নির্লিপ্ত। তিনি তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন কেবল ধর্ম রক্ষাব নিমিত্ত, অন্য কোন কারণে নয। কিন্তু শ্রীবাধাব সুনির্ভব প্রেম কখন ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে শিথিল হয় না। তাই রুক্মিণ্যাদি পট্ট মহিষীগণের ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে কৃষ্ণ কখন প্রীত হন না। সুনিভব প্রেমের নিকট তিনি অনাদৃত হইয়াও সর্বাপেক্ষা আদৃত।

প্রেমপরীক্ষা (শ্রীকৃষ্ণের অসুস্থতার ভান)

দ্বারকায় অবস্থান কালে শ্রীকৃষ্ণের একবার অসুখ করিয়াছিল। হায়রে, প্রেমের মহিমা, যিনি অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব যাঁহার দেহ দেহী ভেদ নাই, যিনি গুণাতীত, সর্বনিয়ন্তা এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তাঁহার আবার অসুস্থতা।

তাঁহার কি কারণে অসুখ করিয়াছিল তাহা নিরূপণ করা কঠিন। তবে বোধহয় রাধাপ্রেমে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। প্রেমের দ্বারা নায়িকাই যে উন্মাদিনী তাহা নহে, নায়কও সেই প্রকার উন্মাদবেগ গ্রস্ত। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রেমকে সর্বোর্দ্ধে স্থাপন করিয়া দেখাইয়াছেন, যে ভগবান আত্মতৃপ্ত, নির্বিকার এবং বিভুতত্ত্ব হইলেও প্রেমের দ্বারা বিকৃত হন। ইহা বৈষ্ণবীয় প্রেমের মহীয়সী শক্তি। শ্রীরূপ এই প্রকার ভগবানের জয় ঘোষণা করিয়া গাহিয়াছেন—

'জয় জয় বল্লভ রাজ কুমার।
রাধা বক্ষসি হরি মণি হার
রাধা ধৃতি হর সবল তার।
নয়নাঞ্চল কৃত মদন বিকার (গীতাবলী)

প্রসঙ্গ ক্রমে রথযাত্রার নিগূঢ় অর্থ

শুনা যায় পুরীধামে জগৎপতি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবেরও জ্বর হইয়া থাকে। জগন্নাথ দেবের কি কারণে জ্বর হয় তাহা বুঝা যায় না। তবে সাত দিন মন্দির দ্বার বন্ধ থাকে এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে পথ্য প্রদান করা হয়। তৎপরে একদিন তিনি তাঁহার প্রাণপ্রিয়া শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হন এবং সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া কোন এক অজানা দেশের সন্ধানে যাত্রা করেন।

রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্যদেব রথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রথারূঢ় জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মনে করিতেন, যেন তিনি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। রথের সম্মুখে নৃত্য করিতে করিতে এই ধুয়া গান করিতেন —

"সেই ত পরাণ নাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু।
এই ধুয়া গানে নাচেন দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লই ব্রজে যাই এভাব অন্তর" (চৈ. চ ২।১।৫০)

তিনি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া, বিশেষ সুখ অনুভব করিতে পারিতেছেন না। কারণ সেখানে তাঁহার রাজ বেশ, সেখানে রাজধানীর কোলাহল, বহুমূল্য মাণিক্যাদি খচিত রথের উপর তিনি উপবিষ্ট এবং তাঁহার চারিদিকে অসংখ্য হাতী ঘোড় বিরাজিত। এ দৃশ্য তাঁহার নিকট মনোরম বলিয়া বোধ হইতেছে না। তাঁহার মনে পড়িতেছে বৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জের কথা - যে স্থল প্রস্ফুটিত কুসুম সৌরভে আমোদিত, দ্বিরেফ মালার সুমধুর গুঞ্জনে ঝঙ্কৃত, পিককুলের কুহু রবে মুখরিত, বিচিত্র তরুরাজি বিবিধ ফলসম্ভারে অবনত এবং মলয়ানিল প্রাণে প্রেমের শিহরণ জাগাইয়া দিয়া প্রবাহিত। সেই বৃন্দাবনে যদি তাঁহার প্রাণনাথকে পান, তাহলে তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।

তৎপরে চাপল্য ভাবের উদয় বশতঃ তিনি মনে করিলেন যে তাহার প্রাণেশ্বর যা তো যাচ্ছেন কিন্তু তাঁহার তো এখনও কুঞ্জ সংস্কার করা হয় নাই। তাঁহাকে কিভাবে সমাদর করিবেন? তাই তিনি সখীবৃন্দে পরিবেষ্টিতা হইয়া সংমার্জনী হস্তে কুঞ্জ সংস্কার করিতে মনোনিবেশ করিলেন। বিচিত্র পুষ্প মালায় সুশোভিত করিয়া তোরণ দ্বার নির্মাণ করিলেন। শয্যোপরি বৃন্তহীন সুগন্ধি কুসুম আকীর্ণ করিয়া, বিবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া এবং দ্বার দেশে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, প্রাণবল্লভের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন তিনি বাসক সজ্জিকা নায়িকার ভাবে মগ্ন।

তাঁহার আসিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া উতলা হইয়া, সখীর কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সখী কৃষ্ণ তো আর এলেন না। তিনি বোধহয় এখন আমাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।" সখীরা শ্রীমতীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'প্রিয় সখি, তুই এত উতলা হচ্ছিস্ কেন? তিনি যখন বলিয়াছেন যে তিনি আসবেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।" কিয়ৎক্ষণ পরে সখী পুনরায় বলিলেন, "ওই শোন তাঁর রথের ঘর্ঘর শব্দ, ওই তাঁর রথের চূড়া দেখা যাচ্ছে। তাঁর আর আসিবার বিলম্ব নাই।"

শ্রীমতী রাধিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তাঁর রাজ বেশ কেন, আর রথে চড়েই বা আসছেন কেন, পূর্বে কখনতো রথে চড়ে আসেন নাই, তারপর তাঁহার মুরলীই বা কোথায়?" সখী উত্তর করিলেন, "তিনি রাজধানী হতে আসছেন, তাই তাঁর রাজ বেশ এবং অনেক দূর হ'তে আসছেন বলে তিনি রথে করে আসছেন। তবে তোর সঙ্গ লাভ করিলেই তিনি 'গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর' হ'য়ে যাবেন।"

নবম দিবস সেখানে অবস্থান করিয়া যখন জগন্নাথদেব পুনরাগমন করিতেন, তখন লক্ষ্মীদেবী রুষ্টা হইয়া সিংহদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিতেন। তখন মহাকোন্দলের সৃষ্টি হইত। লক্ষ্মীদেবী মন্দিরের উপরিভাগ হইতে জগন্নাথদেবের কার্য্য কলাপ নিরীক্ষণ করিতেন এবং তাঁহার সেবকগণকে বাঁধিয়া আনিতে আদেশ করিতেন। শ্রীমহাপ্রভু এই সকল লীলা দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতেন।

অবশ্য এই সব কথা শুনিয়া অনেকে প্রশ্ন করিবেন, এ আবার রথযাত্রার কি প্রকার ব্যাখ্যা হইল? এযে অদ্ভুত, আজগুবী ব্যাখ্যা, আমরা জন্মাবধি শুনিয়া আসিতেছি, 'রথেতু বামনং দষ্টা পুর্নজন্ম ন বিদ্যতে।' তাহার উপর কবিগুরু লিখিযাছেন—

"রথ যাত্রা লোকারণ্য, মহা ধূমধাম।
ভক্তেরা লুটাযে পথে কবিছে প্রণাম॥
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি।
মূর্তিভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী॥"

বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্যদেব এ প্রকার দৃষ্টিভঙ্গিতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দেখিতেন না। তিনি শ্রীমূর্ত্তিকে স্বয়ং সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহস্বরূপ মনে করিতেন। ইহা পৌত্তলিকতা নয। প্রাণের আবেগে যে ভাবেই তাঁহাকে দেখা যায়, সর্বব্যাপী এবং সর্বান্তর্যামী ভগবান সেই ভাবেই তাঁহার নিকট স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। ইহা ভক্তি অঙ্গের কথা। জগন্নাথদেবকে দেখিযা তাঁহার দুনয়ান হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হইত। রথযাত্রা কালে অসংখ্য ভক্তবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং সপ্ত সম্প্রদায গঠিত করিযা যখন শ্রীচৈতন্যদেব রথাগ্রে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন এবং কীর্ত্তনের মধুর রোলে দিগন্ত মুখরিত করিতেন, তখন রথাস্থত ভগবান শ্রীজগন্নাথদেব যেন হাসিতে হাসিতে চলিতে থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে রথ অচল হইত, কায়িক শক্তি তখন ব্যর্থ হইত। তাঁহার নর্ত্তন, কুর্দন এবং কীর্ত্তনাদি দর্শন এবং শ্রবণ করিলে পর রথ পুনরায় চলিতে থাকিত। যিনি সর্বদা নিগূঢ়ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন, সেই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের পক্ষেই ইহা সম্ভব।

দ্বারকায় নারদমুনির উপস্থিতি

যাহা হউক, কৃষ্ণের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ভক্ত শ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ আসিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কৃষ্ণকে অসুস্থতার কারণ এবং তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন যে যদি তাঁহার কোন ভক্ত তাঁহার

পদধূলি স্বেচ্ছায় তাঁহার মস্তকে অর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি রোগমুক্ত হন।

তখন নারদ মনে করিলেন, যে দ্বারকায় তো কৃষ্ণের অসংখ্য মহিষী আছেন এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহার মধুর রসের ভক্ত। দেখা যাক, তাঁহাদের মধ্যে কেহ স্বীয় পদধূলি কৃষ্ণের মস্তকে দিতে পারেন কিনা।

এই ঔৎসুক্য লইয়া তিনি দ্বারকায় প্রত্যেক মহিষীর নিকট গিয়া পদধূলি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে পদধূলী দিতে স্বীকৃতা হইলেন না। কারণ যিনি তাঁহাদের পতি এমন কি অখিলের পতি তাঁহাকে তাঁহার পত্নী হইয়া কিপ্রকারে নিজের পদধূলি দিতে পারেন। তাহাহইলে যে তাঁহাদের অধর্ম হইবে, কুল ধর্ম নষ্ট হইয়া যাইবে এবং পরিশেষে তাঁহাদিগকে নরকে বাস করিতে হইবে। অতএব তিনি সমঞ্জসা রতিমতী মহিষীদিগের নিকট হইতে পদধূলি আহরণ করা নিষ্ফল বলিয়া মনে করিলেন।

তৎপরে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া যখন পদধূলি সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, তখন নিরাশ হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন, 'প্রভু কোন স্থলেই তো পদধূলি মিলিল না, এখন কি করি বলুন।" তখন কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ব্রজধামে গিয়াছিলে, যদি না গিয়া থাক তাহা হইলে সেখানে গিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ, পাও কিনা।"

শ্রীনারদের ব্রজে গমন

নারদ সকল বিষয়ই জানিতেন বটে, কিন্তু উদ্ধবের ন্যায় তাঁহারও ব্রজপ্রেমের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিলনা। তিনি মধুর বীণা ঝঙ্কারে কৃষ্ণনাম গান করিতে করিতে বৃন্দাবনে গিয়া ব্রজবধূদিগের নিকট কৃষ্ণের অসুস্থতা নিবেদন করিলেন এবং জানাইলেন যে তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ তাঁহার পদধূলি স্বেচ্ছায় এবং অসংকোচিত চিত্তে কৃষ্ণের মস্তকে অর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি রোগমুক্ত হইবেন। আবার তিনি একথা বলিয়াও সতর্ক করিয়া দিলেন যে যাঁহার পদরজঃ পাইবার নিমিত্ত দেবতাবৃন্দ অভিলাষ করিয়া থাকেন, সেই ভগবানের মস্তকে নিজের পদধূলি দিয়া কে আর পাপ সঞ্চয় করিবে? এমন বাতুল আর কে আছে? আমাকেও তিনি পদধূলি দিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমি প্রভুর নগণ্য দাস হইয়া কি করিয়া তাঁহার মস্তকে পদধূলি দিতে পারি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া আসিলাম, কিন্তু কাহারও পদধূলি জোগাড় করিতে পারিলাম না।

ব্রজ হইতে পদধূলি আনয়ন

ব্রজবধূগণ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং পদধূলি দিতে কোন প্রকার ইতস্ততঃ করিলেন না। পদধূলি দিলে তাঁহাদের যত বড় অধর্মই হউক না কেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন ভয় নাই। যদি তাহাতে তাঁহাদের চিরকাল নরকে বাস করিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ। পদধূলি দিলে যদি তাঁহাদের জীবনসর্বস্ব কৃষ্ণ রোগ মুক্ত হন, তাহা হইলে পদধূলি দেওয়াই তাঁহাদের কর্তব্য। সকলেই পদধূলি দিবার নিমিত্ত তাঁহাদের চরণ সম্প্রসারণ করিলেন। তৎপরে সকলকার ইচ্ছায় তাঁহাদের যূথেশ্বরী সর্বশক্তি গরীয়সী শ্রীমতী রাধারাণী অসংকুচিত চিত্তে এবং অবলীলাক্রমে তাঁহার পদধূলি দান করিলেন। নারদ সেই পদধূলি আনয়ন করিয়া কৃষ্ণের মস্তকে অর্পণ করিলেন। বলা বাহুল্য, সেই আকাঙ্ক্ষিত পদরজঃ শিরে ধারণ করিয়া মহা কপটীর অসুস্থতা দূর হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রাধার অসংকোচ প্রেমের মহিমা জগতে বিঘোষিত হইল। ধন্য রাধাপ্রেম, যাঁহার পদরজঃ শিরে ধারণ করিবার জন্য ভগবানের এত আগ্রহ!

মর্যাদা জ্ঞান কোন স্থলে লজ্জিত হইতে পারে, তাহারই অনুরূপ একটী কাহিনী তুলনামূলক হিসাবে এস্থলে বিবৃত হইতেছে।

গোবিন্দের সেবা কাহিনী

শ্রীচৈতন্যদেব যখন নীলাচলে গম্ভীরায় লীলা করিতেছিলেন, তখন সেখানে গোবিন্দ' নামে তাঁহার একজন অনুরক্ত সেবক ছিলেন। তাঁহার সেবা পারিপাট্য অতীব বিচিত্র ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দিবাবসানে আহারের পর বিশ্রাম করিতে যাইতেন, তখন গোবিন্দের দৈনন্দিন কার্য্য ছিল, তাঁহার পাদ সম্বাহন করা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নিদ্রিত না হন। একদিন গোবিন্দ পদ সেবা করিতে গিয়া দেখেন যে তাঁহার প্রভু শয়ন কক্ষের দরজার চৌকাটের উপর মাথা রাখিয়া এবং চরণ দ্বয় ভিতরে ছড়াইয়া দিয়া কপট নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল গোবিন্দের সেবা পরীক্ষা করা।

গোবিন্দ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'প্রভু, আপনি কৃপা করিয়া সরিয়া যান, আমাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিন। আমাকে আমার কার্য্য করিতে দিন।' প্রভু যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তিনি প্রথমে কোন উত্তর দিলেন না। তৎপরে পীড়াপীড়ি করিতে উত্তর দিলেন, 'আমি অতিশয় ক্লান্ত, আমার নড়িবার শক্তি নাই।' গোবিন্দ বলিলেন, 'প্রভু তা'হলে আমি ঘরে প্রবেশ করি কি করিয়া? প্রভু বলিলেন, 'তা আমি জানি না, আমি অতিশয় ক্লান্ত।'

পুনরায় বাদানুবাদ না করিয়া গোবিন্দ তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যথারীতি পাদ সম্বাহন করিতে লাগিলেন। কিছু সময় পর মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গোবিন্দ তোমার আহার হয়েছে কি? রাত্রি যে গভীর হইতে চলিয়াছে।' গোবিন্দ তাহাতে উত্তর দিলেন, 'আমি কি করিয়া যাইব, আপনি যে দ্বারদেশে শুইয়া আছেন।' মহাপ্রভু বলিলেন, 'কেন যেভাবে গিয়াছিলে, সেইভাবে?' গোবিন্দ নীরব রহিলেন।

এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা হইতে আমরা শিক্ষালাভ করি যে প্রভুর প্রীত্যর্থে যে সেবা করা হয়, তাহাতে যদি শাস্ত্র মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয় তাহা হইলে সে বিধি প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য কিন্তু তাহা যদি নিজের স্বার্থে পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা কর্তব্য।

এই দুই কাহিনীর মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় যে ব্রজদেবীগণ কোন বাদানুবাদ তর্ক বিতর্ক বা কোন বিচার বিবেচনা না করিয়া তাঁহাদের পদধূলি স্বেচ্ছায় নারদকে দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ তাঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। তাঁহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই, ভেদ কেবল রসাস্বাদনের নিমিত্ত। ভেদ জ্ঞান আসিলেই বিপর্যয় ঘটে।

রাধা প্রেমের উৎকর্ষ এবং নিত্যসিদ্ধতা

কবি জয়দেব তাঁহার 'গীতগোবিন্দে' রাধাকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য অনর্গল ভাবে লিখিতে লাগিলেন;

"স্থল কমল গঞ্জনং মম হৃদয় রঞ্জনম্
জনিত রতি রঙ্গ পর ভাগম্।
ভন মসৃণ বাণি, করবাণি চরণ দ্বযম
সরস-লসদলক্তকরাগম।
স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম।" (দশমসর্গ মুগ্ধমাধব ৭-৮)

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া তাঁহার লেখনী থামিয়া গেল। তিনি কোনক্রমেই শেষার্দ্ধ পূরণ করিতে পারিলেন না। গ্রন্থে ডোর দিয়া তিনি গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন। মনে কত চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার মনে হইল শ্রীমতীর পদ পল্লব শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে দেওয়া যায় কিনা। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন সরিতেছেনা। অবশ্য স্বাধীন ভর্তৃকা নায়িকা শ্রীরাধার স্থলকমলের শোভাবিনিন্দি রাতুল চরণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সরস অলক্তক রাগে রঞ্জিত করিয়া দিলে, হয়তো কোন দোষ হয় না, কিন্তু শ্রীমতীর চরণ কমল কি করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে অর্পণ করা যায়—ইহা তাঁহার গভীর

সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। তখন তাঁহার ভগবৎঐশ্বর্য্যের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই, ভেদ জ্ঞান অবলুপ্ত হয় নাই, অভেদ মনন আসে নাই।

তৎপরে যখন তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং গ্রন্থ খুলিয়া দেখিলেন যে পদ তিনি পূরণ করিতে লজ্জা, দ্বিধা এবং সংকোচ বোধ করিতেছিলেন, সেই অসম্পূর্ণ পদ কোন্ এক অজ্ঞাত হস্তের তুলিকায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"দেহি পদপল্লব মুদারম্"

একাধারে বিস্ময় এবং আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল।

রসিককবিগণ এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে ভগবানের মুখমণ্ডল তখনই রমণীয়, যখন শ্রীরাধার চরণযাবক তাঁহার কপোলদেশে ঈষৎবিলম্বিতকেশদামকে অপরূপ রূপে রঞ্জিত করিয়া তুলে। তাঁহার বিরাট বক্ষঃস্থল তখনই মনোহর, যখন গোপাঙ্গনাগণের কুচকলস কুঙ্কুম রাগে রঞ্জিত হয়।

শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের বস্তু নির্দেশ এবং আশীর্ব্বাদসূচক শ্লোকের মধ্যে এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে:—

"পদ্মা পয়োধরতটী পরিরম্ভলগ্ন কাশ্মীর মুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদস্বেদাম্বুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ংবঃ॥"

(১ সর্গ ২৬)

গাঢ় আলিঙ্গন কালে শ্রীরাধার স্তন প্রান্তে লগ্ন কুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত, অনঙ্গখেদ জনিত ঘর্মজল প্রবাহে ক্রীড়মান অনুরাগ রূপে প্রকটিত মধুসূদনের বক্ষঃস্থল তোমাদের নিরন্তর প্রিয় সাধন পূর্ণ করুন।

তৎপরে শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'কৃষ্ণকর্ণামৃতের' অপূর্ব ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত নিম্নোক্ত নবম শ্লোকের মাধ্যমে, এই প্রকার ভগবানকে আশ্রয় করিতে চান, যাঁহার পল্লবের ন্যায় অরুণ বর্ণ পাণিপঙ্কজ বেণু বিরাজিত এবং যে বেণু রবে সকলে আকুল হইয়া উঠে, যাঁহার পাদপদ্ম প্রফুল্ল পাটলী পুষ্পকে নিন্দা করে, ব্রজাঙ্গনাগণের চুম্বনাদির দ্বারা যাঁহার অধর উল্লসিত এবং সেই মাধুর্য্যময় অধরের কান্তি শ্রেণীর দ্বারা যাঁহার মুখপদ্ম সরস এবং যাঁহার শ্রীঅঙ্গ বল্লবীগণের আলিঙ্গনে কুচকুঙ্কুমের দ্বারা চর্চ্চিত।

"পল্লবারুণ পাণিপঙ্কজ সঙ্গী বেণুরবাকুলম্।
ফুল্লপাটল পাটলী পরিবাদি পাদসরোরুহম্॥
উল্লসন্মধুরাধরদ্যুতি-মঞ্জরী সরসাননম্।
বল্লবীকুচ কুঙ্কুম-পঙ্কিলং প্রভুমাশ্রয়ে॥" (৯নং শ্লোক)

এই প্রকার ভজনাদর্শ শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত কন্দর্পদেবকে কাম গায়ত্রী দ্বারা ভজন করার সন্ধান তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন। যে ভক্তিরস পূর্বে অজ্ঞাত ছিল এবং যাহা বহুদিন অর্পিত হয় নাই, সেই সর্বোন্নত এবং সর্বোজ্জ্বল মধুর রসময়ী ভক্তি সম্পত্তি জীবকে প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার জগতে অবতরণ। ইহা আনুগত্যময়ীভক্তি। বৈধীভক্তি দ্বারা ভগবানকে পিতৃ মাতৃ জ্ঞানে ভজন করা সাধারণ, কিন্তু রসময়ী ভক্তি অর্থাৎ প্রেমলক্ষণাভক্তি দ্বারা শৃঙ্গাররসরাজকে ভজনা করা অসাধারণ। তাহার অনুগৃহীত আচার্য গণ তাঁহার আদর্শ জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন এবং এই প্রকার ভক্তি অঙ্গের যাচন করিয়াছিলেন।

আমাদের ন্যায় প্রাকৃত বিকারগ্রস্ত লোকের পক্ষে, অপ্রাকৃত লীলায় অবগাহন করা দুষ্কর। যাঁহারা প্রেমের উন্নত কক্ষায় আরোহণ করিয়াছেন, যাহারা কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব সম্যকরূপে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল শৃঙ্গার রসোচিত লীলা আস্বাদন করিতে পারেন।

প্রাপঞ্চিক অনুকরণে অনুষ্ঠিত প্রেমের পথ এতই মসৃণ এবং পিচ্ছিল যে একবার পা পিছলাইলে কামনদে পতিত হইবার সম্ভাবনা। সে কারণ সাধারণ জীবের পক্ষে ভগবত্তার আঁচরকে ধরিয়া এবম্প্রকার লীলাবুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা লৌকিক কাম ক্রীড়ারূপে পরিগণিত হইয়া অপ্রাকৃত প্রেমের সরল এবং পবিত্র পথ পঙ্কিল হইয়া পড়ে। শ্রীশুকদেব গোস্বামী আজীবন নগ্ন ব্রহ্মচারী হইয়াও রাসলীলা বর্ণন করিতে করিতে সাধারণ লোকের মনে যাহাতে এ লীলা কাম ক্রীড়ারূপে অনুভূত না হয়, সে কারণ, 'ভগবান মহাযোগেশ্বর হরি' প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যাত্মক নামের দ্বারা সম্বোধিত এবং বিশেষিত করিয়া জীবের মলিন চিত্তে ভগবত্তার আঁচ জাগাইয়া রাখিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিরাবিল মধুর এবং উজ্জল রসবন্যায় জগতকে প্লাবিত করিয়াছেন।

রাসলীলার উপসংহারে শ্রীশুকদেব গোস্বামী রাসলীলার ফলশ্রুতি বলিলেন—যে ব্যক্তি অতীব শ্রদ্ধাসহকারে ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা নিরন্তর শ্রবণ করেন, তিনি অবিলম্বে কামাদি দুর্বাসনা রূপ হৃদয়ের চির রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন। শ্রীধরস্বামী পাদ রাসলীলার টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে শৃঙ্গার রসকথার ব্যপদেশে অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গ বলিয়া অনুভূত হইলেও ইহাতে নিবৃত্তি মার্গই অনুস্যূত হইয়াছে।

অনেকের ধারণা যে গোপীগণ কাত্যায়নী পূজা করিয়া, চাতুর্মাস্য ব্রত উদযাপন করিয়া এবং পদ্ম বন্ধু সূর্যদেবকে পূজা করিয়া, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিয়া-

ছিলেন। ভক্ত বৎসল শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। সূর্য্য পূজা যে কি ভাবে সম্পাদিত হইত, তাহা কাহারও অজানা নাই। এ যজ্ঞের হাত' শ্রীকৃষ্ণ, উপকরণ কৃষ্ণ, মন্ত্র কৃষ্ণ, পুরোহিত কৃষ্ণ এবং হোতা কৃষ্ণ পাগলিনী শ্রীমতী রাধিকা। গীতার মহাবাণী শ্রীকৃষ্ণ যাহা উচ্চারণ করিয়াছিলেন,"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম" ব্রজ ধামে এবাণী প্রযুক্ত হয় না। এখানকার প্রেমে আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ব'লিয়াছেন :—

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজেতৈছে।
এই প্রেমের অনুরূপ না পারি ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥
রাসোৎসবের ৩২ অধ্যায়ে কৃষ্ণের উক্তি
"ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাম্।
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ
যা মা ভজন্ দুর্জ্জর গেহ শৃঙ্খলাঃ।
সংবৃশ্চ্য তদ্ব প্রতিযাতু সাধুনা॥" (ভাঃ ১০।৩২।২২)
"নিরুপাধি ভজন পরায়ণ মুগ্ধে।
রে সখি, যে মহাভাব বৈদগ্ধো॥
দুর্জ্জর আবাস শৃঙ্খল করি ভঙ্গ।
নিরমল রাগে দান দেযালি সঙ্গ॥
তু সংস্কার ও নিজ সাধু কৃত্য।
সবা সাধু স্বভাবে সফল হউ নিত্য।
যে যৈছে ভজে হাম ভজিব সে রূপ।
মো নিজ মুখবাণী তৈ বৈরূপ॥
অসকত প্রতিদানে মুই প্রেমাধীন।
বহি গেলা সবা পাশ মরু গুরু ঋণ॥"

রাধার প্রেম নিত্য সিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ নহে। সে কারণ কাহারও আরাধনা করিয়া এ প্রেমলভ্য হয় না। শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে অবিভূর্ত হইয়াও এ প্রেমের ঋণ শোধ দিতে পারেন নাই।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রাধাপ্রেমের মাহাত্ম্য নিম্নলিখিত পয়ার ছন্দে ঘোষণা করিয়াছেন ;—

"হলাদিনীর সার অংশ-'প্রেম' তার নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রে.মব পবম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা বাধাঠাকুরাণী॥
প্রে.মব স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ কবে এই কার্য্য তাব॥
মহাভাব চিন্তামণি, বাধাব স্বকপ।
ললিতাদি-সখি তাঁব কায় ব্যহ রূপ। (২৷৮৷১২২-১২৬)

* * *

কৃষ্ণেব উজ্জ্বল বস মৃগমদভব।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবব॥
প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্ল্য বিন্যাস।
ধীরাধীরত্ব গুণ অঙ্গে পট্টবাস
বাগ-তাম্বুল বাগে অধব উজ্জ্বল।
প্রেমকৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল॥
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারি।
এই সব ভাবভূষণ সব অঙ্গে ভবি॥
কিলকিঞ্চিতাদি-বিংশতি ভূষিত।
গুণ শ্রেণী পুষ্প মালা সর্ব্বাঙ্গে পুবিত। (২৷৮৷১৩২-১৩৬)

* * *

কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ অবতংস কানে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে।
কৃষ্ণকে কবায় শ্যামরস মধু পান।
নিবন্তব পূর্ণ কবে কৃষ্ণের সর্ব কাম।
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম বত্নেব আকব।
অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবব॥
যাঁহাব সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁই কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা॥

যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্বতী।
যাঁর পাতিব্রতা ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥
যাঁর সদ্‌গুণের কৃষ্ণ নাহি পান পার।
তাঁর গুণ বর্ণিবে কেমনে জীব ছার ॥ (২।৮।১৪০ – ১৪৫)

*   *   *

ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ-নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি-রাধা ঠাকুরাণী ॥” (২।২৩।৪৫)

দ্বাবিংশ তরঙ্গ

ব্রজের রতি কেবল মধুরা

আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে ব্রজের চতুর্বিধা রতি স্বস্বপ্রকোষ্ঠে আবদ্ধ। এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে যাতায়াতের কোন উপায় নাই। ঠিক যেন 'water tight compartment.' অর্থাৎ এক ঘাটের জল অপর ঘাটে যাইতে পারে না। যাঁদের যেরূপভাব, সেই প্রকার ভাব লইয়া তাঁহারা নিজ নিজ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করেন। ইহা সম্বন্ধানুগাসেবা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে হয় ব্রজের রতি কেবল মাত্র একটী এবং তাহা মধুরা। এ রতির সেবা কামানুগা। অপরাপর রতি এই রতির অনুপূরক এবং পরিপূরক।

মধুরা রতির মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য এই চতুর্বিধা রতির সমস্ত গুণই বর্তমান রহিয়াছে। উপরন্তু মধুরা রতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় লিখিয়াছেন।

"আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥" (২ ৮।৬৮)

যেমন পৃথিবীর মধ্যে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস এই চতুর্বিধ গুণ বর্তমান থাকা ব্যতীত তাহার একটি নিজস্ব গুণ রহিয়াছে এবং তাহা গন্ধ, সেই প্রকার মধুরে চতুর্বিধ রতির গুণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, তাহার একটি নিজস্ব গুণ আছে, যাহা অপর রতির মধ্যে নাই। সে কারণ মধুরের উৎকর্ষ। ইহা সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অশেষ বিশেষ ভাবে সেবা বিধান। এ সেবার কোন গণ্ডী নাই, কোন কিছুর দ্বারা এ সেবা বাধা প্রাপ্ত হয় না। অতএব শৃঙ্গার রস বা মধুর রসকে পরমোজ্জ্বল রস বলা হয়। ইহা মূল রস। কোন কোন পণ্ডিত এ কথাও বলিয়াছেন যে মধুরা রতির পঞ্চ গুণের এক একটি উপাদান লইয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য রতির সৃষ্টি হইয়াছে।

মধুরা রতি বা কান্তা প্রেম যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং রায় রামানন্দের মধ্যে গোদাবরীতীরে যে সাধ্য সাধন তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল এবং যাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত আছে তাহা হইতে সম্যক অবগত হওয়া যায়। রায় রামানন্দ সর্ব শাস্ত্রমর্ম উদঘাটন করিতে করিতে পরিশেষে মধুরা রতিতে বা রাধা প্রেমেগিয়া

উপনীত হইলেন। স্বধর্মাচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণে কর্ম সমর্পণ, সর্ব ধর্মত্যাগ এবং জ্ঞানমিশ্রাভক্তি প্রভৃতিকে একে একে শাস্ত্র বাক্য সমর্থনে সাধ্যসার রূপে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যেকটিকে বাহ্য বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। অর্থাৎ রায় রামানন্দ যতক্ষণ গীতার রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তত ক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তৎপরে যখন তিনি গীতারাজ্য হইতে ভাগবত রাজ্যে উঠিয়া বলিলেন, ভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞানশূণ্যা কেবলা ভক্তি সার। মহাপ্রভু তখন আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'এহো হয় আগে কহ আর।' রায় রামানন্দ তখন ঈপ্সিত সূত্রের সন্ধান পাইয়া, আশান্বিত হইয়া প্রেমভক্তিকে সর্ব্বসাধ্য সার বলিয়া নিরূপণ করিলেন। এই ভক্তির মূলে কোন স্বার্থ বাস না পাই, আমিত্বের গন্ধ নাই আছে কেবল ভগবানকে অসীম মমত্ব বোধে এবং অসীমকে সসীম করিয়া লইয়া ভালবাসা এবং অকৃত্রিম প্রীতিবিধান করা। মহাপ্রভু ইহাকে 'এহো হয়' বলিয়া আরও উন্নত স্তরের কথা শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন রামানন্দ তাঁহার স্বীকৃতি লাভ করিয়া একে একে দাস্য প্রেম, সখ্য প্রেম এবং বাৎসল্য প্রেমকে সাধ্য সার বলিলেন। মহাপ্রভু বাৎসল্য প্রেমকে এহোত্তম বলিয়া রায় রামানন্দকে আরও উর্দ্ধে উঠিতে বলিলেন। রায় রামানন্দ পরিশেষে কান্তা প্রেমকে সাধ্যসার বলিলেন। রাধা প্রেমকে সাধ্য শিরোমণি রূপে প্রতিপন্ন করিয়া তাহার স্বরচিত বিলাস বিবর্ত্ত সূচক একটি গীত শুনাইয়া মহাপ্রভুকে পরিতৃপ্ত করাইলেন। গীতটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। এ সখি। সে সব প্রেম কাহিনী।
অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল॥ কানুঠামে কহবি, বিছুরহ জানি॥
না সো রমণ না হাম রমণী। না খোঁজলুঁ দূতি না খোঁজলুঁ আন।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥ দুঁহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ॥
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেম কি ঐছন রীতি॥"

এই গীতের অর্থ আলোচনা

ইহার কিছু কিছু অংশ রাধার প্রেম মাহাত্ম্য নামক তরঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। এই আধ্যাত্মিক ধর্ম তত্ত্ব বিশ্লেষনের উৎকৃষ্ট পটভূমিকা। এই গীতটীর মধ্যে রাধার সংযোগ এবং বিয়োগ উভয় অবস্থাই বর্ণিত আছে। সে কারণ কেহ কেহ যেমন এই গীতটীকে 'বিলাস বিবর্ত্ত' বলেন, তেমনি কেহ কেহ ইহাকে মাথুর বিরহের গীতও বলেন। প্রথম দুই ছত্র শ্রীরাধার মঞ্জিষ্ঠা রাগের বর্ণনা। মঞ্জিষ্ঠারাগ সম্বন্ধে বিংশ তরঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি মঞ্জিষ্ঠা রাগের নিম্নোক্ত চারিটী প্রধান লক্ষণের কথা

বলিয়াছেন :—(১) দ্রুত সঞ্জাতত্ব (২) উত্তরোত্তর বর্ধন শীলত্ব (৩) অন্যনিরপেক্ষত্ব বা নিরুপাধিকত্ব এবং (৪) অহার্য্যত্ব বা নিত্যত্ব। পহিলহিরাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল অর্থাৎ চোখের পলক পড়িতে না পড়িতে উভয়ের মধ্যে রাগ বা আসক্তি জন্মিল। ইহা মঞ্জিষ্ঠা রাগের দ্রুত সঞ্জাতত্বের লক্ষণ। ইহা অনুদিন বাঢ়ল অর্থাৎ এই অনুরাগ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিদিন বাড়িয়া চলিতে লাগিল। ইহার অবধি বা সীমা রহিল না। ইহা মঞ্জিষ্ঠারাগের অনুদিনবর্ধন বা উত্তরোত্তর বর্ধনশীলত্ব স্বভাবের প্রকাশ। তৃতীয় এবং চতুর্থ ছত্র বিলাস বিবর্ত্ত অর্থাৎ বিলাস মহত্বের পরিচায়ক। ইহা বিলাসের পরিপক্ক অবস্থা। ইহা নিধূত ভেদ ভ্রমের অবস্থা। ইহা পরৈক্য সূচক। 'তুমি' ও 'আমি' এই ভেদ জ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞান উভয়ের বিলাস তন্ময়তায় ডুবিয়া গিয়াছিল। ইহা বিলাস মহত্বের চরম পরাকাষ্ঠা এবং প্রেম বিলাসের পরিপক্কতা। উভয়ের বাসনা কেবল পরস্পর পরস্পরকে সুখীকরা। স্বসুখ বাসনার দ্বারা এ রাগ প্রতিহত হয় না।

উপরন্তু বিলাসের চরমোৎকর্ষ অবস্থা প্রাপ্তি হইলে বিলাস মাত্রৈক তন্ময়তা এতই নিবিড় হয় যে নায়ক নায়িকার কাহারও স্বকীয় অস্তিত্বের বোধ থাকে না। বিবর্ত শব্দের একটি বৈদান্তিক অর্থ আছে যথা "অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা" অর্থাৎ তাঁহারা স্বস্বতত্ত্ব হইতে বিচ্যুত হন না। তাঁহারা নিজ নিজ স্বরূপেই থাকেন, কিন্তু বিলাস মহত্বের এতাদৃশী ক্ষমতা যে তাঁহাদের স্বরূপগত স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকেনা। পরৈক্য ভাবের উদয় হয়। ইহা বিলাসমহত্বের পরিপক্ক অবস্থা। শ্রীজীব গোস্বামী বিবর্ত শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'পরিপাক'। অপর অর্থ ভ্রম এবং বৈপরীত্য। পরিপাক অর্থ অঙ্গী, অপর অর্থ অর্থাৎ ভ্রম এবং বৈপরীত্য ইহার অঙ্গ স্বরূপ। বিলাস বিবর্ত্ত শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবের চরমতম বিকাশ।

শেষের অংশ গুলি শ্রীরাধার বিরহ সূচক। সে কারণ অনেকে ইহাকে মাথুর বিরহ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইহাতে বিরহ জনিত শ্রীরাধার বক্রোক্তি এবং প্রলাপ ও বর্ণিত হইয়াছে। কবিকর্ণপূররচিত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে বর্ণিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন শ্রীরাধা তাঁহার একসখীকে দূতীরূপে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। মথুরা যাইবার প্রাক্কালে তিনি তাঁহার সখীকে শিখাইয়াছিলেন —সখি তুই তাঁকে গিয়া বলিস, যে প্রেম স্বতঃ উদ্বুদ্ধ হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বাড়িতে বাড়িতে সর্বোচ্চ কক্ষায় উন্নীত হইয়াছিল, যাহাতে পরৈক্য ভাবের উদয় হইয়াছিল, এখন তিনি সে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়, আমাদের মিলন সংঘটন করিতে পূর্বে কোন তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতাব প্রয়োজন হয় নাই—এখন কি না সেই প্রেমকে পুনরায় স্থাপন করিবার জন্য তোকে দূতী করিয়া পাঠাইতে হইল

ইহা অতিশয় পরিতাপের বিষয়। 'না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন' ইহা মঞ্জিষ্ঠা রাগের অন্য নিরপেক্ষত্ব স্বভাব। শেষ ছত্রটী শ্রীরাধার বক্রোক্তি—শ্রীরাধা পরিহাস এবং দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "উত্তম বিদগ্ধ নাগরের এইরূপ নিয়মই বটে—" অনুরাগের প্রেরণায় প্রথমে মিলিত হওয়া এবং পরিণামে সব কথা ভুলিয়া যাওয়া উত্তম নাগরের প্রেমের রীতিই বটে।

যাহা হউক এই গীতটীকে সংযোগ অবস্থার গীত এবং বিয়োগ অবস্থার গীত দুই ভাবেই লওয়া যাইতে পারে, কারণ সংযোগে ও বিয়োগের অবস্থা যথা অহেতুক মান, প্রেম বৈচিত্ত্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং বিয়োগ দশায় প্রলাপোক্তির মধ্যেও সংযোগের মধুর স্মৃতি হৃদয়ে জাগরিত হয়। এই গীতের মধ্যে অনেকে পূর্ব্বানুরাগ, কলহান্তরিতা প্রভৃতি নায়িকার বহুবিধ লক্ষণ আছে বলিয়া মনে করেন। উপরন্তু এই গীতটী শ্রীরাধার প্রেমের নিত্যত্ব অর্থাৎ শ্রীরাধার মাঞ্জিষ্ঠ রাগের নিত্যত্ব প্রমাণ করে। এই গীতি কবিতায় শ্রীরাধার মাঞ্জিষ্ঠ রাগের চতুর্বিধ লক্ষণ প্রকাশমান, উপরন্তু বিরহের প্রলাপোক্তিপ্রভৃতি ভাব নিচয় নিহিত আছে।

অতএব বহুবিধভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে শ্রীরাধার মধুরা রতি শ্রেষ্ঠারতি। ইহাতে কোন কাম গন্ধ নাই, স্বসুখ বাসনার স্থান নাই, ভগবদৈশ্বর্য্যের দ্বারা এ রতির সেবা বাধা প্রাপ্ত হয় না। ভগবানকে মধুর জ্ঞানে আপন করিয়া লইয়া সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে সেবাবিধান করা এই রতির কার্য। এখন অপরাপর রতি ইহার অনুপূরক এবং পরিপূরক কি প্রকারে হইতে পারে, ইহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

প্রথমতঃ দাস্য রতি—দাস্য রতি সকল রতির মধ্যে জড়িত, কি সখ্যে কি বাৎসল্যে কি মধুরে সকল রতির মধ্যে দাস্যের সেবা রহিয়াছে। ইহা স্বর্ণতন্তুর ন্যায় সর্ব রতির মধ্যে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত আছে—অপরের কী কথা, এমন কি নন্দ যশোদা যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুরু স্থানীয় এবং পিতা মাতা বলিয়া অভিমান করিতেন, কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদিগকেও 'কৃষ্ণদাস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দাস্য ভাব পর পর রতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেই সেই রতির রং এ উপরঞ্জিত হয় এবং পরিশেষে মধুরে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব মাধুর্য্য মণ্ডিত হইয়াউঠে।

দ্বিতীয়তঃ—সখ্য রসের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুরা রতির অর্থাৎ রাধিকার প্রেম মাধুর্য আস্বাদন করিতেন। অর্জ্জুন, সুবল, মধু মঙ্গল প্রভৃতি নর্মসখাবৃন্দে পরিবৃত হইয়া তিনি মধুরা রতির আনন্দ উপভোগ করিতেন। গোষ্ঠ গমন কালে তাঁহার

অভিনব বেশ, প্রেমসম্পুটিত দৃষ্টি সঞ্চারণ, বাম বাহু সখাদের স্কন্ধে অর্পণ, দক্ষিণ বাহুর দ্বারা লীলাকমল সঞ্চালন প্রভৃতি অপূর্ব্ব ভাব ভঙ্গি মধুরা রতির উদ্দীপন ভাব বিষয়ক।

কৃষ্ণ সখা বৃন্দ সমভিব্যাহারে গোচাবণে যাইতেন। সেখানে সখাদের সঙ্গে বিবিধ ক্রীড়া কৌতুক করিতেন, তথাপি তন্মধ্য দিযা রাধিকার প্রেম নির্যাস আস্বাদন করিতেন। গোষ্ঠের মধ্যে রাধিকাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রবল উৎকণ্ঠার উদয় হইত এবং রাধিকাও সূর্য পূজার ছলে গোষ্ঠে আগমন করিয়া কান্তকে সন্দর্শন করিতেন। আবার যখন গোধূলি লগ্নে, বেনু নাদে, ধেনু সমভিব্যাহারে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন, তখন ব্রজ যুবতীগণ চন্দ্র শালিকার উপর হইতে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিতেন এবং কৃষ্ণও তাঁহাদের মুখপদ্ম এবং কুচদ্বন্দ্বেদিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেন। মনে হইত তিনি কতযুগ ধবিযা তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিতে পারেন নি। ব্রজ যুবতীগণেরও তাদৃশী অবস্থা। গোখুবোত্থিত, ধূলি ধুসরিত কুঞ্চিত কেশ দামে পরিব্যাপ্ত মনোহর বদন সৌন্দর্য দর্শন করিয়া তাঁহারাও মদনাভিষিক্ত হইয়া অপলক দৃষ্টিতে তাহার বদন সুধা পান করিতেন।

কৃষ্ণের সখা দিগের শ্রেণীবিভাগ

কৃষ্ণের সখাদিগকে চারি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে যথা সুহৃৎ, সখা, প্রিয সখ এবং প্রিয নর্মসখা। যাহারা সুহৃৎ তাহাদের বয়স কৃষ্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। তাঁহারা কৃষ্ণকে বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করেন এবং গোষ্ঠ গমন কালে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে থাকেন। যথা সুভদ্র, মণ্ডিভদ্র বিজয় গোভট্ট প্রভৃতি। সে কারণ তাহাদের সখ্যেব মধ্যে বাৎসল্য ভাব মিশ্রিত আছে। যাহারা সখা তাঁহাবা কৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিৎ কনিষ্ঠ। কৃষ্ণের অঙ্গ সেবা বিষযে তাঁহাদেব বিশেষ আগ্রহ। অতএব তাঁহাদের সখ্যে কিঞ্চিৎ গৌববময় দাস্যের গন্ধ বহিযাছে। যথা বিশাল, বৃষভ, দেবপ্রস্থ কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ করন্ধম প্রভৃতি। প্রিয় সখাদের বয়স কৃষ্ণের সমান এবং তাঁহাদেব ভাব গৌরব সম্ভ্রমহীনবিশ্রম্ভ প্রধান শুদ্ধ সখ্যভাব। যথা দাম, শ্রীদাম, সুদাম, কিঙ্কিনী বসুদাম ইত্যাদি। শ্রীরূপ গোস্বামীর মতে শ্রীদাম, দাম, সুদাম, বসুদাম, ও কিঙ্কিনী ইঁহাবা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয নর্মসখা রূপেও পরিগণিত। গৌতমীয তন্ত্রানুসারে তাঁহাবা শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণ স্বরূপ। প্রিয বয়স্য দিগের মধ্যে শ্রীদাম প্রধান। তাঁহারা তাঁহাদের অর্ধভুক্ত ফল সুমিষ্ট লাগিলে কৃষ্ণকে খাইতেদিতেন। তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত লড়াই করিতেন এবং হারিলে কৃষ্ণকে কাঁধে করিতেন এবং জিতিলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কাঁধে বহন করিতেন।

প্রিয় নর্মসখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজযুবতীগণের মিলনের আনুকূল্য করিতেন। তাঁহারা অন্যান্য সখাবৃন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ। উজ্জ্বল নীলমণি প্রিয় নর্মসখার সংজ্ঞা দিয়াছেন যাঁহারা আত্যন্তিক রহস্যবেত্তা সখীভাবাশ্রিত এবং প্রণয়িগণ মধ্যে পরিগণিত। গোকুলে সুবল অর্জ্জুন, মধুমঙ্গল, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত, উজ্জ্বলাদি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্ম সখা। ভক্তি রসামৃত সিন্ধু বলেন, ইহাদের মধ্যে সুবল ও অর্জ্জুন সর্ব্বপ্রধান। উজ্জ্বল নীলমণি সুবলের ভাগ্যাতিশয্যের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, সুবল কৃষ্ণের কোন্ সেবায় না অধিকার পাইয়াছেন? কৃষ্ণকান্তাগণ কলহ করতঃ প্রস্থান করিলে সুবল বিবিধ অনুনয়ে তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া আনয়ন করেন। কুঞ্জ গৃহে শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্প লীলার উপযোগি শয্যা রচনা করেন এবং স্মরবিলাসে স্বেদযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ার বক্ষে স্থাপিতাঙ্গ উত্তম রূপে বীজন করেন। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে কৃষ্ণকে মিথ্যা কথা বলিয়া আনয়ন করেন এবং রাধার সহিত মিলন ঘটাইয়া দেন।

সখ্য রতি সাধারণতঃ অনুরাগপর্য্যন্ত বর্ধিত হয় কিন্তু তাঁহার রতি অনুরাগ সীমা অতিক্রম করিয়া ভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। অতএব দেখা যায় যে সখ্য রতি মধুরা রতির পুষ্টি বিধায়ক এবং মধুরা রতির দিকে তাহার প্রবণতা আছে।

তৎপরে বাৎসল্য রস বাৎসল্য রতি কি প্রকারে মধুরা রতির অনুপূরক এবং পরিপূরক হইতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, কারণ এই দুটি রতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাৎসল্য রতি মধুরা রতির কি প্রকারে পুষ্টি বিধান করে তাহা অনুধাবন করিবার নিমিত্ত প্রাথমিক ভাবে একটি লীলা কাহিনী বিবৃত হইতেছে।

রসালা গৃহের মধ্যে অনবগুণ্ঠিতা শ্রীমতী রাধারাণী অকুণ্ঠিত চিত্তে কান্তের জন্য নানা বিধ ভোজ্য দ্রব্য পাক করিতেছেন। দাসী পশ্চাতে বসিয়া মশলা প্রস্তুত করিতেছেন। অনতিদূরে মা যশোমতী কৃষ্ণের জন্য রন্ধন কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন। এমন সময়ে গবাক্ষ দ্বারে নাগরের সহসা আগমন। দাসী তাঁহাকে দেখিয়া থম কথা মৃদুহাস্যে কি যেন বলিতে যাইতেছেন, অমনি নাগর তাহাকে নিষেধ করিতেছেন, যাহাতে এদর্শনের সুযোগ হইতে তিনি বঞ্চিত না হন। নাগরের চপল দৃষ্টির মধুর জ্যোতিঃ যেমন নাগরীর অচঞ্চল উন্মুক্ত বদনে গিয়া পড়িল, অমনি বাম নায়িকার কুণ্ঠা জাগিয়া উঠিল। অনবগুণ্ঠিতা তখন কুণ্ঠিতা হইয়া নাগরকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'ছিঃ, মা যে অনতিদূরে দণ্ডায়মানা, আর তুমি এতই নির্লজ্জ হয়ে, গোপনে রন্ধন শালার গবাক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত। মা যদি দেখেন তাহলে তিনি কি মনে করিবেন। তখন আমাদের লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবেনা।"

অপ্রাপঞ্চিক লীলা প্রাপঞ্চিক ছাঁচে ঢালা বলিয়া আমাদের মনে অতিশয় কদর্য

বলিয়া মনে হয়। কারণ আমরা এই সকল লীলা প্রাকৃত গুণে অনুরঞ্জিত করিয়া দেখি, ফলে আমরা পংভ্রষ্ট হইয়া লীলা মাধুর্য আস্বাদন করা তো দূরের কথা, প্রাকৃত পঙ্কিল হ্রদে পড়িয়া নিমজ্জিত হই। ইহা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। অপ্রাকৃত শৃঙ্গার রস মনবুদ্ধিরঅগোচর। তবে একথা আমরা মনে করিতে পারি যে শৃঙ্গার রসের হেয় অর্থ কখনও ভগবৎ স্বরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না। অপ্রাকৃত শৃঙ্গার রসোচিত লীলার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, ভগবত্তার আঁচকে হৃদয়ের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে হইবে, একথা পূর্বেও নানাস্থলে বলা হইয়াছে। আঁচ নিষ্প্রভ হইলেই কামনদে পড়িবার সম্ভাবনা। পরীক্ষিতের ন্যায় শ্রোতাকেও ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেবকে বহু প্রশ্ন করিতে হইয়াছিল। শ্রীশুকদেব পরিশেষে বলিলেন;

"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামেব দেহিনাং।
যোহন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ এষ ক্রীড়ন দেহভাক্॥"

(ভাঃ রাসলীলা পঞ্চম অধ্যায় ৩৫ শ্লোক)

গোপীগণ, তাঁহাদের পতিগণ এবং সকল দেহীর হৃদয়ে নিয়ন্তারূপে যিনি বিরাজমান, সেই সর্বাধ্যক্ষ সর্ব্বসাক্ষী ভগবান কেবল ক্রীড়ার জন্য দেহ ধারণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, ইহার দ্বারা মনে হয় বাৎসল্য রতিও মধুরা রতির পুষ্টি বিধায়ক। যদি কুণ্ঠা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি বিজড়িত না থাকে তাহা হইলে প্রেমের বৈচিত্র্য হয় না। আর রতি যদি পরকীয়া না হয়, তাহাহইলে রসের উল্লাস বর্ধিত হয় না। যেখানে বিবিধ বাধা নিষেধ নিহিত আছে এবং যেখানে কামনা প্রচ্ছন্ন এবং সংগোপিত, তাহাই শৃঙ্গার রসের পরমোৎকর্ষ। তবে ইহা ধারণা করা সমীচীন নহে যে ইহা জুগুপ্সিত পরকীয়া রস। ইহা স্বকীয়ায় পরকীয়া অভিমান এবং পরকীয়ার স্বকীয়ায় পর্য্যবসান। ইহা নিজের আনন্দ নিজেই অনুভব করা। এখানেও ভগবানের আত্মারামতা বিদ্যমান আছে এবং তাহা সুদৃঢ় প্রেমের আধারের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত।

প্রসঙ্গ ক্রমে, উল্লিখিত হইতেছে যে নিত্য স্বকীয়াত্ব এবং নিত্য পরকীয়াত্ব সম্বন্ধ লইয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি প্রমুখ নিত্য পরকীয়াবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে কি প্রকট কি অপ্রকট উভয় লীলার মধ্যে যে পরকীয়া সম্বন্ধ নিত্য দৃষ্ট হয়, তাহা মায়া প্রত্যায়িত এবং অবাস্তব নহে। ইহা নিত্য। তাঁহারা প্রকট লীলা এবং অপ্রকট লীলার মধ্যে কোন স্বরূপগত ভেদ স্বীকার করেন না।

কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রমুখ মহাপ্রভুর অনুগত আচার্য্যগণ

নির্ণয় করিয়াছেন যে প্রকট লীলায় পরকীয়াত্বের যে প্রতীতি তাহা কেবল রস পুষ্টির নিমিত্ত। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি যোগমায়ার দ্বারা প্রত্যায়িত। প্রবল উৎকণ্ঠা জাগাইবার নিমিত্ত, রসের পরম উল্লাস বর্ধন করিবার নিমিত্ত এবং পরম পুরুষার্থের প্রয়োজন নিমিত্ত নিজপত্নীসুলভ প্রেমরসকে যোগমায়ার দ্বারা পরদারত্বে প্রত্যায়িত করা হইয়াছে। প্রকট লীলায় ব্রজ গোপিগণের সহিত যে পরদার স্বরূপে প্রেমব্যবহার লক্ষিত হয়, অপ্রকট লীলা ধামে অর্থাৎ গোলোকে সেই গোপাঙ্গনা বৃন্দের সহিত স্বকান্তারূপে প্রেমব্যবহার প্রদর্শিত হয়। ব্রহ্ম সংহিতায় 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ' এবং 'আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভিঃ' ইত্যাদি বহু শ্লোক হইতে তাঁহারা প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভ, আর্য্যপুত্র প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকায়, এবং সেই সকল শব্দের অর্থস্বামী বুঝায় এবং সর্বশেষে 'কৃষ্ণবধ্বঃ' শব্দের অর্থ কৃষ্ণের বধূ অর্থাৎ পরিণীতাস্ত্রী ইহার এই অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা স্বকীয়াবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দুর্বাসা মুনি ব্রজবধূগণকে 'কৃষ্ণের সামগ্রী' বলিয়াছেন। স্বকীয়াবাদিগণ ইহার অর্থ করিয়াছেন বিবাহিতাপত্নী। যিনি বৃষভানু সুতা বলিয়া জগতে বিদিতা, সেই নায়িকা শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ সন্দোহময়ী হ্লাদিনী শক্তিরূপা এবং তাঁহার একান্ত বল্লভা। ইহা শক্তিমানের স্বকীয়া শক্তির লীলা বৈচিত্র্য। ইহা স্বস্বরূপস্থ রসের আস্বাদন ব্যতীত আর কিছু নহে। কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন,

"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥" (১।৪।৪২)

প্রকটলীলা ব্যতীত এ রসের অন্যত্র অর্থাৎ অপ্রকট লীলায় স্থান নেই। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার গোপালচম্পূ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে দন্ত বক্র বধ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রবিধিমতে নন্দ যশোদা, বৃষভানুরাজা প্রভৃতি সকল ব্রজবাসীর সম্মুখে মহা আড়ম্বরের সহিত ব্রজকান্তাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিমন্যু, গোবর্ধন মল্ল প্রভৃতি যাঁহারা রাধা এবং চন্দ্রাবলীর পতি বলিয়া মনে করিতেন, তাঁদের মায়িক স্মৃতি চিরতরে বিদূরিত হইল। যোগমায়া দেবী তাঁর মায়াজাল গুটাইয়া লইলেন এবং সেই সঙ্গে পরকীয়াত্ব বোধের নিরসন হইল। তৎপরে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে লইয়া অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করিলেন। ইহা পূর্বেও অন্যত্র উক্ত হইয়াছে। ললিত মাধব নাটকে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগপ্রকরণে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রকটলীলার অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ কাহিনী বর্ণনা করিয়া পরকীয়াত্বকে স্বকীয়াত্বে পর্য্যবসান করিয়াছেন। মনে হয়, ইহা

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অনুমোদিত ছিল। কারণ এই গ্রন্থ তাঁহার সময়ে লিখিত এবং আলোচিত হইয়াছিল।

কিন্তু শ্রীলবিশ্বনাথ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাঁহারা নিত্য পরকীয়াত্ব স্থাপন করিতে আগ্রহশীল, তাঁহারা বহু শাস্ত্র বচন উদ্ধার করিয়া এবং ভাগবতে জার ধর্মের কথাই বর্ণিত হইয়াছে এবং কোন স্থলে তাহা খণ্ডিত হয় নাই, এই বলিয়া তাঁহারা পরকীয়া বাদের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর ন্যায় পরমপণ্ডিত তৎকালে আর কেহ ছিলেন না এবং অদ্যাপি আছেন কিনা সন্দেহ, সে কারণ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি মহাশয় তাঁহাকে স্বদলভুক্ত করিবার উদ্দেশে তাঁহার 'আনন্দ চন্দ্রিকা' টীকা নাম্নী উজ্জ্বল নীলমণির টীকায় প্রথমতঃ পরম পূজ্য শ্রীজীব গোস্বামীকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীজীব তাঁহার উজ্জ্বল নীলমণির 'লোচন রোচনী' টীকার উপসংহারে লিখিয়াছেন, আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি তাহার কিয়দংশ আমার স্বেচ্ছা-প্রণোদিত এবং কিয়দংশ পরেচ্ছা প্রণোদিত। যে অংশে পূর্বাপর সমন্বয় অব্যাহত আছে, তাহা আমার স্বেচ্ছালিখিত এবং তদ্বিরুদ্ধাংশই পরেচ্ছা প্রণোদিত। এই কারিকা আমার সকল সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিয়া নিত্য পরকীয়া বাদে দৃঢ় বিশ্বাস আনয়ন করিয়াছে।

কারিকাটী নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎপূর্বাপর সম্বন্ধং তৎপূর্বমপরং পরম্।" ইতি

কিন্তু স্বকীয়াবাদিগণ বলেন যে ইহা প্রক্ষিপ্ত, হস্তলিখিত পুথিতে এই শ্লোক নাই। 'সারসংগ্রহ' নামক একখানি পুরাতন গ্রন্থে এই কারিকাটীর উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ কাহিনী নামক পুস্তকে উক্ত আছে যে স্বকীয়া এবং পরকীয়া বাদ লইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব জাফরআলির দরবারে পণ্ডিত মণ্ডলীর একসভা হইয়াছিল। শ্রীরূপদেব নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জয়পুর হইতে দিল্লীশ্বরের পরোয়ানা লইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে আসিয়া 'স্বকীয়া এবং পরকীয়া বাদ' লইয়া বিচারপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ছয়মাস পর্য্যন্ত বিবিধ বৈষ্ণব শাস্ত্র লইয়া স্বকীয়া এবং পরকীয়া বাদের বিচার হইয়াছিল এবং পরিশেষে পরকীয় বাদ সংস্থাপিত হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অজয়পত্র স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছিলেন, এবং সে সাক্ষরপত্র অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইহা প্রকট লীলা কি অপ্রকটলীলা লইয়া হইয়াছিল, তাহার সঠিক

প্রমাণ নাই। উপরন্তু ইহার মধ্যে বহু স্ববিরোধি যুক্তি আছে, গবেষকগণ তাহা বাহির করিয়াছেন।

যাহা হউক, যাঁহারা যুগলের ভজনা করেন, তাঁহাদের চিত্তে যদি জাগরুক থাকে যে ইহা জুগুপ্সিত রস তাহা হইলে তাঁহাদের ভজন বিঘ্নিত হয়। উপরন্তু পরকীয়ায় দ্বিধা, কুণ্ঠা লজ্জাভয় জড়িত থাকায় যুগলের নিশ্চিন্ত, শাশ্বত এবং সমৃদ্ধি মান সম্ভোগ হয়না। স্বকীয়া বাদ প্রতিষ্ঠিত না হইলে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হয়না।

উপরের কারিকাটী শ্রীজীব গোস্বামীর লিখিতকিনা সেবিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ থাকে, কারণ পরকীয়া বাদই যদি তাঁহার অভিমত হয় তাহা হইলে তিনি এত পরিশ্রম করিয়া, পুরাণাদি হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া গোপালচম্পূ নামক মহাগ্রন্থ লিখিলেন কেন? এই গ্রন্থটি পরকীয়া বাদের নিরসন এবং স্বকীয়া বাদের স্থাপন। এ সম্বন্ধে ২য় খণ্ডে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল।

যাহা হউক, বাৎসল্য রতির মধ্যে মধুরারতির যে ছায়াপাত রহিয়াছে তাহা প্রাচীন বহু শ্লোকের মধ্যে দৃষ্ট হয়। কবি জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দ কাব্যে বাসন্ত রাসের বর্ণনা করিতে গিয়া উপক্রমণিকায় বর্ষা ঋতুর বর্ণনা করিয়া একটি রহস্যময় শ্লোকের অবতারণা করিলেন। শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমম্
রাধা মাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥"

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বনভূমি তমাল বৃক্ষে শ্যামায়মান। এই বালক ভীতি পরায়ণ হইয়াছে। অতএব হেরাধে! ইহাকে গৃহে লইয়া যাও। গোপরাজ নন্দের এই আদেশানুসারে নির্জন পথের কুঞ্জ বিটপীর তলে তাঁহারা উভয়ে গমন করিলেন এবং তথায় নিভৃতে শিশুকৃষ্ণ অচিন্ত্য শক্তি বলে কৈশোর রূপ ধারণ করিয়া কুঞ্জ কেলি করিলেন। রাধা কৃষ্ণের যমুনাকূলের এই নিভৃত কেলিবিলাস জয়যুক্ত হউন।

বাৎসল্য রসের মধ্যে মধুরারতি আসিয়া পড়িলে, রস বিরোধ হয় মনে করিয়া অনেকে মন্তব্য করেন যে ইহা গোপরাজনন্দের উক্তি নহে। ইহা কোন সখীর উক্তি এবং 'নন্দ নিদেশতঃ' শব্দের ব্যাখ্যা করেন 'আনন্দ নিবন্ধন।'

ব্রহ্মা বৈবর্ত্ত পুরাণ; গর্গসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে শিশু কৃষ্ণের শ্রীরাধি-

কার সহিত নির্জন বনমধ্যে ব্রহ্মা কর্তৃক বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা অতিশয় গোপনীয় এবং কুহেলিকাপূর্ণ। মনে হয়, এই কাহিনী অবলম্বনে কবি জয়দেব তাঁহার শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন। আরও মনে হয় পরকীয়া রস বর্ণন করিতে গিয়া তিনি প্রথমেই রাধা যে কৃষ্ণের স্বকীয়া এবং তাহা সংগোপনে এবং অলক্ষিতে রহিয়াছে প্রকারান্তরে তাহাই দেখাইয়াছেন। এমন অনেক প্রাচীন শ্লোক আছে যাহা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে বাৎসল্য রতি অলক্ষিত ভাবে মধুরা রতির পরিপোষণ করিতেছে। অনুরূপ একটি শ্লোক পদ্যাবলী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"আহূতাদ্য মহোৎসবে, নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ প্রৈষ্যজনঃ, কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি ?
বৎস, ত্বংতদিমাং নয়ালয়ম্ ইতি শ্রুত্বা যশোদা গিরো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥"

এস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে মা যশোদা শ্রীরাধা কুলবধূ হইয়া রাত্রিতে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া একাকী রহিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণকে আদেশ করিলেন, 'বৎস তুমি তুমি উহাকে আমাদের আলয়ে লইয়া এস।' মা যশোমতীর এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাস্যস্ফুটিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে লইয়া আসিলেন। এবম্প্রকার শ্রীরাধামাধব জয়যুক্ত হউন।

ইহা শ্রীজয়দেব কৃত 'মেঘৈর্মেদুর' শ্লোকের পাল্টা পাল্টি উক্তি। মা যশোদা শ্রীরাধিকাকে পুত্রবধূজ্ঞানে সময়ে সময়ে আলিঙ্গন, চুম্বন প্রভৃতি সস্নেহ ব্যবহার করিতেন।

মনে হয়,এখানেও মা যশোদা অজ্ঞাতসারে রাধামাধবের মিলনের সহায়তা করিতেছেন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বকীয়াত্বই স্থাপন করিতেছেন। 'নন্দনিদেশতঃ' শব্দের পরিবর্তে 'যশোদা গিরঃ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া এই শ্লোকটী কবি জয়দেবের শ্লোকের প্রত্যুত্তর বা প্রতিধ্বনি বলিয়া বোধ হয়। এখানে নন্দ 'নিদেশতঃ' বাক্যের ন্যায় 'যশোদাগিরঃ বাক্যের দ্বর্থক অর্থ করা যায় না। তবে অনেকে যশোদাগিরঃ শব্দের অন্য অর্থ করিয়াছেন 'যশোদাযুক্ত বাক্য।'

লক্ষণসেনের সময়ে বঙ্গদেশে অনেক যশস্বী কবি ছিলেন। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের মিলন সম্বন্ধীয় বহু শ্লোক রচনা করিয়াছেন। সে সময় কবিদিগের মধ্যে কাব্য প্রতিযোগিতা হইত। তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কাব্য কলা প্রদর্শন। সিদ্ধান্ত বিরোধ বা রসাভাস যে তাহাদের মধ্যে ছিল না তাহা নহে। কিন্তু উক্ত শ্লোকটী রূপ

গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ইহা তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

এই প্রকার আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে অপরাপর রতি মধুরা রতির আনুকূল্য বিধায়ক। এমনকি অন্যান্য ধামের যে মধুরা রতি অর্থাৎ দ্বারকা এবং মথুরা ধামের রতি তাহাও ব্রজের মধুরা রতির পরিপূরক এবং রাধা প্রেমের মহিমা জ্ঞাপক। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি পট্টমহিষীগণে পরিবৃত থাকিলেও তাঁহাদের প্রেমের মধ্য দিয়া রাধার অতুলনীয় প্রেম মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেন। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাইতেন সেখানেও রাধাপ্রেমেরস্মৃতি বক্ষেকরিয়া। সেখানেও তাঁহার বিভ্রমশীলতা প্রকাশ পাইত। বিল্বমঙ্গলের একটি শ্লোকে এবম্প্রকার বিভ্রমের একটি মনোরম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

"রাধামো ন মন্দিরাদুপগত শ্চন্দ্রাবলী মুচিবান্
রাধে ক্ষেমমিহেতি তস্য বচনং তদাহ চন্দ্রাবলী।
কংসক্ষেমমযে, বিমুগ্ধ হৃদযে কংসঃক দৃষ্টস্ত্বযা
রাধা ক্কেতি বিলজ্জিতে নতমুখঃ স্মেরে'হরিঃ পাতুবঃ॥

রাধামোহননামক কোন এক মন্দির হইতে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে সমাগত হইয়া রাধা ভ্রমে চন্দ্রাবলীকে সম্বোধন করিলেন, 'হে রাধে। তোমার কুশল তো? তচ্ছ্রবনে চন্দ্রাবলী বলিলেন, 'ওহেকংস তোমার মঙ্গল তো?' শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অযে বিমুগ্ধ হৃদযে' তুমি কংসকে কোথায় দেখিলে?' তখন চন্দ্রাবলী বলিলেন, তোমার রাধাই বা কোথায়?' ইহা দ্বারা প্রতীতি হয় যে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে সেখানে প্রেম রস নির্যাস আস্বাদন করিতে গিয়াছেন, সেইখানেই রাধা প্রেমে বিভ্রান্ত এবং বিভোর হইয়া বিশুদ্ধ রাধা প্রেম মাধুর্যই অন্তরে অন্তরে আস্বাদন করিয়াছেন এবং রাধা প্রেমের বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন।

এতদ্বারা বুঝাযায়, যে ব্রজের রতি বলিতে কেবল মধুর রতিকেই বুঝায়। অপরাপর রতি মধুরা রতির পরিপোষক রূপে অবস্থিত এবং উন্নতোজ্জ্বল শৃঙ্গার রসের বৈচিত্র্য সৃজনে প্রযুক্ত। মধুরারতিতে চতুর্বিধ রতি বিরাজ মান। সুতরাং মধুরা রতি আদি এবং অপরাপর রতি ইহার অংশস্বরূপ।

ত্রয়োবিংশ তরঙ্গ

বনসভ্যতা বা নগ্ন সভ্যতার ঐতিহ্য

ফ্রান্সের বিখ্যাত সমালোচক মিষ্টার রুসো কৃত্রিম সভ্যতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া প্রাণের আবেগে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, 'Primitive barbarism is the golden civilisation' অর্থাৎ আদিম যুগের বর্বরতা মানবের চরম সভ্যতা। আধুনিক মারণাস্ত্রের যুগে যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে হয়তো আরও কত কি বলিয়া ফেলিতেন। তাঁহার এই বিরোধাত্মক উক্তি কাহারও মনঃপূত হয় নাই বটে কিন্তু তাহার এই উক্তির সহিত ভারতের প্রাচীন সভ্যতার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

আরণ্যক সভ্যতা

আমাদের দেশের ঋষি পুরুষেরা অরণ্যে বাস করিতেন। অরণ্যে কুটীর নির্মাণ করিয়া নির্জনে শাস্ত্রালোচনা করিতেন। বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিতেন এবং ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। গুম্ফ এবং শ্মশ্রু ধারণ করিতেন। পরিধানে বল্কলের কৌপীন, হস্তে কমণ্ডলু এবং সর্বগাত্র এক প্রকার নগ্ন। আজকাল গুম্ফ এবং শ্মশ্রু ধারণ করা রুচি বহির্ভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইদানীং কালেও বহু গণ্যমান্য, যশস্বী ব্যক্তি দীর্ঘ শ্মশ্রু ধারণ করিতেন এবং তাহাতে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ না হইয়া বরং পরিবর্ধিত হইত।

তাঁহারা আমাদিগকে যে কৃষ্টি এবং সভ্যতা দান করিয়া গিয়াছেন, যে সভ্যতার আলোকরশ্মি পাইয়া আমরা এখনও গৌরব অনুভব করিতেছি, এবং যে সভ্যতার জন্য আমরা বিশ্বের দরবারে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছি, সে সভ্যতা অরণ্য হইতে জাত। কিন্তু ইহা জঙ্গলে সভ্যতা নহে। জঙ্গলে সভ্যতা বলিতে মারামারি, কাটাকাটি বুঝায়, কিন্তু এ বনসভ্যতার মধ্যে ছিল মৈত্রী এবং প্রেমের বন্ধন। হিংস্র প্রকৃতির জন্তুরা পর্যন্ত তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া হিংসা ভুলিয়া গিয়া নম্র স্বভাব প্রাপ্ত হইত।

তাঁহাদের মধ্যে কৃত্রিমতা কিছু ছিল না, অভাবও কিছু ছিল না। তাঁহারা নির্জনে বসিয়া ভগবৎ সাধনা করিতেন এবং শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন। বহু বিধ গ্রন্থ

প্রণয়ন করিয়া ভারতের সভ্যতা চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিতেন। সাধারণ ভাবে জীবন যাপন এবং উন্নত বিষয়ের চিন্তা—এই নীতি তাঁহাদের জীবনের মধ্যে যেভাবে রূপায়িত হইয়াছিল তাহার তুলনা কোন দেশের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। ভারতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেদ, পুরাণ ইতিহাস, স্মৃতি ন্যায় উপনিষদ প্রভৃতি অধিকাংশই অরণ্য হইতে সমুদ্ভূত। সে কারণ একখানি উপনিষদের নাম—আরণ্যক উপনিষদ্।

দৈহিক উন্নতির দিকে তাদের লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল কেবল মাত্র আত্মিক বিকাশের দিকে এবং আত্মিক বিকাশ লাভের পরিণাম ফলে তাঁদের দেহ ছিল সুস্থ এবং বলিষ্ঠ। দেশের মধ্যে যদি কোন রাষ্ট্রীয় সংকট এবং বিপদ্ দেখা দিত তখন রাজন্যবর্গ রাজধানী হইতে অরণ্যে আগমন করতঃ তাঁদের পদতলে মণি মাণিক্যখচিত মুকুটপরিশোভিতমস্তক অবনত করিয়া তাঁদের মন্ত্রনা গ্রহণ করিতেন। বনবাসীগণ ছিলেন রাজ্য পালনের মন্ত্রনাদাতা, ভয়ত্রাতা এবং ধর্মপথের শাসন কর্তা। ইহাই আমাদের **আরণ্যক সভ্যতা**।

বুনোরামদাস

অনেকে বুনোরাম দাসের নাম শুনিয়া থাকিবেন। সে খুব বেশী দিনের কথা নয়। তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন এবং সর্ব শাস্ত্রে পারদর্শী। তিনি নবদ্বীপের এক নির্জন বনমধ্যে টোল স্থাপন করিয়া অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করিতেন। লোকে তাঁকে 'বুনো' রামদাস বলে ডাকত।

একদা কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাহার টোল পরিদর্শন করিতে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, আপনার কোন অর্থানুপপত্তি আছে কি?' তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'না, আমার কোন অর্থানুপপত্তি নাই।' একটী অনুপপত্তি ছিল বটে কিন্তু গত কল্য অনশনে থাকিয়া তার সমাধান করিয়াছি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে বলিলেন, 'না, আমি শাস্ত্রীয় অনুপপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আমি সাংসারিক অনুপপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি।' ইহা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন, 'না, আমার সাংসারিক অনুপপত্তিও কিছুই নাই। এই দেখুন আমার কলসীতে তণ্ডুল রয়েছে, ঐ দেখুন তিন্তিড়ীবৃক্ষ দণ্ডায়মান। যতদিন আমার কলসীতে তণ্ডুল থাকবে এবং তিন্তিড়ীবৃক্ষে পল্লব থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমার সাংসারিক অনুপপত্তি কিছুই থাকবে না।'

তাঁহার বাহিরের কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তিনি ছিলেন যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট এবং অনন্তপ্রতীক্ষ। তাঁহার অন্তর ছিল জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল। তাঁহার স্ত্রী যখন

গঙ্গা স্নান করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেন, তখন পৌরবাসিগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিতেন, 'এই রমণীর শাঁখা সিঁদুর আমাদের দেশের গৌরব।'

উলঙ্গিনী মা

নগ্ন সভ্যতার আর একটি মনোরম চিত্র দেখতে পাই আমাদের মাতৃ পূজার মধ্যে। আমাদের আদ্যাশক্তি মাতৃদেবী উলঙ্গিনী। আমরা মাকে একখান বস্ত্র দিতে কুণ্ঠিত হই। কিন্তু মায়ের কেবল একটি সুসন্তান হয়েছিল, যিনি কত কাকুতি মিনতি করে, কেঁদে কেঁদে মাকে ডেকে বলতেন—

"মা বসন পর বসন পর, বসন পর মা তুমি গো।
চন্দনে চার্চ্চিত জবা পদে দিব আমি গো॥"

কিন্তু মা বসন পরলেন না। তিনি বল্লেন, না তোদেরি যখন এত অভাব অভিযোগ, এখন আমি কি করে বস্ত্র পরিধান করি? করুণাময়ী মা আমাদের জন্য বস্ত্র ত্যাগ করে চিরতরে উলঙ্গিনী হয়ে রইলেন।

নগ্ন শ্রীশুকদেব গোস্বামী

এবার অদ্ভুত রূপের এক নগ্ন সন্ন্যাসীর বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। উপরের অংশগুলি অনুষঙ্গ এবং আলোচ্য বিষয় স্থানের ভূমিকা। তিনি ছিলেন অখণ্ডশাস্ত্রবিৎ ব্যাসতনয় শ্রীশুকদেব। তিনি আজীবন নগ্নব্রহ্মচারী, ভূমিষ্ঠ হইতেই উলঙ্গ। কখন বস্ত্র এমনকি ক্ষুদ্র কৌপীন কন্থা বহির্বাস পর্যন্ত গ্রহণ করেন নি। আমরা অনেকে নগ্ন সন্ন্যাসী দেখেছি কিন্তু তাঁরা প্রথমাবস্থায় হয়তো বস্ত্র পরিধান করেছিলেন, পরে বস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীশুকদেব গোস্বামী কোন কালেও বস্ত্র গ্রহণ করেননি।

তাহার জন্মরহস্যও অতি অদ্ভুত। তাঁহার পিতা ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া যখন অন্তরে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না, তখন শ্রীনারদ আসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে তিনি যদি শ্রীভগবানের রূপ গুণাদিলীলা বর্ণন করিতে পারেন, তা'হলে তিনি অপার আনন্দে পরিপ্লুত হইতে পারিবেন। সেই হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টি। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেন, 'শ্রীমদ্ভাগবত বেদের অকৃত্রিমভাষ্য।' শ্রীসনাতন বলিতেন, 'শ্রীভাগবত সর্বশাস্ত্রাব্ধিপীযূষ, সর্ববেদৈক সৎফল এবং সর্বসিদ্ধান্ত রত্নাঢ্য।' প্রণবে যাহা বীজাকারে নিহিত রহিয়াছে ব্রহ্মসূত্রে যাহা সূত্রাকারে গুম্ফিত আছে এবং শ্রীনারায়ণ হ'তে পরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত চতুঃশ্লোকীতে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়া বিরাট মহীরুহে

পরিণত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই ভাগবতের প্রতিপাদ্য দেবতা। ভাগবতশাস্ত্র ভক্তি এবং প্রেমধর্মের ঐকান্তিক প্রতিষ্ঠা।

তাঁহার পিতা শ্রীব্যাসদেব যখন বদরিকাশ্রমে বসিয়া তপস্যা করিতেছেন, তখন তাঁহার বাসনা হইল যদি কোন শুদ্ধপ্রেমিক ভক্ত তাঁহাকে শ্রীভগবানের সরসলীলা কথা শুনাইতে পারেন তাহাহইলে তিনি চরিতার্থ হন। সে কারণ তিনি ঐ প্রকার এক পুত্র সন্তান লাভ করিবার প্রাণের বাসনা শ্রীভগবানের চরণে নিবেদন করিলেন। তাহার ফলে শ্রীশুকদেবের জন্ম। সুতরাং শুকদেব তাঁহার তপস্যালব্ধ পুত্র। ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমে বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম বদরায়ণ এবং শুকদেব তাঁহার পুত্র বলিয়া তাঁহার আর এক নাম বাদরায়ণি।

শুকদেব নামটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা আমাদিগকে বৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পরম আদরে প্রতিপালিত দক্ষ এবং বিচক্ষণ নামক শুকপক্ষীদ্বয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃত নিকুঞ্জক্রীড় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া মধুর কোমলালাপে ললিতাদি সখীবৃন্দের নিকট ব্যক্ত করিতেন। নিশান্তে বনদেবতাবৃন্দাদেবীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা স্মরবিলাসে বিভোর যুগলের কপট নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দেন। তাই মনে হয় তাঁহারাই এইবার শুকদেব রূপে জন্ম প্রকটন করিয়া যুগলের সর্বোৎকর্ষলীলাকাহিনী মনোহর কাব্যে বর্ণন করিয়া জগৎবাসীকে মোহনিদ্রা হইতে প্রবোধিত করিবার উদ্দেশ্যে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি মহাশয় নিকুঞ্জ পালিত শুক পক্ষীর সহিত শুকদেবের তুলনা করিয়া তাঁহার 'কৃষ্ণভাবনামৃত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

> "বৃন্দেঙ্গিতজ্ঞঃ স বিচক্ষণঃ শুকঃ
> শুকো যথা ভাগবতার্থকোবিদঃ।
> দক্ষঃ প্রবোধে জগতাং প্রভোরিতি
> প্রেমাস্পদাত্মানুপমঃ সমস্ত্যধাৎ॥"

বৃন্দাদেবীর ইঙ্গিত পাইয়া দক্ষ এবং বিচক্ষণ নামে দুইটি শুক পক্ষী যেমন জগৎ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঞ্জনে দক্ষ ও বিচক্ষণ নামের সার্থকতা লাভ করেন, তেমনি ভাগবত তত্ত্ববিৎ শ্রীশুকদেব জগতের মায়া নিদ্রা ভঙ্গ করিতে দক্ষ এবং বিচক্ষণ।

শ্রীশুকদেবের জন্মরহস্য

শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদের জন্ম প্রকটনের একটি অলৌকিক কাহিনী আছে। তিনি দ্বাদশ বৎসর মাতৃগর্ভে ছিলেন। এদিকে ব্যাসদেব পুত্র ভূমিষ্ঠ হইতেছেনা

দেখিয়া অতিশয় শঙ্কাভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি বালক, এতকাল মাতৃগর্ভে বাস করিতেছ, ভূমিষ্ঠ হইতেছ না কেন?" তখন গর্তমধ্যস্থিত বালক উত্তর করিলেন, 'না আমি ভূমিষ্ঠ হইব না, কারণ ভূমিষ্ঠ হইলেই মায়া আমাকে কবলিত করিবে। তবে যদি স্বয়ং ভগবান আসিয়া আমাকে আশ্বাস দেন যে আমি জন্মগ্রহণ করিলে মায়াতীত হইয়া থাকিব তাহাহইলে আমি ভূমিষ্ঠ হইতে পারি।' ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁকে অভয় দিয়া বলিলেন যে তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেও মায়া তাঁকে কবলিত করিতে পারিবে না, তখন তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়াই তাঁহার নবযৌবন প্রাপ্তি এবং অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি। ভূমিষ্ঠ হইয়াই তিনি উলঙ্গাবস্থায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনের দিকে ছুটিতে লাগিলেন।

শুকদেবের বনে গমন

তিনি ব্রহ্মানন্দে বিভোর, তাঁর বাহ্য জ্ঞান নাই, স্ত্রীপুরুষভেদ জ্ঞান নাই। নদীতে গন্ধর্ব পত্নীগণ নগ্নাবস্থায় জলকেলি করিতেছিলেন, সেই সময় অসাধারণ লাবণ্যপুঞ্জ নগ্ন বালক সেই দিক দিয়া ছুটিতেছিলেন। তাঁকে দেখিয়া গন্ধর্ব পত্নীগণ কোন প্রকার লজ্জা এবং সংকোচ অনুভব করিলেন না।

ব্যাসদেব তাঁর পুত্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গন্ধর্ব পত্নীগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্র আবরণ করিলেন। তাহাতে ব্যাসদেব অতীব আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা আমি অশীতি বর্ষ পর বৃদ্ধ, আর আমার পুত্র নবযৌবন সম্পন্ন। তাকে দেখে আপনারা লজ্জানুভব করিলেন না, আর আমাকে দেখে লজ্জা করিতেছেন কেন?' তদুত্তরে গন্ধর্ব পত্নীগণ বলিলেন, 'আপনার পুত্র সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞানশূণ্য এবং ব্রহ্মানন্দে বিভোর। বাহ্যানুসন্ধান করিবার তাঁর কোন অবসর নাই। তিনি যৌবন প্রাপ্ত হইলেও সম্পূর্ণরূপে মায়াতীত। সুতরাং তাঁকে দেখে আমরা লজ্জানুভব করি নাই। কিন্তু আপনি বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার ন্যায় মায়াতীত হইতে পারেন নাই। তাই আপনাকে দেখে আমরা লজ্জানুভব করিতেছি।" ব্যাসদেব পুত্রের এবম্প্রকার গুণ শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

যদিও ঋষিপ্রবর ব্যাসদেব মায়াতীত তথাপি তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া গন্ধর্ব পত্নীগণ ইঙ্গিতে জগৎকে জানাইয়া দিলেন যে, জীবের যৌনস্পৃহা এতই দুর্দমনীয় তাহা যেমন যুবকদিগকে আক্রমণ করে, তেমনি বার্দ্ধক্যাবস্থায় ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া পড়িলেও যৌনস্পৃহা একেবারে প্রশমিত হয় না। এমন কি সাধকবৃন্দের গভীর

সাধনার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া সময় বিশেষে আত্মপ্রকট করে। গীতায় উক্ত আছে,—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

(দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৯ শ্লোক)

ইন্দ্রিয় বর্গ শিথিল হইলে দেহীভোগ্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু তাহাতে দেহীর ভোগেচ্ছা থাকিয়া যায়। বরং অতৃপ্তি নিবন্ধন আরও প্রজ্জলিত হয়। একমাত্র রসস্বরূপ ভগবানের দর্শন লাভ করিলে ভোগেচ্ছা চিরতরে বিলুপ্ত হয়। মদনের মোহপাশ হইতে মুক্ত হইতে চাহিলে মদনমোহনের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন। ইহাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মত বিবেক।

এদিকে শ্রীশুকদেব গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সমগ্র বনানী তাঁর রূপের জ্যোতিতে আলোকিত হইল। কাঠুরিয়াগণ কাঠ কাটিতে আসিয়া দেখিল যে একটি অসামান্য জ্যোতিঃপুঞ্জ সারা বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে দেখিয়া তাহারা অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং তাহাকে অপদেবতা বলিয়া মনে করিল। পরিশেষে তারা ব্যাসদেবের নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। এই জ্যোতিঃপুঞ্জ যে কে তাহা ব্যাসদেবের বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন তিনি মনে করিলেন যে এইবার পলাতক শুক পক্ষীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে হইবে। তদুদ্দেশে তিনি এক কৌশল স্থির করিলেন। অবশ্য তিনি শুক পক্ষীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে পারেন নাই, তবে তাঁহাকে নির্ভেদ ব্রহ্মানন্দ হইতে কৃষ্ণানন্দে আনয়ন করিয়াছিলেন।

নগ্ন শুকদেবের পরীক্ষিতের সভায় ভাগবত পঠন

তিনি কাঠুরিয়াগণকে বলিলেন 'তোদের দুটী মন্ত্র পড়াইতেছি। তোরা এই দুইটি মন্ত্র কণ্ঠস্থ কর্। এই ব্যপদেশে তাহাদিগকে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং গুণ সম্বন্ধীয় দুইটি শ্লোক কণ্ঠস্থ করাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, 'এবার তোরা গিয়া যখন সেই ভূতকে দেখ্‌বি, তখন এই দুইটি মন্ত্র যথাক্রমে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করবি। তা শুনে সেই ভূত তোদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটতে থাকবে। তোরা তাতে যেন ভয় করিস্ না। আমার নিকট একেবারে দৌড়ে চলে আসবি। তৎপরে আমি সেই ভূতকে ঝাড়াইয়া দিব।'

কাঠুরিয়াগণ বনের মধ্যে গিয়া যখন সেই জ্যোতিঃপুঞ্জকে পুনরায় দেখিতে পাইল, তখন তাহারা ব্যাসদেবের নির্দ্দেশক্রমে ভাগবতের দুইটি শ্লোক একে একে আবৃত্তি করিতে লাগিল।

প্রথম শ্লোকটি কিশোর কৃষ্ণের রূপ বর্ণন, যথা ভাগবতে,—

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং—
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধর সুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীত কীর্ত্তিঃ॥"

(ভাঃ ১০।২১।৫ বেণুগীত)

শ্রীকৃষ্ণ নটবর শরীর ধারণ করিয়া স্বীয পদাঙ্কিত রমণীয বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের মুকুট, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার অবতংস, পরিধানে কনকবৎ কপিশবর্ণ বসন, গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা। তিনি স্বীয অধর সুধা বেণুরন্ধ্রে পূরণ করিতেছেন আর গোপীগণ তাঁহার কীর্তিগান করিতেছেন।

দ্বিতীয় শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্যগুণের বর্ণন, যথা

"অহো বকীযং স্তনকালকূটম্
জিঘাংসয পায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভেগতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কম্বা যালুং শরণং ব্রজেম॥" (ভাঃ ৩।২ ২৩)

অহো! অসাধ্বী অর্থাৎ দুষ্টস্বভাবা পূতনা রাক্ষসী তাহার স্তনে কালকূট মিশ্রিত করিয, জিঘাংসা বৃত্তি অবলম্বনে ছয় দিনের শিশু শ্রীকৃষ্ণকে স্তন পান করাইয়া মারিবার জন্য মাতৃরূপে স্নেহভরে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিল বলিয়া, তাহাকে যিনি সংহার করিয়া ধাত্রীগতি দান করিযাছিলেন, তাঁহার ন্যায় করুণাময় আর কে আছে? সেই হতারিগতিদায়ক পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকে শরণ লইব?

শ্লোক শুনিযা আত্মহারা হইযা শুকদেব তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং অবশেষে তাঁহার পিতার চরণতলে আসিযা পতিত হইলেন। ব্যাসদেব তাঁহাকে সমগ্র ভাগবত শিক্ষা দিলেন এবং শ্রীশুকদেব নিভেদ ব্রহ্মানন্দ হইতে কৃষ্ণানন্দে বিভোর হইযা নগ্ন পরিব্রাজকরূপে পুনরায় ঘুরিযা বেড়াইতে লাগিলেন।

তৎপরে রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ উপস্থিত হইল। সপ্ত দিবসের মধ্যে তক্ষক দংশনে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটিবে। রাজা পরীক্ষিত মৃত্যু নিশ্চয় জেনে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে পড়িযা রহিলেন। রাজর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষি প্রভৃতি অগণিত ঋষিগণ স্বত প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে সেখানে দেখিতে আসিলেন। ফলে তথায় ঋষিবৃন্দের এক মহতী সভা গঠিত হইল। পরীক্ষিত মহাশয মুমূর্ষু জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল কি তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন। কেহ কর্ম্মমার্গের কথা, কেহ জ্ঞান মার্গের কথা, কেহ যোগ

মার্গের কথা তুলিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। কিন্তু জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল কি তাহার প্রকৃত সমাধান হইল না।

এমন সময় কোথা হইতে নগ্ন পরিব্রাজক শ্রীশুকদেব সেই সভায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি একেবারে উলঙ্গ, লজ্জা নাই, সংকোচ নাই এবং লৌকিকতা নাই। এমনকি কৌপীন কিম্বা বহির্বাস পর্যন্ত পরিধান করিয়া সেই মহতী সভায় আসেন নাই। কিন্তু তাঁর নগ্ন দেহের মধ্য দিয়ে যে অলৌকিক জ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল তাহারা সেই সভা উদ্ভাসিত হইল। সকলেই এমনকি তাঁহার পিতা, পিতামহ পর্য্যন্ত গুরুজনবর্গ কেহ গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিতে হইয়াছিল।

সেই মহতী সভায় গুরুরূপে আসন গ্রহণ করিয়া নগ্ন অবধূত পরীক্ষিতকে সমগ্র ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ করাইলেন। শ্রোতব্য বস্তু কি, জ্ঞাতব্য বস্তু কি, পরম পবিত্র বস্তু কি, জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল কি তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। শ্রীহরির রসলীলাকথা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই লীলা কথার মকরন্দ পান করিয়া রাজা পরীক্ষিত এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে ঋষিবৃন্দ সকলেই পরমাতৃপ্তি লাভ করিলেন। রাজা পরীক্ষিত আত্যন্তিক শ্রেয়ো লাভের উপায় শ্রবণ করিয়া গতসন্দেহ হইলেন। যে সরস হরি কথা শ্রবণ লালসায় ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমে বসিয়া তপস্যা করিলেন, সেই তপস্যালব্ধ পুত্রের দ্বারা তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণমাত্রায় সফলতা লাভ করিল।

আমরা সাধারণতঃ প্রশ্ন করি ভাগবতপাঠ শ্রবণে কি ফল হয়। ভাগবতে ফলশ্রুতির কথা বিশেষভাবে লেখা আছে বটে, কিন্তু আমাদের নিকট প্রশ্ন করিলে উত্তর আসে—ভাগবতপাঠ শ্রবণে সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং ফাঁড়া কাটিয়া যায়। একথা খুবই সত্য। পরীক্ষিতের ফাঁড়া কাটিয়া গেল। তক্ষক আর দংশন করিতে আসিতেছে না। কিন্তু রাজা পরীক্ষিত আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ ছিলেন না, যে ফাঁড়া কাটিয়া গেল বলিয়া সন্তুষ্ট রহিবেন। তিনি তক্ষককে আদেশ করিয়া ডাকিলেন, তক্ষক সময় আগত, তুমি আসিয়া আমাকে দংশন কর। কিন্তু যে-স্থল হরি কথায় ভরপুর, যে স্থলে শ্রীশুকদেব গোস্বামী ভাগবতী কথার বক্তা এবং পরীক্ষিতকে কেন্দ্র করিয়া অগণিত দেবর্ষি, রাজর্ষি এবং মহর্ষি সেই লীলা কথার শ্রোতা এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেখানে স্বীয় হরিকথায় বসিত, সে স্থানে তক্ষক আসিয়া কি প্রকারে দংশন করিতে পারে? তক্ষক আর আসে না। কিন্তু পরীক্ষিত আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ লাভ করিয়া সম্পূর্ণ নির্ভীক। তিনি কখন মৃত্যুকে ভয় করিতে পারেন না। পুনরায়

তক্ষককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তক্ষক সময় হইয়া আসিয়াছে, তুমি আসিয়া আমাকে দংশন কর। নতুবা ব্রহ্মবাক্য নিষ্ফল হইবে, ধর্মলোপ পাইবে।" তখন তক্ষক আসিয়া রাজা পরীক্ষিতের আদেশে তাঁহাকে দংশন করিল। পরীক্ষিত মৃত্যুর পরপারে চলিয়া গেলেন। মৃত্যুকে বরণ করিয়া চিরতরে মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া রহিলেন।

এই আখ্যায়িকা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেহ মনে করেন, ইহা নিছক কাব্য কাহিনী, কেহ মনে করেন ইহা রূপক, কেহ মনে করেন ইহা ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণের একটী মনোরম পটভূমিকা। কিন্তু সে যাহা হউক এখানকার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে একটী নগ্ন অবধূতের দ্বারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের অপূর্ব বিশ্লেষণ হইল। ইহা নগ্নসভ্যতার অপূর্ব ঐতিহ্য।

বিলাসী ভগবান

পরিশেষে বন সভ্যতার পূর্ণপরিণতি কোথায় তাহাই এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। বন সভ্যতার পূর্ণ তাৎপর্য আমরা দেখিতে পাই বৃন্দাবনের নিগূঢ় ভজন রহস্যের মধ্য দিয়া। অবশ্য বৃন্দাবনের ঠাকুর বুনোও নন, নগ্নও নন। তিনি অতীব বিলাসী এবং পরম সুন্দর। বিলাসের যত কিছু উপকরণ আছে, তৎসকলেই তাঁহার প্রয়োজন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের তিনিই অখণ্ড ভোক্তা। কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব কেবল তাঁহাতেই পর্যবসিত হয়। জীবের কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব খণ্ডিত, সুতরাং দুঃখশোকময়। তিনি বিশ্বের ভোক্তারূপে সৃষ্টির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিলসিত হন। এই ভাব যিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারেন, তিনিই কেবল বিশ্ব সৃষ্টির মূল রহস্য উদঘাটন করিতে পারেন, নতুবা অপর কোন দার্শনিক মতবাদের দ্বারা সৃষ্টির মূল প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইতে পারে না। **তিনি যখন তাঁহার স্বরূপ শক্তির সহিত বিলসিত হন, তখনই তিনি পরব্রহ্মরূপে অভিহিত হন।** ইহাই বৈষ্ণব বিদ্বদ্‌জনগণের অভিমত।

তিনি যদিও বিলাসী, তথাপি তাঁহাকে যাঁহারা ভজনা করেন, তাহাদিকে তিনি একেবারে নগ্ন করিয়া তুলেন। যদি একখানা সূক্ষ্ম মনোরম বস্ত্র পরিধান করিয়া, তাঁহাকে আরাধনা করিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি বলিয়া উঠিবেন, 'ঐ কাপড় খানা আমাকে দে, আমাকে পরাইয়া দিলে কেমন সুন্দর দেখায় দেখ্‌। মা বস্ত্র পরিধান করিতে চাহিলেন না বটে কিন্তু এ-ঠাকুরের বিলাস লালসা অতীব বিচিত্র। মূল্যবান বসন ভূষণ এবং বিবিধ অলঙ্কারাদিতে

বিভূষিত হইয়া তাঁহার নিকট গেলে তিনি বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিবেন, 'এ বেশ-ভূষণ কি তোরে সাজে, এগুলি দিযে আমাকে সাজায়ে দে দেখবি, কি সুন্দর বলে তোদের বোধ হবে।' সনাতন প্রভু মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিয়া, বিপুল মান প্রতিপত্তি দূরে ফেলিয়া দিযা একেবারে ফকির হইয়া চলিযাছেন। পথে তাঁহার ভগিনীপতি তাঁহাকে শীতবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একখানি ভোট কম্বল দিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের লোলুপ দৃষ্টি পড়িল সেই ভোট কম্বলের দিকে। পরিশেষে সনাতন প্রভুকে মূল্যবান ভোট কম্বলের পরিবর্তে, ছিন্ন কন্থা গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে হইল। অতএব যদি কেহ বলেন যে বৃন্দাবনের ভজন নগ্ন সভ্যতার রূপান্তর তাহলে প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই।

কিন্তু তাহা হইলেও এখানকার ভগবান অখিল রসামৃতসিন্ধু নবকিশোর শ্যাম, লীলাপুরুষোত্তম এবং মৌজী ভগবান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তগণ এবম্প্রকার ভগবানকে ভজনা করিযা আন্তরিক সুখ লাভ করেন। সে কারণ **যাঁহাদের উপাস্য দেব যত ভোগী, তাঁহারা তত ত্যাগী।** অপর দিকে **যাঁহাদের উপাস্য দেব যত ত্যাগী, তাঁহারা তত ভোগী।** ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভোগী ভগবানের বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য, তাঁহার ভক্তগণকে সর্বস্বান্ত এবং ফকির হইতে হয়। তাঁহার নিকট হইতে কিছু চাওয়ার অভিলাষ থাকে না। অপর পক্ষে যোগী ভগবানের ভক্তগণ তাঁহার নিকট হইতে কিছু পাইবার আশায় সাধনে প্রবৃত্ত হন। অতএব উভয় সাধনার মধ্যে বিরাট ব্যবধান।

বৃন্দাবনের বৈশিষ্ট্য

বৃন্দাবন বিহারী শ্রীকৃষ্ণের রূপের মাধুর্য্য এতই উচ্ছসিত, যে তাহা ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যায না. তাই মধুর মধুর বলিযা পরিসমাপ্ত করিতে হয়। তাঁহাকে মণিমাণিক্য খচিত বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করা হইলেও তাঁহার অঙ্গের ভূষণ তাঁহার অঙ্গ কান্তিকে বর্ধিত করিতে পারে না, উপরন্তু তাঁহার শ্যামল কান্তিচ্ছটা দ্বারা ভূষণের ভূষণত্ব বিহিত হয়। চৈতন্য চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন :—

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ
তার উপর ভ্রূ ধনু নর্ত্তন
তেরছ নেত্রান্তবাণ, তার দৃঢ় সন্ধান
বিন্ধে রাধা গোপীগণের মন।। (২।২১।৮৭)

তিনি কখন কখন মূল্যবান বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া বনসাজে বিভূষিত হইতে ভালবাসেন। তাই তাঁর বাহুতে পল্লবের অঙ্গদ, শিরে ময়ূর পুচ্ছের চূড়া কর্ণে কর্ণিকার অবতংস, পদেনূপুর এবং গলে পঞ্চবর্ণের বন ফুলের বৈজয়ন্তী মালা। তিনি ব্রজ গোপীদিগের সহিত বিবিধ কুঞ্জক্রীড়া করিতে থাকেন। তিনি তাঁহাদের প্রেমে মাতোয়ারা। বৃন্দাবনে এমন বংশীধ্বনি করেন যে তাহা শ্রবণ করিয়া স্থাবর জঙ্গমে পুলকের সঞ্চার হয়। কর্ত্তা ভর্ত্তাদিগের সম্মুখে ব্রজযুবতীগণের নীবিবন্ধ খসিয়া পড়ে। সায়াহ্নে স্বর্গের দেবীগণ কল্পবৃক্ষ হইতে কুসুম চয়ন করিতে থাকিলে, বংশীরবে তাঁহারা পর্য্যন্ত বিবশগাত্রা হইয়া পড়েন, এবং তাহাদের হস্তস্থিত কুসুম সকল স্খলিত হইয়া বংশী ধারীর মস্তকে আসিয়া পতিত হয়। যমুনার কূলে বস্ত্র রাখিয়া, ব্রজকুমারীগণ নগ্নাবস্থায় জলকেলি করিতে থাকিলে তিনি তাঁহাদের বস্ত্র অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করিতে চাহেন। তাঁহাদের লজ্জাকুলশীল সকলি অপহরণ করেন।

তাঁহার কীর্তি কলাপ বিচিত্র। তিনি গুণ কর্ম বিভাগানুসারে চাতুর্ব্বণ্য সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, তিনি স্বয়ং অকর্ত্তা। 'চাতুর্ব্বণ্যংময়াসৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ। তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্য কর্ত্তারমব্যয়ম। '(গীতা, চতুর্থ অধ্যায় ১৩ শ্লোক।)

কিন্তু ইহা তাঁহার বিপ্রলিপ্সা। কারণ তিনি তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়া সর্ব ধর্ম পালন করিয়াছেন। তিনি কখন উদাত্তস্বরে গীতার মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কার্য্য করিয়াছেন। কখন উদ্ধত দৈত্য কুল নিধন করিয় ক্ষাত্র কুলোচিত ধর্ম পালন করিয়াছেন। কখন গোচারণ গোপালনাদি রূপ বৈশ্য কুলোচিত কার্য করিয়াছেন। কখন রাজন্য বর্গের পাদোদক বহন করিয়া এবং তদ্বারা তাঁহাদের চরণ ধৌত করিয়া শূদ্রের কার্য্যও করিয়াছেন। কিন্তু এগুলি তাঁহার স্বরূপ গত কর্ম নহে। বৈষ্ণবগণ বলেন, দাসত্ব করাই তাঁহার স্বভাবজ কর্ম কিন্তু তাহা অনুষ্ঠিত হয় কেবল মাত্র বৃন্দাবন ধামে, অন্যত্র নহে। তিনি তাঁহার প্রিয়তমা শ্রীরাধার অলৌকিক প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বনবিহার, জলকেলি এবং নিভৃত নিকুঞ্জে সুরত ক্রিয়া করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তমার কটাক্ষ লক্ষ্মীর কণা মাত্র লাভ করিয়া ক্রীতদাস হন। তাই তিনি কখন প্রিয়ার চরণ কমল অলক্তক রাগে রঞ্জিত করিয়া দেন, কখন তাঁহার বক্ষে কেলি মকরাদি অঙ্কিত করেন, কখন তাঁহার রাতুল চরণ শিরে ধারণ করেন এবং সৌভাগ্য পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার প্রেমে সম্যক বিলসিত হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনের সাম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং স্বয়ং তাঁহার প্রহরীর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। অতএব শূদ্রের কার্যই তাঁহার প্রিয়তম কার্য্য এবং তাহা অনুষ্ঠিত হয়, দেব

দুর্লভ ব্রজ লোকে। ভগবানের এবম্প্রকার প্রেমাধীনতা বৃন্দাবন ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না এবং ঐকান্তিক বৈষ্ণব গণ এই রসের রসিক।

বৃন্দাবনের মুগ্ধ নায়ক যেমন বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহার প্রিয়তমা শ্রীরাধাও বৃন্দাবন ব্যতীত স্বর্গ মর্ত কিম্বা গোলকের অধীশ্বরী হইতেও চাহেন না। কান্তের সঙ্গম সুখ বৃন্দাবন ব্যতীত অন্যত্র মিলনেও তাহা উপভোগ করিতে চাহেন না।

এই মগ্ধ নায়ক যখন তাহার প্রিয়তমা শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া, কোপীন মাত্র সার করিয়া নীলাচলে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছিলেন, তখন সাহিত্য দর্পণের নিম্নোক্ত শ্লোকটি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল।

"যঃ কৌমার হরঃ স এবহি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার লীলা বিধৌ
রেবা রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

কোন এক প্রাকৃত নায়িকা তাহার সখীর নিকট হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া স্বীয় গোপন কথা ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে তিনি যখন কুমারী ছিলেন তখন তাঁহার নায়ক তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রেবা নদীর তীরে, বেতসীতরুতলে তাঁহার সহিত সংগত হইয়াছিলেন। তখন ছিল চৈত্র মাসের পরম রমণীয়া বসন্ত রজনী। প্রস্ফুটিত মালতীকুসুমের সৌরভ বহন করিয়া মলয়ানিল কদম্ব কাননের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগকে প্রফুল্ল করিতেছিল। এখন তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। তাহার পতি এখানে সমুপস্থিত আছেন। এখনও সেই বসন্ত কাল সমাগত। সুগন্ধি মলয় পবন এখনও প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগকে আমোদিত করিতেছে। তথাপি তাহার মন রেবা তীরস্থ বেতসী তরু তলে তাঁহার প্রিয়তমের সহিত বিলসিত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

শ্রীমহাপ্রভু অন্তর্নিহিত ভাব না অবগত হইতে পারিবে শ্রীরূপ গোস্বামী তাহার স্বরচিত শ্লোকের দ্বারা তাহার মর্ম ব্যক্ত করিয়াছেন।

"প্রিয় সোঽয়ং কৃষ্ণ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চম জুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

শ্রীরাধা কুরুক্ষেত্রে তাঁহার প্রিয়তম কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের

উভয়ের সদৃশ সুখ তাদৃশই আছে, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি পরিতৃপ্ত হইতেছেন না। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের রাজ বেশ, হাতী ঘোড়া, রাজধানীর কোলাহল এবং অগণিত মনুষ্য সমাগম দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইতে পারিতেছেন না। তাঁহার মন চাহিতেছে যমুনা পুলিনস্থ মধুর বৃন্দাবনের দিকে, যে বৃন্দাবন তাঁহার কিশোর প্রাণ বল্লভের বদন নিঃসৃত মধুর মুরলীর পঞ্চম স্বননে মুখরিত এবং যেখানকার তরু, লতা পত্র পুষ্প, আকাশ বাতাস প্রেমের শিহরণ জাগাইয়া দিয়া তাঁহার ভাব রাজ্যে প্রবল বন্যার স্রোত আনয়ন করে।

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার ললিত মাধব নাটকের পূর্ণ মনোরথ' নামক দশম অঙ্কে অনুরূপ আর একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। নিম্নে ইহা উদ্ধৃত হইল।

'যা তে লীলারস পরিমলোদ্গারি বন্যা পরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভি শ্চটুল পশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি বেণু বিহারম।'

দ্বাপরের কোন এক কল্পে দ্বারকাস্থ নব বৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সে স্থলে নন্দ যশোদা এবং ব্রজস্থ সখীবৃন্দ সকলে উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের পর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রিয়ে, অতঃপর তোমার জন্য আর কি প্রিয়কার্য করিতে পারি?' তদুত্তরে শ্রীরাধা আনন্দসহকারে বলিলেন, 'প্রিয়তম, ব্রজস্থ আমার সকল সখী এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, ভগিনী চন্দ্রাবলীকেও পাইলাম। ব্রজেশ্বরী শ্বশ্রমাতাকেও পাইলাম। আর এই নব বৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জে তোমার সহিত আমার মিলন হইল। ইহার পর আর আমার কি কাম্য থাকিতে পারে? তথাপি আমার একটি নিবেদন তোমার চরণে জানাইতেছি। তোমার লীলারসের সৌগন্ধ উদ্গারি বন সমূহ দ্বারা পরিবৃত এবং মাধুর্য্য সৌষ্ঠবে পরিশোভিত পরম শ্লাঘ্য যে ব্রজভূমি বিরাজ করিতেছে, সেই বৃন্দাবনে চঞ্চলস্বভাবা এবং গোপীভাবে মুগ্ধান্তঃকরণা আমাদের সহিত তুমি বেণু নাদে আপ্যায়িত করিয়া বিহার কর।' সমর্থারতিমতী শ্রীরাধিকা পট্টমহিষীত্ব প্রাপ্ত হইয়াও শ্রীবৃন্দাবনের উন্মুখতা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কারণ প্রেমোদ্দাম বশতঃ চটুল স্বভাবা গোপীভাবে মুগ্ধান্তঃকরণা প্রভৃতি যে সকল বিশেষণে বিশেষিত হইয়া তিনি বংশীধারীর সহিত বিহারের অভিলাষ করেন, তাহা কেবল বৃন্দাবনে সম্ভব। বৃন্দাবন সর্বাতিশায়ী প্রেমের পরমলীলাস্থলী। বৃন্দাবনের বনভূমি যুগল কিশোরের পাদলক্ষ্মী দ্বারা বিভূষিত। এতদ্বারা বৃন্দাবনের বনমাহাত্ম্য সূচিত হয়। অপর পক্ষে ইহা পরকীয়া ভাবেরও

দ্যোতক। অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়া কর্ত্তৃক কৃত পরকীয়া আবরণটী উন্মুক্ত হইলেও শ্রীরাধারাণীর পরকীয়া ভাব মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার অভিলাষ প্রশমিত হয় না। তাই বৃন্দাবনের প্রতি তাঁহার লোলুপতা থাকিয়া যায়। কারণ ইহা কেবল বৃন্দাবনেই সংঘটিত হয়, অন্যত্র ইহার স্থান নাই।

"পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।"

অতএব ইহা হইতে মনে হয় যে অপ্রকটে বা প্রকটের অন্য কোন স্থানে যদি পরকীয়া ভাব না থাকে, তাহা হইলে প্রকটব্রজের লীলামাধুর্য নিশ্চয়ই অধিকতম হইবে।

শ্রীরাধা যেমন রাজধানীর আনন্দ চাহেন না, নিভৃত নিকুঞ্জে যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে ভালবাসেন, সেই প্রকার ধীর ললিত নাগর শ্যাম বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে চাহেন না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে ললিত মাধব এবং বিদগ্ধ মাধব নাটককে পৃথক যোজনা করিয়া লিখিতে আদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "রূপ, তোমার নাটকে (অর্থাৎ বিদগ্ধ মাধব নাটকে) তুমি এ হেন কৃষ্ণকে বৃন্দাবনের বাহির করিও না।" অপর দিকে সাধকবৃন্দ সর্বাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া এই বনের ভজনা করেন। এমনকি বৃন্দাবনের রজঃ দেবতাগণেরও অভিলষিত। সর্বশাস্ত্রবিৎ, বুদ্ধিসত্তম যদুরাজের মন্ত্রী পরম ভাগবত শ্রীউদ্ধব মহাশয় বন প্রেমে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি বৃন্দাবনের তৃণজন্ম পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যথা ভাগবতে

"আসামহো চরণ রেণু জুষামহং স্যাম্
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম লতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজন আর্য্য পথঞ্চ হিত্বা
ভেজু মুকুন্দ পদবীং শ্রুতিভি বিমৃগ্যাম্॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজদেবীগণের প্রেমোৎকর্ষ দর্শন করাইবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদের বিরহ ব্যথা উপশম করাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীউদ্ধবকে মথুরা হইতে বার্ত্তা দিয়া ব্রজে পাঠাইলেন, তখন পরম ভক্ত উদ্ধব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বহন করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া ব্রজবামাগণ যে ভাবে বন্যবৎ উৎকণ্ঠার সহিত ইহকাল, পরকাল, লোকধর্ম বেদধর্ম, ধৈর্য্য, লজ্জা প্রভৃতি জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবমানা হইতেন, সে সকল শুনিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। শ্রুতিগণ গভীর অনুসন্ধান করিয়াও মুকুন্দের যে পরম পদ লাভ করিতে পারেন নাই, সেই দুর্লভপদ তাঁহারা

তাঁহাদের অতুলনীয় প্রেম সম্পত্তির দ্বারা অনায়াসে লাভ করিলেন। ইহা হইতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে। তখন তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐ জাতীয় সেবা করিবার জন্য তাঁহার লোভ জন্মিল।

কিন্তু তাঁহার এই অভিলাষ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না যদি তিনি তাঁহাদের চরণ রেণু লাভ করিতে না পারেন। তাই তিনি ব্রজে তৃণ গুল্ম লতা রূপে জন্মগ্রহণ করিবার প্রার্থনা করিলেন। তাহার কারণ ব্রজ রমণীগণ যখন প্রবল উৎকণ্ঠার সহিত দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনিকে লক্ষ্য করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিতে থাকিবেন তখন তাঁহাদের পদধূলি সংস্পর্শে তৃণ গুল্ম লতাদিগের গাত্র বিভূষিত হইতে পারিবে। তিনি দীর্ঘশির বৃক্ষ হইতে চাহিলেন না, কারণ তাঁহাদের পদরেণু বৃক্ষের উন্নত মস্তক স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং সে কারণ তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। তাই তিনি বৃন্দাবনে তৃণ গুল্ম লতা প্রভৃতির কোন একটি জন্মলাভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

এই বিলাসী ভগবানের ভজনা করিয়া ভক্তগণ অপূর্ব প্রেমে মহীয়ান্ হইয়া তাঁহার বিপরীত গুণ লাভ করেন। অর্থাৎ তিনি বিলাসী, তাঁহার ভক্তগণ বিলাসবিমুখ। তিনি হন মৌজী এবং তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার সেবার জন্য বিপুল কর্মোৎসাহে উদ্দীপ্ত। তিনি ভোক্তা তাঁহার ভক্তগণ ত্যাগী। এই বন সভ্যতা আমাদের শুষ্ক জীবন ধারাকে সরস করিয়া পরমে জ্বল প্রেম মার্গে পরিচালিত করিয়াছে এবং এই মধুর পথের সন্ধান দিয়াছেন রাধা বিভাবিত স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভু।

চতুর্ব্বিংশ তরঙ্গ

শৃঙ্গার রস

শৃঙ্গার রসকে মধুর রস বলে। ইহা আদিরস বা মুখ্য রস। ইহা উন্নত এবং উজ্জ্বল রস। ইহা সর্ব রসের সমাশ্রয়। যেমন আকাশাদির গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এক কালীন পৃথিবীতে বর্তমান, সেই প্রকার শান্তাদি সকল রসের গুণ, শৃঙ্গার রসে সমাশ্রিত। শৃঙ্গার রসে অনন্ত বিভেদ আছে। শৃঙ্গাররসে সম্ভোগই মুখ্য রস। সম্ভোগঅর্থে শ্রীমদুজ্জ্বল নীলমণি বলিয়াছেন ;—

"দর্শনালিঙ্গনাদীনাং আনুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাস সমারোহন ভাবঃ সম্ভোগঈর্য্যতে॥

(শৃঙ্গার ভেদ প্রঃ ৮৮)

নায়ক এবং নায়িকার দর্শন, আলিঙ্গন সম্ভাষন ও স্পর্শাদির যে পরস্পর সুখ তাৎপর্য মূলক নিষেবন, তাহা দ্বারা উল্লাস প্রাপ্ত ভাবকে সম্ভোগ বলে।

সম্ভোগ অর্থে শ্রীজীব তাঁহার লোচন রোচনী টীকায় সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন 'আনুকূল্যাদিতি কামময়ঃ সম্ভোগঃ ব্যাবৃত্তঃ। অর্থাৎ ইহাতে কামময় সম্ভোগ নিরাকৃত। অতএব ইহা অপ্রাকৃত ;

রসশাস্ত্রকার শৃঙ্গার রস সম্বন্ধে বলিয়াছেন,
'শৃঙ্গ হি মন্মথোদ্ভেদ স্তদাগমন হেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতি প্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ঈর্য্যতে।" (সাহিত্য দর্পণ ৩।২১০)

মদনের আবেশ নিবন্ধন চিত্তের যে উদ্‌ভ্রান্ততা বা ব্যাকুলতা, তাহার নাম শৃঙ্গ। শৃঙ্গের আবির্ভাব বশতঃ অশেষ গুণবতী শ্রেষ্ঠা রমণীর সহিত বিলাস বিহারাদির দ্বারা যে আনন্দাস্বাদন তাহাই রসশাস্ত্রে শৃঙ্গার রস নামে অভিহিত।

এতদ্বারা বুঝা যায় যে প্রাকৃত বিষয়ারাম সাধারণ নর নারীর যে বিহার তাহা শৃঙ্গাররসপদবাচ্য হয় না। কারণ প্রাকৃত জীবের রূপগুণ সীমাবদ্ধ। তৎপরে বিহারে নর এবং নারী উভয়ের মধ্যে স্ব স্ব ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থতা রূপ পঙ্কিল বাসনা জড়িত আছে। কিন্তু শৃঙ্গার রসে স্ব সুখ প্রণোদিত হাবভাব তিরোহিত।

সে কারণ, ইহাই স্বীকার্য্য যে পরম পুরুষের তাঁহার স্বরূপ শক্তিবৃন্দের সহিত

বিলাসে যে আনন্দোচ্ছ্বাস তাহাই শৃঙ্গার রস। যাঁহাদের রূপগুণ অফুরন্ত, সেই নায়ক নায়িকার স্বচ্ছন্দ বিহারকে শৃঙ্গার বলে।

যদিও সম্ভোগ আলিঙ্গন, চুম্বন এবং সংপ্রযোগাদি অশেষ বিশেষ লক্ষণের দ্বারা উপলক্ষিত, তথাপি ইহার বিশুদ্ধিতা এই যে নায়ক এবং নায়িকা কাহারও মধ্যে স্বসুখ বাসনারূপ কালিমা নাই। সম্ভোগে কেহই নিজের সুখ চান না। প্রিয়তম চান প্রিয়ার সুখ, প্রিয়া চান প্রিয়তমের সুখ। স্বসুখ বাসনা দ্বারা তাঁহাদের রতি ভেদপ্রাপ্ত হয় না। সম্ভোগেচ্ছা তাঁহাদের রতির সহিত এমনি ভাবে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত, যে বিলাসে কাহারও স্বসুখ বাসনার অনুসন্ধান নাই। ইহা প্রেম সমুদ্র হইতে উত্থিত বরামৃত সদৃশ চিদানন্দ বিলাস। জড়ীয় বস্তুর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রাকৃত নর নারীর মধ্যে ইহা সম্ভবপর হয় না। কারণ জীবের দেহ দেহী ভেদ আছে, জীব অসম্পূর্ণ সত্তা, জীবের মধ্যে প্রেম নাই, জীব মায়াধীন এবং কুবাসনা দ্বারা কদর্থিত। সে কারণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, মায়াধীশ, পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ 'শৃঙ্গার রসরাজ" নামে অভিহিত এবং তাঁহার সর্ব কান্তা শিরোমণি, অখণ্ড রসবল্লভা শ্রীরাধারাণী 'মহাভাবস্বরূপিনী' নামে খ্যাতা। মহাভাবের সহিত রসরাজের যে বিলাস তাহাই শৃঙ্গার রস। উপরন্তু তাহাদের দেহ দেহী ভেদ না থাকায় শৃঙ্গার রসাস্বাদন কেবল সংপ্রয়োগে সীমাবদ্ধ থাকে না, যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা আস্বাদিত হইতে পারে।

শৃঙ্গার রসের বহু বৈশিষ্ট্য আছে, তন্মধ্যে একটি এই যে পরস্পরের কেলিবাসনা সম্ভোগান্তে স্তিমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মুহুর্মুহু বর্দ্ধনশীল এবং নিত্য নবনবায়মানরূপে উদিত হয়। কিন্তু জীবের পক্ষে তাহার বিপরীত। জীব শৃঙ্গাররসআস্বাদনে অসমর্থ, কারণ তাহার বাসনাও সীমিত। ইহার পরিসমাপ্তি ক্লান্তি এবং অবসাদ। সে কারণ শৃঙ্গার রসে অবগাহন করা অপরের সাধ্যাতীত।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ শৃঙ্গারের বর্ণ দিয়াছেন-উজ্জ্বলশ্যাম। সাহিত্যদর্পণ তৃতীয়পরিচ্ছেদে ২১০ কারিকায় লিখিয়াছেন, "শ্যামবর্ণোঽয়ং বিষ্ণুঃ দৈবতঃ"। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই তিনি শ্যামসুন্দর। আর তাঁহার নায়িকা শিরোমণি শ্রীরাধারাণীও শ্যামা নামে অভিহিত। অতএব নায়ক এবং নায়িকা উভয়েই শৃঙ্গার রসে ঢালা।

ভক্তকবি জয়দেব তাহার শ্রীগীত গোবিন্দের প্রথম সর্গে লিখিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দীবর শ্যামলকান্তি বিশিষ্ট। তিনি শীতল, কোমল এবং নিত্য নবীন।

তাঁহার প্রতি অঙ্গ অনঙ্গের উৎসব ভূমি। তিনি মূর্তিমান শৃঙ্গার রস—তিনি স্বচ্ছন্দে ব্রজসুন্দরীগণের প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়া বসন্তকালে তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।

স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ।
শৃঙ্গার সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥" (১ম সর্গ ৪৮)

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত বলিলেন—তিনি শৃঙ্গার রসসার। শৃঙ্গার রসের দ্বারা তাঁহার তনুমন গঠিত। তিনি কামাবতারাঙ্কুর—প্রাকৃত অপ্রাকৃত যত কামদেব আছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার শাখাস্থানীয় কিম্বা পত্রস্থানীয়। তিনি অভিনব কন্দর্প। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলিলেন তিনি অপ্রাকৃত নবীন মদন। ভাগবৎ বলিলেন—তিনি "সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ" ইত্যাদি।

শৃঙ্গার রসের ব্যাপ্তি। (সখী মঞ্জরীগণের উক্ত)

যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ রাধিকাকে আলিঙ্গন এবং চুম্বন করেন, তথাপি তাহার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় সখীমঞ্জরীগণের উপর। যেমন তরুমূলে জল সেচন করিলে তাহার শাখা প্রশাখা পুষ্ট হয়, সেই প্রকার শ্রীরাধার কায়ব্যূহা সখীমঞ্জরীগণও তাঁহার স্পর্শামৃত উপভোগ করিয়া পুলকিত এবং উল্লসিত হইয়া উঠেন। তাই তাঁহারা নিভৃত কেলিকুঞ্জের রন্ধ্র পথ দিয়া স্মরবিলাসিত যুগলকে সন্দর্শন করেন এবং উৎফুল্ল হইয়া উঠেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহার বিলাপ কুসুমাঞ্জলীর মধ্যে গুরুবন্দনারূপে যে প্রথম শ্লোকটির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অতি তাৎপর্য্য পূর্ণ। শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"ত্বং রূপমঞ্জরী সখি প্রথিতাপুরেঽস্মিন্
পুংসঃ পরস্য বদনং নহি পশ্যসীতি।
বিম্বাধরে ক্ষতমনাগতভর্তৃকায়া
যন্তেবাধায়ি কিমুতচ্ছুক পুঙ্গবেন।"

দাস গোস্বামী তাঁহার গুরুমঞ্জরীকন্যা শ্রীরূপের বিম্বাধরে ক্ষত চিহ্ন দেখিয়া, তাঁহার সিদ্ধাবস্থার পরাকাষ্ঠা অনুভব করতঃ তাঁহাকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া সানন্দে ব্যাজ স্তুতি ছলে বলিলেন, হে সখি রূপমঞ্জরি! তুমি এই ব্রজমণ্ডলে সতী বলিয়া প্রখ্যাত, কখন পর পুরুষের মুখ দেখ না, তবে তোমার ভর্তার অনুপস্থিতিতে বিম্বাধরে যে ক্ষত চিহ্ন দেখিতেছি, তাহা কি কোন শুক পক্ষী বিধান করিয়াছে?"

ইহার অন্তর্নিহিত ভাব এই যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অধর দংশন করিলে, তাহার প্রতিক্রিয়া উপলব্ধ হইল মঞ্জরী রূপের উপর। তাঁহার স্পর্শানুভবে তিনিও অতিশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার অধরে আপনা আপনি শ্রীকৃষ্ণের ভোগচিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। ইহা তাঁহার সিদ্ধাবস্থার চরমতম ফল। দাস গোস্বামী তাঁহার শিক্ষাগুরু শ্রীরূপের ভাগ্যাতিশয্য অনুভব করিয়া বিস্ময় এবং আনন্দের সহিত এই প্রকারে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। ইহা অভূতপূর্ব এবং আশ্চর্য্যজনক। যাঁহারা প্রেমরাজ্যের উচ্চতম শিখরে আরোহন করিয়াছেন তাঁহারাই কেবল এই প্রকার ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন। জগতে ইহা রহস্যপূর্ণ, দুর্বোধ্য এবং অবিশ্বাস্য হইয়া আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কেবল ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভে তৃপ্ত হন না, তাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দ মাধুর্য্য সাক্ষাৎ উপভোগ করিয়া ধন্য হন।

সাধক ভক্তগণের উপর ব্যাপ্তি

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন যে যখন যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখন দুষ্কৃতিকারীগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এবং সাধুগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। ভাগবত বলিলেন, ইহা স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে। ইহা পালনকর্তা বিষ্ণুর কার্য। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল লীলাপরায়ণ। লীলা ব্যতীত তাঁহার আর কিছু নাই। তিনি লীলা পুরুষোত্তম। সাধুগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রপঞ্চের অনুকরণে অপ্রাপঞ্চিক লীলা করেন। তাই ভাগবত রাসলীলার অন্তিমদিকে বলিলেন,

> 'অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষ তনুমাশ্রিতঃ
> ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বাতৎপরো ভবেৎ।" (ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)

শ্রুতি তাঁহাকে নিত্যতৃপ্ত, নিরঞ্জন, আত্মকাম, আত্মারাম প্রভৃতি বহুবিধ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্যগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার মধ্যে বাসনাকামনা আছে। তাঁহার মধ্যে যে হ্লাদিনীরূপা মহাশক্তি রহিয়াছে, তাহার উদ্ভট তাড়নায় আনন্দোচ্ছ্বাসে তাহাকে বহুবিধ চমৎকারকারিণী লীলা করিতে হয়। উদ্দেশ্য কেবল স্ব-প্রেম-মাধুর্য্য-আস্বাদন এবং আনুষঙ্গিকভাবে অপূর্ণ জীবকে পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সে আনন্দরস বিতরণ। তাই শ্রুতি তাঁহাকে

বলিয়াছেন, "রসোবৈসঃ, আনন্দোব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি। আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। আনন্দ নিষ্ক্রিয় নয়, আনন্দ সক্রিয়। ইহা positive dynamic energy. অতএব লীলা করা তাঁহার স্বভাব, আর লীলাও করেন তাঁহার স্বরূপ শক্তিবৃন্দের সহিত। বিজাতীয় শক্তির সহিত নহে। তিনি তাঁহার আত্মারামত্ব এবং স্বরাটত্ব লইয়াই লীলা করেন। শৃঙ্গার রসের মধ্যে অনির্বচনীয় আনন্দদায়িনী শক্তি আছে বলিয়া, তিনি তাঁহার কান্তাগণকে লইয়া অদ্ভুত লীলার অনুষ্ঠান করেন। সেইসকল লীলা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ অপার আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া তৎপরায়ণ হইয়া যান।

শৃঙ্গার রসের মাধুর্য্য :

এ লীলার এমন মাধুর্য্য যে শুকশারীরাও লীলার রহস্য পরিজ্ঞাতা হইয়া মধুর সংলাপে তাহা ব্যক্ত করেন। ময়ূর ময়ূরী বিলাসোৎফুল্লযুগলের বদনমাধুরী সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করেন। যমুনাদেবী তাঁহাদের অঙ্গস্পর্শ লাভ করিয়া, উল্লাসভরে কলনিনাদে অস্ফুট রবে প্রবাহিতা হন। নির্মৎসর আত্মারামগণ বিচলিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি অহৈতুকীভক্তি করেন। শ্রুত্যভিমানিনীদেবীগণ, দেবকন্যাগণ ঋষিপত্নিগণ গোপীভাবলিপ্সু হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হন এবং সাধনার পরিপাকে তাঁহারা তাহার অকৃত্রিম সেবা বিধান করেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের বক্ষঃবিলাসিনী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাধুর্যে আকৃষ্টা হইয়া, বৃন্দাবনের নিভৃত প্রদেশে বসিয়া উগ্র তপশ্চরণ করেন, কিন্তু ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে ভজন করায় তিনি রাসোৎসবে কৃষ্ণকে পান নাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লিখিয়াছেন,—

> পাপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
> ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥" (১।৮।২২০)

ভাগবতও (১০।৪৭।৬০ শ্লোকে লিখিয়াছেন 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ" ইত্যাদি। ইহা পরম ভক্ত শ্রীউদ্ধবের উক্তি।

বিশ্ব প্রকৃতির উপর ব্যাপ্তি।

মূর্তিমান শৃঙ্গার-রসরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার আভাস জগতে প্রতিফলিত হইয়া জগৎকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। কবি জয়দেব তাঁহার শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথমসর্গে লিখিয়াছেন, 'বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন' ইত্যাদি। তিনি বিশ্বকে অনুরঞ্জিত করেন বা রাঙাইয়া তুলেন। যদিও তাহা প্রকৃতির গুণরাগে উপরঞ্জিত হইয়া যায়, তথাপি বিশ্বের

মধ্যে যে আনন্দোৎপাদিকাশক্তি দেখা যায়, তাহার মূলে রহিয়াছে কাম। প্রাকৃত কামও অপ্রকৃত কাম হইতে জাত। কামের আনন্দোৎপাদিকা শক্তি প্রভাবে নরনারীর মধ্যে পরস্পর স্বাভাবিক আকর্ষণ রহিয়াছে। তাহার ফলে জগতের সৃষ্টি এবং প্রজনন ক্রিয়া (propagation of species) সম্পাদিত হইতেছে। আমাদের তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন :—

"আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দেন প্রযান্ত্যভিসংবিশন্তি ॥"

আনন্দ হইতে জীবের উদ্ভব, আনন্দ দ্বারাই জীব জীবিত থাকে এবং আনন্দে প্রবেশ করিয়া আনন্দেই স্থিতিলাভ করে।

প্রাকৃত কামের দুইপ্রকার বৃত্তি। একটি ধর্মের অবিরোধী এবং অপরটি ধর্ম বিরোধী। যে কাম জগতের সৃষ্টি এবং স্থিতির হেতু, তাহা ধর্মের অবিরুদ্ধ কাম। আমাদের বিবাহে কাম মন্ত্র আছে। তাহার অর্থ—কামই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা এবং কাম সমুদ্রে ইহার স্থান। কামোদাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামঃ সমুদ্র মাবিশৎ।)

গীতায় ভগবান বলিলেন, "ধর্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।" (৭ম অধ্যায় ১১ নং শ্লোক)। তৎপরে দশম অধ্যায় দ্বিতীয় শ্লোকে বলিলেন, 'প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ।' প্রাকৃত কামদেবও তাঁহার অংশ।

কিন্তু যে কাম ধর্মবিরুদ্ধ, যে কামের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া নরনারী উচ্ছৃঙ্খল হয়, এবং বিপথে পরিচালিত হয় সে কাম জীবের পরম শত্রু। ষড়রিপুর মধ্যে কামের স্থান প্রথম। কাম হইতে ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি অপরাপর রিপুর উদ্ভব হয়। "সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ, কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে' ইত্যাদি (গীতা ২।৬২-৬৩)। এই কামকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত গীতা তৃতীয় অধ্যায়ে অন্তিম শ্লোকে নির্দেশ দিলেন - 'জহিশত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং।"

অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কামক্রোধাদি রিপুগণকে বলিদান দিতে বলেন নাই। তাঁহারা তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া গোবিন্দ সেবার আনুকূল্যে পরিমার্জিত করিতে বলেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাহার প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ সেবা কামার্পণে, ক্রোধভক্তি দ্বেষীজনে
লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ গুণ গানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥'

দুর্জয় কামের হাত হইতে কি ঋষিগণ, কি যোগীগণ, কি ব্রহ্মাদি দেবগণ কেহই পরিত্রাণ পান নাই। তাঁহারা সকলেই সময়ে সময়ে পথভ্রষ্ট হইয়াছিলেন! কিন্তু ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাম লীলার মধ্যে এমনি এক মোহিনী শক্তি আছে, যদ্বারা প্রাকৃত কামদেবেরও সংমোহনাদি পুষ্পশর ব্যর্থ হয়। তিনিও শত কোটি গোপীমণ্ডলমণ্ডিত, নবকিশোর, নটবর শ্যামসুন্দরের অসীম সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দেখিয়া মূর্চ্ছিত হন এবং তাঁহার চরণ সেবার নিমিত্ত লালায়িত হন।

অনেকে কটাক্ষ করেন যে রাধাকৃষ্ণের লীলা কাহিনী অশ্লীল। কিন্তু যদি আমরা স্মরণ করি যে ইহার সহিত মায়িক সম্বন্ধ কিছু নাই, তখন আমরা বুঝিতে পারি, যে ইহা জগতের শ্লীলতা এবং অশ্লীলতার পরপারে অবস্থিত। ইহা প্রাকৃত শৃঙ্গার রসের ন্যায় তুচ্ছ ফলগু, এবং অপারমার্থিক নহে। ইহা পারমার্থিকতত্ত্বে ভরপুর। তাই শ্রীশুকদেব গোস্বামী গঙ্গাতীরে প্রায়োপবিষ্ট মুমূর্ষু মহারাজ পরীক্ষিতের বিরাট সভায় যেখানে রাজর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষিগণ সমুপস্থিত, তথায় উচ্চকণ্ঠে গোপীজনবল্লভের বিচিত্রলীলা কাহিনী বর্ণন করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব রাসলীলার ফলশ্রুতি বলিলেন,

"ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

যে সকল শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ধৈর্য্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা পুনঃপুনঃ শ্রবণ করেন বা কীর্তন করেন, তাঁহাদের হৃদয়ের কামাদি দুর্বাসনা অচিরে দূরীভূত হয় এবং পরাভক্তির উদয়ে তাঁহাদের চিত্ত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

শৃঙ্গার রসে ভজন।

স্মরবিলসিত যুগলের ভজন, কাম গায়ত্রী এবং কাম বীজে উপাসন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত পন্থা। এই রসে শ্রীরূপ সনাতনকে অভিসিঞ্চিত করিয়া তিনি বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রজে বাস করিয়া যুগলের বিচিত্র বিচিত্র লীলার অনুশীলন করিতেন, স্বরূপের আবেশে সে সকল উপভোগ করিতেন এবং লীলায় সর্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। স্বরূপের আবেশ একটু তরল হইলে, লীলানুভবের অভাব বশতঃ কাতর কণ্ঠে হাহা রবে ক্রন্দন করিয়া দিগমণ্ডল মুখরিত করিতেন। তাঁহাদের স্তবাবলীর মধ্য দিয়া ইহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

ইহা কন্দর্প বিলসিত যুগলের বদনমাধুরী সন্দর্শনের প্রার্থনা।

"বৃন্দাবনে বিহরতোরিহ কেলি কুঞ্জে
মত্তদ্বিপ প্রবর কৌতুক বিভ্রমেন।

সন্দর্শয়স্ব যুবয়োর্বদনারবিন্দ
দ্বন্দ্বং বিধেহি দেবি কৃপাং ॥" (গান্ধর্বিকাসংপ্রার্থনাষ্টকং)

তোমরা উভয়ে কৌতুকী হইয়া মত্ত করিরাজ এবং করিণীর ন্যায় বিভ্রমের সহিত বৃন্দাবনের কেলিকুঞ্জে বিহার করিতেছ। অতএব হে দেবি রাধিকে, তোমাদের মদনোৎফুল্ল বদনারবিন্দ আমাকে সম্যকরূপে দর্শন করাও।

এই প্রকার প্রার্থনা অতি পবিত্র এবং উজ্জ্বল, কারণ ইহাতে স্বসুখ বাসনা রূপ কালিমা নাই। প্রকৃতি স্থানীয় চিদ্রূপা জীব জড় প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।"

প্রকৃতির ধর্ম পুরুষের সেবা করা। সেই সেবার চরমোৎকর্ষপ্রাপ্তি তখনই হয়, যখন চিদ্রূপা জীব তাহার শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া মঞ্জরীভাবে স্মরবিলসিত যুগলের ভজনা করে। ইহাই রাগানুগামার্গে ভজন এবং ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের জীবনের চরমতমকাম্য (*Summum bonum of life*) একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু এই পথের সন্ধান দিয়াছেন। জগতে ইহা অবিদিত, অপরিজ্ঞাত এবং দুর্বোধ্য। ইহা তাঁহার দেওয়া অনর্পিতচরীভক্তি নামে প্রখ্যাত।

পঞ্চবিংশ তরঙ্গ

বৃন্দাবনের ভজন

বৃন্দাবনের ভজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রেত। ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনবিহারী, পরমতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভজনীয় বিষয়। ভাগবত তাঁহাকে আশ্রয় তত্ত্বরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার মধুর লীলাস্থলী পরমশ্লাঘ্য বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের ধূলিকণা উদ্ধবাদি ভক্তগণের চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। শ্রীলীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের দ্বাবিংশ শ্লোকে বৃন্দাবনের ভজনের প্রতি দার্ঢ্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,

"বিচিত্র পত্রাঙ্কুরশালি বালা
স্তনান্তরং যাম বনান্তরং বা।
অপাস্য বৃন্দাবন পাদলাস্য
মুপাস্য মন্যং ন বিলোকয়ামঃ"

বিচিত্র পত্রাঙ্কুর শোভিত বৃন্দাবনের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তমা নবীন কিশোরী শ্রীরাধার শোভমান কুচদ্বন্দ্বে সর্বদা বিরাজিত। শ্রীরাধার বক্ষঃস্থল বিচিত্র পত্রাঙ্কুরশালি। তিনি 'ঈষৎ-পীন-স্তন-মুকুলতা' উদ্ভিন্নযৌবনা নবকিশোরী। তাঁহার বক্ষে কিশোর কৃষ্ণ কত বিচিত্র চিত্র লতাপাতা অঙ্কন করিয়া তাহাকে তাঁহার বিলাসের রম্যস্থান করিয়া রাখিয়াছেন। বৃন্দাবন তাঁহার সর্বলীলামুকুটমণি রাসলীলার আবাসস্থান। বৃন্দাবন এই নবীনযুবদ্বন্দ্বের পাদলাস্যে বিলাসিত। উপরন্তু বৃন্দাবনাধীশ শ্রীকৃষ্ণের চরণভঙ্গী এখানে তাঁহার প্রিয়তমার নৃত্য চাতুর্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত। অতএব বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথায় যাইব? তাঁহাদের চরণ পদ্ম ব্যতিরেকে জগতে আর উপাস্যই বা কি আছে? এই প্রকার দৃঢ় অনুরাগ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের শ্লোকে শ্লোকে বর্ণিত।

ব্রজবাসীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। অশেষ প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণ দুস্ত্যজ আর্যপথ আত্মীয়-স্বজন, ধর্মাধর্ম প্রভৃতি অম্লানবদনে উল্লঙ্ঘন করিয়া, পরম অনুরাগভরে শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে অভিসার করেন এবং প্রেমোপচারে তাঁহার সেবা করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নানাভাবে, নানাস্থানে তাঁহাদের অনুরাগের পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করিয়াছেন। আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে কয়েকটি পয়ার পর-পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল,—

"লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম কর্ম।
লজ্জাধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখমর্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিযে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥" (১৪৩—১৪৬)

এই প্রকার সুদৃঢ় প্রেমের পরিচয় অপর কেহ দিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাদের প্রেম জগতে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। তদুপরি শ্রীরাধার প্রেম সর্বোচ্চকক্ষায় অর্থাৎ মাদনাখ্য মহাভাবে গিয়া উপনীত হইয়াছে। ইহা প্রেমের চরম পরিণতি।

সে কারণ তাঁহাদের প্রেম জীবের ভজনাদর্শ। ব্রজদেবিগণের প্রেমের অনুগা হইয়া, সর্বস্ব পরিহার করিয়, বিষয়ান্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে রাগমার্গে ভজন করাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিমত। ইহা প্রেমের সাধন, প্রেমের সাধনই সর্ব্বোচ্চ সাধন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমকে পুরুষার্থ শিরোমণি বলিয়াছেন। প্রেমের সেবাই রসময়ী সেবা। ইহাতে প্রেম ব্যতীত অপর কোন উপকরণ নাই। ষোড়শোপচারে পূজা করিলেও যদি তাহা প্রেমের দ্বারা পরিসিঞ্চিত না হয়, তাহা হইলে তিনি পরিতৃপ্ত হন না এবং তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয় না। ভাগবত শাস্ত্রই এই প্রেমের সন্ধান দিয়াছেন। এই লুপ্ত বার্তা পুনরায় জগতে বিশেষভাবে দিবার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। কবি কর্ণপূর তাঁহার 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকে লিখিয়াছেন,—

"কালেন বৃন্দাবন-কেলি-বার্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥"

বৃন্দাবনের লুপ্তপ্রায় প্রেমভক্তি মূলক নিগূঢ় লীলার সংবাদ পুনরায় জগতে প্রদান করিবার নিমিত্ত এই কলিতে কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতিকে কৃপামৃতের দ্বারা অভিসিঞ্চন করিয়াছিলেন।

কবিকর্ণপূরের গুরুদেব শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁহার "শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের টিপ্পনীর প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

"আরাধ্যোভগবান ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যাকাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।

শাস্ত্রং ভাগবতং প্রম ণমমলং, প্রেমা পুমর্থোমহা-

নিত্থং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতস্তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥"

১। আরাধ্য ভগবান নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। ২। তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন। ৩। ব্রজ বধূগণ যেভাবে আরাধনা করিয়াছেন তাহাই মধুর উপাসনা। ৪। পরম ধর্মপ্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র তাহার প্রমাণ। ৫। প্রেম পুরুষার্থ শিরোমণি। ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতবাদ এবং তাহাই আমাদের পরম আদরের বস্তু।

এই পঞ্চ বিষয় লইয়া চৈতন্য ধর্মগ ত। অতএব গৌরভক্তগণ প্রেমের পূজারী। এই গ্রন্থে প্রেমের সর্বোচ্চবিকাশ কোথায় তাহাই তুলনামূলক হিসাবে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে প্রেমের সন্ধান মহাত্মাগণও দিতে পারেন না, শ্রুতিগণেরও যাহা দুর্বিজ্ঞেয়, সেই প্রকার দুঃসাহসিক কার্য্যে আমার ন্যায় অজ্ঞ, অভাজন এবং দুষ্কৃতি পরায়ণ ব্যক্তির কি প্রকারে প্রবৃত্তি হইল? ইহা আমি চিন্তা করিয়াও নির্ণয় করিতে পারি না। ইহা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। একথা গ্রন্থের প্রারম্ভেও বলিয়াছি এবং পরি শেষে তাহাই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। তবে আশ্বাসের বিষয় এই যে শুনিয়াছি ভাগবত কথা যথাভাবে বর্ণিত না হইলেও, তাহার কিছু না কিছু সার্থকতা থাকে।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ তাহা 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত' গ্রন্থ সমাপন করিয়া লিখিলেন,—

দৃষ্টং ন শাস্ত্রং গুরবো ন দৃষ্টা

বরে ... ...।

যথাতথা ... বালভাবা—

তথৈব মে গৌরহরিঃ প্রসীদতু।

আমার এই বাক্যপ্রতিভা অর্থতত্ত্ব না জানিয়া শাস্ত্র দর্শন করে নাই, গুরুগণের নিকট উপদেশপ্রাপ্ত হয় নাই এবং পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করে নাই, সে কারণ তাহা শুদ্ধ হউক অথবা না হউক, তথাপি শ্রীগৌরহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাপাত্র জনগণের এবম্প্রকার দৈন্য তাঁহাদের প্রেমভক্তির স্বাভাবিক উচ্ছলন এবং তাহাই আমাদের শিক্ষণীয়বস্তু। অতএব তাঁহাদের মহার্ঘ বাণী অনুসরণ করিয়া এই প্রার্থনা করিতে চাই, যে যদিও আমার পক্ষে এরূপ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, তথাপি ইহাতে আমার অজ্ঞতা নিবন্ধন যাহা কিছু ভ্রম প্রমাদ দোষ ঘটিয়াছে তৎসমুদয় যেন শ্রীগৌরহরির কারুণ্যকটাক্ষ-বৈভবে

১৬

অপনোদিত হয় এবং সহৃদয় পাঠকবৃন্দ যেন আমার সর্ববিধ ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনা করেন।

"জয় জয় জয় দেব দেব দেব !
ত্রিভুবন-মঙ্গল-দিব্য-নাম-ধেয়।
জয় জয় জয় দেব কৃষ্ণ দেব !
শ্রবণমন নয়নামৃতাবতার !"

বৈষ্ণবীয় প্রেম

প্রথম খণ্ড

(পরিশিষ্ট)

পরিশিষ্ট—ক

শ্লোকসূচী

যে সকল উদ্ধৃত শ্লোকের গ্রন্থ উল্লেখ করা হয় নাই, সেই সকল শ্লোকের গ্রন্থ পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সাংকেতিক চিহ্ন :—

উঃ নীঃ = শ্রীরূপগোস্বামীকৃত শ্রীমদুজ্জ্বল নীলমণি।

ভঃ রঃ সিঃ = " ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

চৈঃ চঃ = শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

ভাঃ = শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্লোক—		পৃষ্ঠা—	গ্রন্থ পরিচয়।
সর্বথাধ্বংস রহিতং	…পরিকীর্ত্তিতঃ ॥	২	উঃ নীঃ স্থায়িভাব প্রকরণ ৬৩নং শ্লোক।
ত্রৈবিদ্যামাং	…লভন্তে ॥	৫	গীতা নবমঅধ্যায় ২০-২১নং শ্লোক।
তার মধ্যে মোক্ষ	…অন্তর্ধান ॥	৬	চৈ চঃ আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদ ৫১নং শ্লোক।
ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত	… স্তৎক্ষণাৎ ॥	৬	ভাঃ ১ম স্কন্ধ ২নং শ্লোক।
ভুক্তি মুক্তি	…ভবেৎ	৭	ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব বিভাগ ১৫নং শ্লোক।
শৃঙ্গার রস	… জগদীশ্বরম্	৮	শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত ৯৩নং শ্লোক।
কাম প্রেম	প্রবল	১০	চৈঃ চঃ আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ ১৪০-১৪১ পয়ার।
অতএব কাম	…ভাস্কর	০	ঐ ১৪৭নং পয়ার।
পীড়াভির্নব	· বিক্রান্তয়ঃ	১০	বিদগ্ধমাধব নাটক ২য় অঙ্ক ৩০নং শ্লোক।
এই প্রেমার	· ত্যজন	১১	চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদ ৪৫নং শ্লোক।
অহেরিব	… কুটিলাভবেৎ	১	উঃ নীঃ শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ ১০২নং শ্লোক।
আদৌ শ্রদ্ধা	ক্রমঃ ॥	১১	ভঃ রঃ সিঃ পূর্ববিভাগ ৩য় লহরী ১১নং শ্লোক।
কোন ভাগ্যে	· সবানন্দধাম	১৩-১৪	চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ২৩ পরিচ্ছেদ ৫-৯ শ্লোক।

শ্লোক—		পৃষ্ঠা—	গ্রন্থ পরিচয়
হ্লাদিনীর	…মহাভাব	১৬	চৈঃ চঃ আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ ৫৯নং পয়ার।
নবিনা	বিবর্দ্ধতে॥	১৭	উ ঃ নীঃ ৫৯নং পয়ার (শৃঙ্গার ভেদপ্রঃ)
রজস্তম	..বজস্তথা॥	১৯	গীতাচতুর্দশ অধ্যায় ১০নং শ্লোক।
নিত্যসিদ্ধ	…উদয়।	২৪	চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ২২ পবিচ্ছেদ ৫৭নং শ্লোক।
বিষ্ণুশক্তি	রিষ্যতে॥	২৬	বিষ্ণু পুরাণ। (৬।৭ ৬১)
যদাদিত্য	…রসাত্মকঃ॥	৩০	গীতাপঞ্চদশ অধ্যাব ১২-১৩নং শ্লোক।
অথবা	জগৎ	৩০	গীতা দশম অধ্যায ৪২নং শ্লোক।

N.B. "অতলত্বাদপারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুবিগাহতাম্।
স্পৃষ্টঃ পরং তটস্থেন রসার্ব্ধি মধুরো ময়া॥"

প্রেম বৈচিত্ত্যের কাহিনী	১০৮	শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটক পঞ্চম অঙ্ক ৪৫ অনুচ্ছেদ।
রাই সাজে বাঁশী বাজে না পড়িল উল		৮৮ পৃঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত অভিসারোৎকণ্ঠা ২৭।১০০৯
কৃষ্ণের পূর্বরাগ—	১৩৫	আদৌ বাচ্য স্ত্রিযা রাগঃ পুংসঃ শশ্চাত্তদিঙ্গিতৈঃ। (সাহিত্য দর্পণ ৩।১৯৭)
শ্রীরাধার প্রেমমাহাত্ম্য	১৪৬	শীতকালে চ বেহুষ্ণা উষ্ণকালে তু শীতলা। কান্তাকর্ষণ শীলা চ সা শ্যামা পরিকীর্তিতা॥

পরিশিষ্ট—খ

প্রেম বিকাশের স্তর। (দ্বিতীয় তরঙ্গ।) পৃষ্ঠা ১৪-১৭

উজ্জল নীলমণির প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় প্রভৃতির সংজ্ঞা।

প্রেম ২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (স্থায়িভাব প্রঃ ৬৩)

স্নেহ :—আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ।
হৃদযং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে॥
অত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তির্দর্শনাদিষু॥ স্থায়িভাব প্রঃ ৭৯)

N.B. ২পৃষ্ঠার ২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শ্রীউজ্জলনীলমণির শৃঙ্গার ভেদ প্রকরণের ২৫৯নং শ্লোক যথা :—

মান	১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।	
প্রণয়ঃ	মানো দধানো বিশ্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতেবুধৈঃ ॥	(” ১০৮)
রাগঃ	দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।	
	যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে ॥	(” ১১৬)
অনুরাগঃ	সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নব নবং প্রিয়ম্	
	রাগো ভবন্নব নবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে ॥	(” ১৪৬)
ভাবঃ	অনুরাগঃ স্বসংবেদ্য দশাং ১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য	(” ১৫৪)
রূঢ়ঃ	উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র সরূঢ় ইতি ভন্যতে ॥	(„ ১৫৯)
অধিরূঢ়ঃ	রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্।	
	যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে ॥	(” ১৭০)
মোদনঃ	মোদনঃ সদ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তসৌষ্ঠবম্ ॥	(” ১৭৩)
	মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ।	
	যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ স্বদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ ॥	(” ১৭৯)
মাদনঃ	সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽযং পরাৎপরঃ।	
	রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা ॥	(২১৯)
মহাভাব	মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসারতি দুর্ল্লভঃ।	
	ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যযোচ্যতে ॥	(” ১৫৬)
	বরামৃত স্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নযেৎ।”	(” ১৫৭)

পরিশিষ্ট (গ)

রস বিচারের দিক হইতে অর্থ ৬৪ পৃষ্ঠার ২ অনুচ্ছেদের পর শেষাংশ।

দাম বন্ধন লীলা ভগবত্তার সহিত প্রেমের লড়াই। প্রেম চায় বাঁধিতে আর ভগবত্তা দেয় বাধা। এই প্রকার যোঝাযুঝির পর অবশেষে প্রেমেরি জয় হইল। বাৎসল্য-প্রেম-স্বরূপা মা যশোদা তাঁহার পুত্ররূপী ভগবানকে প্রেমডোরে অনায়াসে বাঁধিতে পারিলেন। আচার্যগণ প্রেমকে ভগবত্তার উপরে দাঁড় করাইয়াছেন। প্রেম-রস-পিপাসু ভগবানকে তাঁহার প্রেম-রস-নির্য্যাস পান করিতে হইলে, তাঁহাকে সেই জাতীয় প্রেমের অধীন হইতে হয়। ব্রজ প্রেমের সর্বত্র ইহারই পরিচয়।

N.B. এই গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠা এক এবং দুই অনুচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট (ঘ)

রাধা-দামোদর। (পৃষ্ঠা ৬৪)

(শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের সারদাবঙ্গদা টীকা হইতে গৃহীত।)

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ১১০ নং শ্লোক।

"ঈশানদেবচরণাভরণেন নীবি—
দামোদর স্থির যশঃ স্তবকোদ্ভবেন।
লীলাশুকেন রচিতং তব কৃষ্ণদেব
কর্ণামৃতং বহতু কল্পশতান্তরেঽপি॥

তথাহি ভবিষ্যোত্তরে—সঙ্কেতাবসরে-চ্যুতে-প্রণয়তঃ সংরুদ্ধয়া রাধয়া,
প্রারভ্যভ্রূকুটিং হিরণ্য-রসনা দাম্নানিবদ্ধোদরং।
কার্ত্তিক্যাং জননী কৃতোৎসব বরে প্রস্তাবনা পূর্ব্বকং
চাটূনি প্রথয়ন্নমাত্ত পুলকং ধ্যায়েম দামোদরং। ইতি—

শ্রীযদু নন্দন দাস কৃত বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ।

সঙ্কেত করিয়া হরি, সে স্থানে আসিতে নারি
অবরুদ্ধ হইল বাহ্য স্থানে।
প্রণয় সংবন্ধে রাই, ভ্রূকুটি করিয়া তাই
হিরণ্য-বসন-দাম সনে॥
উদরবান্ধিলা যবে, তাতে কৃষ্ণ চন্দ্র হবে,
কহয়ে কার্ত্তিক পুণ্য মাসে।
জননী উৎসব কৈলা, বর প্রার্থনা প্রকাশ।
সেলাগি সঙ্কেতাচ্যুত বেশে।
এই স্থির যশ তোমার, অম্লানপুষ্পগুচ্ছসার—
তেঁই তোমার নাম দামোদর।

অতএব তব কর্ণে, রহু এই গ্রন্থ বর্ণে
কল্পশত হইয়া বিমল ॥
তথা দামোদররচিতে, সদাবহুধারারীতে,
রাইনাবি দামে যার ওর।
বদ্ধ হৈলা মান কাজে, তাতে খ্যাত ক্ষিতিমাঝে,
নাম যার রাধা দামোদর ॥

পরিশিষ্ট (ঙ)

(কামবীজ কাম গায়ত্রী পৃষ্ঠা ৭৫-৭৮)

কামবীজ এবং কাম গায়ত্রীর অর্থ।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছেন,

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীজে কাম গায়ত্র্যে যাঁর উপাসন॥" (২।৮।১০৯)

নিখিল রস-সার ভূত শৃঙ্গার রসাত্মক শ্রীবিগ্রহধারী, গোপীজন বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দেব দুর্লভ পরম মধুর প্রেম সেবা লাভ করিবার প্রধান উপাসনামন্ত্র—'কামবীজ কাম গায়ত্রী'।

কামবীজের অর্থ

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর মহাশয় 'মন্ত্রার্থ দীপিকায়' যে ভাবে কামবীজ এবং কাম গায়ত্রীর অর্থ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীরসোল্লাসতন্ত্রে বর্ণিত হইযাছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কাম বীজরূপে ও শ্রীরাধা রতিবীজ রূপে প্রকট রহিয়াছেন। সুতরাং ক্লীং এই কাম বীজ, শ্রীং এই রতিবীজ কীর্ত্তন করিলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। (কামবীজাত্মকঃ কৃষ্ণো রতিবীজাত্মিকা রাধা। তয়োঃ সংকীর্ত্তনাদেব রাধাকৃষ্ণঃ প্রসীদতি।)"

এই দুই প্রকার বীজের মধ্যে কামবীজের অর্থ লিখিত হইতেছে, যথা কাম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে অভিলাষের বীজ হইতেছে কামবীজ; কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে কাম অর্থাৎ অভিলাষ উদ্দীপন করিবার বীজের নাম হইতেছে কামবীজ, অথবা শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থে নিখিল কাম অর্থাৎ অভিলাষ পূর্ণ করিবার বীজই কামবীজ বলিয়া কথিত। ৩

শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রে কামবীজের লক্ষণ যথা—

বিনাবীজেন মন্ত্রানাং বিফলং জায়তে ফলম্।
পঞ্চালঙ্কার সংযুক্তাং বীজন্ত পরমাদ্ভুতম্॥
ক কারশ্চ লকারশ্চ ঈকারশ্চার্দ্ধ চন্দ্রকঃ।
চন্দ্রবিন্দুশ্চ তদ্‌যুক্তাং কামবীজ মুদাহৃতম্॥"

যে সকল মন্ত্র বীজহীন, তাহা জপ করিলে কোনও ফল হয় না। বীজও আবার যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে ক, ল ইত্যাদি পঞ্চ অলঙ্কার সংযুক্ত কামবীজই সর্বশ্রেষ্ঠ। 'ক' কার 'ল' কার 'ঈ' কার, অর্দ্ধচন্দ্র ও চন্দ্রবিন্দু সমন্বিত বীজই (ক্লীং) কামবীজ নামে অভিহিত। ৪

'ক্লীং' এই একাক্ষর বীজের নাম হইতেছে কামবীজ। (ক্লীমিতি কামবীজ মেকাক্ষরম্।") শ্রীবৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে ইহার দুইটি অর্থ বর্ণিত হইযাছে। প্রথম যথা ;—উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান ক্লীং এই কামবীজ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। কাম বীজান্তর্গত 'ক' কাব হইতে জল, 'ল' কার হইতে পৃথিবী, 'ঈ' কার হইতে অগ্নি, অর্দ্ধচন্দ্র হইতে বায়ু এবং বিন্দু হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই বীজাত্মক মন্ত্রই সর্বভূতের আধার স্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত ভূতের মূল কারণ।

(ক্লীং কারাদসৃজদ্ বিশ্বমিতি প্রাহশ্রুতেঃ শিরঃ। 'ল' কারাৎ পৃথিবীজাতা 'ক', কারাজ্জল সম্ভবঃ॥ 'ঈ' কারাদ্ বহ্নিরুৎপন্নো নাদ বায়ু রজায়ত। বিন্দোরাকাশ সম্ভু তিরিতি ভূতাত্মকো মন্থঃ॥") ৫

[শ্রুতি বলেন, ক্লীং এবং ওঁ এক এবং অভিন্ন, কারণ ওঙ্কার হইতে যেমন বিশ্বের সৃষ্টি, ক্লীং হইতেও তেমনি বিশ্বের সৃষ্টি। কিন্তু উভয়ে এক এবং অভিন্ন হইলেও কামবীজ শ্রীশ্রীবাধাকৃষ্ণের পবম মধুরযুগলিত-স্বরূপকে এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন রূপকে-অপ্রাকৃত-নবীন-মদন-রূপকে অনাবৃতভাবে সূচিতকরে বলিযা কামবীজকেই প্রণবের রসাত্মক রূপ মনে করা যায়।—ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ।]

বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র কামবীজের দ্বিতীয় অর্থ করিয়াছেন,—(ইহা রসাত্মক অর্থ।)

"ক কারঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
ঈ-কারঃ প্রকৃতী রাধা নিত্য বৃন্দাবনেশ্বরী॥
লশ্চানন্দাত্মকং প্রেম সুখং তয়োশ্চ কীর্ত্তিতম্।
চুম্বনানন্দ মাধুর্য্যং নাদ বিন্দুঃ সমীরিতঃ॥"

'ক' কারের অর্থে—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ।

'ল' কারের অর্থে—রাধাকৃষ্ণের প্রেম জনিত পরম সুখ সমুদ্র।

'ঈ' কার অর্থে—নিত্য বৃন্দাবনেশ্বরী পরমা প্রকৃতি শ্রীরাধা।

'নাদ' ও 'বিন্দু' অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু—শ্রীরাধাকৃষ্ণের চুম্বন জনিত পরমানন্দময় মাধুর্য্য। ৬

কামবীজ যে কেবল অক্ষরময় তাহা নহে ইহা শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের স্বরূপ।

'ক' কার—শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশ, ললাট ভ্রূ-যুগল, নাসিকা, নেত্র, কর্ণ ইত্যাদি।

'ল' কার—তাঁহার গণ্ড দেশ, চিবুক, গ্রীবা, কণ্ঠ ও পৃষ্ঠ।

ঈ কার—তাঁহার স্কন্ধ, বাহু, হস্তাঙ্গুলি ইত্যাদি।

অর্দ্ধচন্দ্র—তাঁহার বক্ষঃস্থল, উদর, পার্শ্বদেশ, নাভি, কটি।

বিন্দু—তাঁহার উরু, জানু, জঙ্ঘা, পদের অঙ্গুলি ইত্যাদি।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ কামবীজময় বিগ্রহ ধারী। ৭

তৎপরে কামবীজের অন্তর্গত পঞ্চ অক্ষর পঞ্চ পুষ্পবাণ সদৃশ।

'ক' কার হইতেছে আম্রমুকুল, 'ল' কার অশোক পুষ্প, ঈ কার মল্লিকাপুষ্প, অর্দ্ধচন্দ্র মাধবীপুষ্প এবং বিন্দু বকুলপুষ্প।

"ক" কারশ্চাম্র মুকুলো, 'ল' কারশ্চাশোকঃ স্মৃতঃ।
'ঈ' কার মল্লিকা পুষ্পং মাধবী চার্দ্ধচন্দ্রকঃ।
বিন্দুশ্চ বকুল পুষ্প মেতে বাণাস্ম্যরেব চ॥

(শ্রীসনৎ কুমার সংহিতা।) ৮

কাম গায়ত্রীর অর্থ।

গায়ত্রী শব্দের অর্থ—গানকারীর ত্রাণকারক বলিয়া ইঁহার নাম গায়ত্রী গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীত্বং ততঃ স্মৃতম্।) ৯

কামবীজের সহিত সংযুক্ত যে গায়ত্রী, তাঁহার নাম কাম গায়ত্রী। কিম্বা কাম বীজের যে গায়ত্রী তাঁহাই কাম গায়ত্রী। শান্ত দাস্যাদি রস সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে শৃঙ্গার রস, সেই শৃঙ্গার রসময় বিগ্রহ, অপ্রাকৃত নবীন মদন, ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, হইতেছেন এই গায়ত্রীর উপাস্য দেবতা। শ্রীবৃন্দাবন তাঁহার ধাম অর্থাৎ নিত্য বসতি স্থল। ১০

প্রথমে কামবীজ অর্থাৎ ক্লীঁ শব্দ উচ্চারণ পূর্বক 'কামদেব' বলিয়া তাহাতে (আয়) যোগ করিবে। তাহার পর 'বিদ্মহে' বলিয়া অতঃপর 'পুষ্পবাণায়'

বলিবে। অনন্তর 'ধীমহি' বলিয়া 'তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ' বলিবে। তাহা হইলে কাম গায়ত্রী হইলেন, (ক্লীঁ) কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ।" ১১

শ্রীবৃন্দাবনের এই অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণ কলনাদ বিশিষ্ট সুমধুর বংশী-ধ্বনি সহকারে, শ্রীরাধিকাদি প্রেয়সীগণের মন হরণ করেন বলিয়া তিনি ক্লীঁ এই কাম বীজরূপে বিরাজমান। ক্লীমিতি বেণুমাধুর্য্যেন শ্রীরাধিকাদীনাং মনোহরণাৎ)।

শ্রীরাধিকাদি গোপিগণের স্বকীয় লীলামাধুরী দ্বারা বিবেকহরণ করেন বলিয়া তিনি 'কামদেবায়' পদরূপে শোভা পাইতেছেন। লাবণ্য ও গুণমাধুর্য্যাদি দ্বারা শ্রীরাধিকাদিপ্রিয়াবর্গের সম্ভোগরস উদ্দীপন করেন বলিয়া তিনি 'পুষ্পবাণায়' পদরূপে বিরাজ করিতেছেন। ('কামদেবায়েতি লীলামাধুর্য্যেন শ্রীরাধিকাদীনাং বিবেক হরণাৎ। পুষ্পবাণায়েতিলাবণ্যগুণমাধুর্য্যাদিভিঃ শ্রীরাধিকাদীনাং সম্ভোগরসো-দ্দীপনাৎ', শ্রীসনৎকুমার কল্প। ১২

কামগায়ত্রীর পদসমূহের অর্থ।

'কামদেবায় বিদ্মহে' যিনি তদীয় নিজ সুখোৎপাদনকারী যাবতীয় অভিলাষ ভক্তহৃদয়ে প্রকাশ করেন, অথবা যিনি নিজানন্দে বিভোর হইয়া স্বেচ্ছামত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সৃষ্টি প্রভৃতি অন্য কোনও কার্য্যের অনুসরণ না করিয়া কেবল ইচ্ছানুরূপ আনন্দময় লীলা করেন, তিনিই কামদেব। তাঁহাকে অবগত হই। সে কামদেব কি প্রকার তাহা 'পুষ্পবাণায়' পদ দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। যথা ক্লীং এই কামবীজের অন্তর্গত 'ক' কারাদি পঞ্চ অক্ষর আম্রমুকুলাদি পঞ্চবিধ পুষ্প সদৃশ। সেই পঞ্চবিধ পুষ্প শার্ঙ্গ নামক ধনুকের পাঁচটি গুণে পঞ্চবাণরূপে সজ্জিত আছেন যিনি, তিনিই হইতেছেন পুষ্পবাণ। এতাদৃশ যে পুষ্পবাণ, তাঁহাকে ধ্যান করিতেছি। তাঁহার এবম্বিধ স্বরূপ বলিয়া তিনি হইতেছেন অনঙ্গ বা অপ্রাকৃত নবীনমদন। এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণই কামবীজ কামগায়ত্রীর উপাস্য দেবতা। তিনি শৃঙ্গার রসময়, অভিনব কন্দর্প। ১৩

কামগায়ত্রীতে সাড়ে চব্বিশ অক্ষর আছেন, তাঁহারা সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই সকল চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের কোন্ কোন্ স্থানে বিরাজমান, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা এই গ্রন্থের ৭৭। ৮ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে।

কামগায়ত্রীর অর্থ প্রকাশের ইতিহাস।

শ্রীপাদ চক্রবর্তি ঠাকুর মহাশয় এই কামগায়ত্রীর ইতিহাস স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন। যথা "হে বৈষ্ণবগণ! আমি যে কিরূপে এই কামগায়ত্রীর অর্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কামগায়ত্রীর বর্ণ সংখ্যা সাড়ে চব্বিশ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই বর্ণনা হইতে আমি কামগায়ত্রীর অর্থ লিখিতে আরম্ভ করিলাম বটে, কিন্তু প্রথমেই আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী কামগায়ত্রীর অক্ষর সংখ্যা 'পঞ্চবিংশতি' না বলিয়া, কোন্ প্রমাণে বা কি অভিপ্রায়ে সার্দ্ধ চব্বিশ বলিলেন। শাস্ত্রে যাহা শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি সমস্তই বিচার করিয়া দেখিলাম, কিন্তু অর্দ্ধ অক্ষর কিরূপে হইতে পারে, ইহা কোনক্রমে আমার বোধগম্য হইল না।

দ্বিতীয়তঃ ভাবিতে লাগিলাম যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কি 'ং'-কে অর্দ্ধ অক্ষর বলিয়া নির্ণয় করিলেন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাঁহার বর্ণনা ক্রমভঙ্গ দোষে দূষিত হইল, কেননা শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রম-অনুসারে চরণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গে সাড়ে চব্বিশ অক্ষরকে যথাক্রমে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করিবার সময় ক্রমপ্রাপ্ত শেষ পদনখকে অর্দ্ধ চন্দ্র বলা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না বলিয়া তিনি ললাটকে অর্দ্ধ চন্দ্র বলিয়াছেন। যথা 'ললাটে অষ্টমী ইন্দু') ইত্যাদি।

এইরূপে দুইটি সন্দেহ নিরাকরণ করিতে না পারায় মনে করিলাম মন্ত্রাক্ষরের অর্থ যদি অবগত হইতে না পারি, তাহা হইলে মন্ত্র দেবতার সাক্ষাৎ কিরূপে পাইব। সুতরাং মৃত্যুই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া রাধাকুণ্ডের তটে পড়িয়া রহিলাম। এইরূপ অবস্থায় রাত্রি দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইল। আমার তন্দ্রা উপস্থিত হইল। তখন কি দেখিলাম যে বৃষভানু রাজনন্দিনী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিতেছেন, 'হে বিশ্বনাথ, হে হরিবল্লভ! তুমি উঠ। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা লিখিয়াছে তাহা সমস্তই সত্য। সে আমার নর্ম সহচরী, আমার অনুগ্রহে সে আমার অন্তর সব জানে। 'বর্ণা মভাস্বৎ' নামক গ্রন্থে অর্দ্ধাক্ষর সম্বন্ধে যাহা নিরূপিত হইয়াছে, সেই অনুসারে কবিরাজ অর্দ্ধ-অক্ষর নির্ণয় করিয়াছে। তুমি সেই গ্রন্থ দেখ।"

'বর্ণাগমভাস্বৎ' গ্রন্থানুসারে যে 'য়' কারের পর 'বি' অক্ষর থাকে সেই 'য়' কারই হইতেছে অর্দ্ধাক্ষর। এতদ্ব্যতীত আর সমস্তই পূর্ণাক্ষর বা পূর্ণচন্দ্র। এই লক্ষণ অনুসারে 'কামদেবায়' পদের 'য়' কারের পর—'বিদ্মহে' পদের 'বি' অক্ষর থাকায় সেই 'কামদেবায়' পদের 'য়'-কারই হইতেছে অর্দ্ধাক্ষর। ইহাই ললাটস্থ অর্দ্ধচন্দ্র।

শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর এইরূপ উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া চেতনালাভ করতঃ গাত্রোত্থান করিলাম। আমার সকল সন্দেহ দূর হইল এবং কবিরাজ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া কামগায়ত্রীর অর্থ প্রকাশ করিলাম।

পরিশিষ্ট (চ) ৮৩-৮৪ পৃঃ

অষ্টবিধ নায়িকা লক্ষণ। (শ্রীরূপের স্তবমালা হইতে গৃহীত।)

"অথাভিসারিকা বাসক সজ্জাপ্যুৎকণ্ঠিতা তথা,
বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা চ কলহান্তরিতাপরা।
প্রোষিত প্রেয়সী প্রোক্তা তথা স্বাধীনভর্ত্তৃকা,
ইত্যষ্টৌ নায়িকাভেদা রসতন্ত্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

১। **অভিসারিকা**—"যা পর্য্যুৎসুক চিত্তাতিমদেন মদনেন চ।
আত্মনাভিসরেৎ কান্তং সা ভবেদভিসারিকা॥"

যে স্ত্রী যৌবনমদ এবং কন্দর্প হেতু পর্য্যুৎসুকমনা হইযা স্বয়ং কান্তের নিকটে গমন করে, তাহাকে অভিসারিকা বলে।

উদাহরণ—**পূর্ণিমা রজনীতে অভিসার।** (গীতাবলী)

"স্ফুরৎ কুচ-বল্লিত-মৌক্তিক-মালা।
স্মিত-সান্দ্রীকৃত-শশি-কর-জালা॥১
হরিমভিসর সুন্দরি সিতবেশা।
রাকা রজনি রজনি গুরুরেষা॥ধ্রু
পরিহিত মাহিষদধিরুচিসিচয়া।
বপুরর্পিত ঘনচন্দন নিচয়া॥২
কর্ণকরম্বিত কৈরব হাসা।
কলিত-সনাতনসঙ্গবিলাসা॥"৩

হে সখি! তুমি স্তন যুগলের উপর সুন্দর মৌক্তিক হার পরিধান করিয়াছ। তোমার ঈষৎ হাস্তের দ্বারা চন্দ্রের কিরণ মালাও দ্বিগুণ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে।

হে সুন্দরি, শুভ্র বেশ ধারণ করিয়া হরির নিকট অভিসার কর, যেহেতু এই মনোহর পূর্ণিমা রজনী সমুপস্থিত এবং গুরুরূপে তোমাকে এই উপদেশ দিতেছে।

মাহিষ দুগ্ধের দধির স্থায় শুভ্র বসন পরিধান করিয়াছ এবং শরীরে ঘন চন্দন অর্পণ করিয়াছ। ২

প্রফুল্ল কুমুদ কুসুমের কর্ণভূষণ ধারণ করিয়াছ, অতএব সনাতন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম সুখলাভের উপায় বাকা রজনীর উপযুক্তই হইয়াছে। ৩

কৃষ্ণা রজনীতে অভিসার

"হন্তনকিমু মন্থরয়সি
সন্তত মভিজল্পম্।
দন্তরোচি রন্তরযতি
সন্তমসমনল্পম্ ॥১
রাধে পথিমুঞ্চভূরি
সম্ভ্রমমভিসারে।
চারয় চরণাম্বুরুহে
ধীরং সুকুমারে।ধ্রু
সন্তমুঘন-বর্ণমতুল
কুন্তল-নিচয়ান্তম্।
ধ্বান্তং তব জীবতু নখ—
কান্তিভিরভিশান্তম্ ॥২
সসনাতন মানসান্ত
যান্তী গতশঙ্কম।
অঙ্গীকুরু মঞ্জু কুঞ্জ
বঞ্জুলমঙ্কম্ ॥৩

হায় রাধে, তুমি অনর্গল বকিও না, ক্ষান্ত হও। কারণ তোমার দন্তরুচি নিবিড় অন্ধকারকে বিদূরিত করিতেছে। সুকোমল চরণ কমলে ধীরে ধীরে চল। অভিসার বিষয়ে পথিমধ্যে বিন্দুমাত্র ভয় করিও না। যাহাতে তোমার নখাগ্রগণ হইতে জ্যোতিঃ নির্গত না হয়, সে কারণ তোমার নিবিড় জলদজালতুল্য কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ কেশ

কলাপে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত কর। নখকান্তিতে বিদুরিত অন্ধকার জীবিত থাকুক। ওগো সনাতন কৃষ্ণে সমর্পিত চিত্ত! অদ্য নির্ভয়ে অভিসার করিয়া মনোহর কুঞ্জগৃহের অঙ্কদেশ অলঙ্কৃত কর।

২। **বাসক সজ্জা**--"ভবেদ্বাসক সজ্জাসৌ সজ্জিতাঙ্গরতালয়া।
নিশ্চিত্যাগমনং ভর্ত্তুর্দ্বারেক্ষণ পরায়ণা॥"
(বঙ্গানুবাদ ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

উদাহরণ-- "কুসুমাবলিভিরুপস্কুরুতল্পম্
মাল্যঞ্চামল-মণিসর-কল্পম্॥১
প্রিয়সখি কোল-পরিচ্ছদ-পুঞ্জম্
উপকল্পয় সত্বরমধিকুঞ্জম্॥ধ্রু
মণিসম্পুটমুপনয় তাম্বূলং।
শয়নাঞ্চলমপি পীত-দুকূলম্॥২
বিদ্ধি সমাগতমপ্রতিবন্ধম্।
মাধবমাশু সনাতন-সন্ধম্॥৩

হে প্রিয়সখি, কুসুম সজ্জা রচনা কর। আমার মণিহার তুল্য পুষ্পমালা গাঁথিয়া রাখ। বিহারোপযোগী উপকরণ দ্বারা কুঞ্জগৃহ সজ্জিত কর মণিময় সম্পুটে তাম্বুল ভরিয়া লইয়া আইস। শয্যা প্রান্তে পীত বসন রাখিয়া দাও। জানিও, সনাতন সন্ধ অর্থাৎ সত্য প্রতিজ্ঞ এবং বাধাশূন্য মাধব আগতপ্রায়।

৩। **উৎকণ্ঠিতা**—"সা স্যাদুৎকণ্ঠিতা যস্যাবাসং নৈতিক্রতং প্রিয়ঃ।
তস্যানাগমনেহেতুং চিন্তয়ন্ত্যাঃ শুচাভৃশং।"
(বঙ্গানুবাদ ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

উদাহরণ—কিমু চন্দ্রাবলিরনয় গভীরা।
অরুণদমুং রতি-বীর মধীরা॥১
অতি চিরমজনি বর্জ্জনিবতিকালী।
সঙ্গমবিন্দত নহি বনমালী॥ধ্রু
কিমিহগুনে ধৃত পঙ্ক বিপাকে।
বিস্মৃতিবস্য বভূব বরাকে॥২
কিমুত সনাতন-তনুরলঘিষ্ঠং।
রণমারভতসুবারিভিরিষ্ঠং॥৩

বোধহয় অতি প্রগলভা কুটিলা চন্দ্রাবলী এই রতিবীর কৃষ্ণকে রুদ্ধ করিয়া থাকিবে। এই রাত্রি বহুক্ষণ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তথাপি বনমালী আমার সহিত মিলিত হইলেন না।

অথবা বলিতে পারিনা, এই অভাগিনীর কোন পাপের বিপাক দশা উপস্থিত হইয়া থাকিবে, সেইজন্যই তিনি এই বরাকীকে ভুলিয়া গিয়াছেন।

অথবা তিনি যুদ্ধ প্রিয়, হয়তো কোন দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

৪। **বিপ্রলব্ধা**—"যস্যাদূতীং স্বয়ং প্রেষ্য সময়ে নাগতঃ প্রিয়ঃ।
শোচন্তী তং বিনা দুঃস্থা বিপ্রলব্ধাতু সাস্মৃতা ॥"

যে নায়িকা স্বয়ং দূতী প্রেরণ করিয়াও কান্তের অনাগমন জন্য অধীরা হইয়া অনাগত প্রিয়ের নিমিত্ত শোক করেন, তাহাকে বিপ্রলব্ধা বলে।

উদাহরণ—"কোমল কুসুমাবলী রচিতশয়নং।
অপসারয় লীলা-শয়নং ॥১
শ্রীহরিণাদ্য ন লেভে সময়ে।
হন্ত ভজামি কং শরণং সময়ে ॥কি
বিধৃত মনোহর গন্ধ বিলাসং।
অপসারয় নব-ভূষণ-বাসং ॥২
লক্ষমবেহি নিশা-গরিমাণং।
মুঞ্চ সনাতন সঙ্গতি কামং ॥ ৩

হে সখি! কোমল কুসুমাবলী রচিত লীলা শয্যা দূরে নিক্ষেপ কর। ১

অদ্য হরিকে সময়ে লাভ করিতে পারিলাম না, হায় এখন আর কোন্ জনকে আশ্রয় করিব? কে আমাকে সান্ত্বনা করাইয়া দিবে।

এই বিধৃত মনোহর গন্ধ বাস ও চারু ভূষণ দূরে নিক্ষেপ কর।২

সম্প্রতি রজনীর শেষ প্রহর হইয়াছে, সনাতন কান্তের অভিলাষ পরিত্যাগ কর।৩

৫। **খণ্ডিতা**—"অন্যযা সহ কান্তং দৃষ্টে সম্ভোগ লক্ষণে।
ঈর্ষ্যা কষায়িতান্তঃ সৌ খণ্ডিতা খলু কথ্যতে ॥"

যে নায়িকা কান্তের অঙ্গে অন্য স্ত্রী সম্ভোগ দর্শন করিয়া ঈর্ষা বশতঃ অতিশয় কোপান্বিতা হন, তাঁহাকে খণ্ডিতা নায়িকা বলে।

উদাহরণ—হৃদয়াস্তরমধিশয়িতং।
রময় জনং নিজদয়িতং ॥
কিং ফলমপরাধিকয়া।
সম্প্রতি তব রাধিকয়া ॥১
মাধব পরিহর পটিম-তরঙ্গং।
বেত্তি নকা তব রঙ্গং ॥ধ্রু
আঘূর্ণতি তব নয়নং।
যাহি ঘটীং ভজ শয়নং ॥
অনুলেপং রচযালং।
নশ্যতু নখ-পদ-জালং ॥২
ত্বামিহ বিহসতি বালা।
মুখর-সখীনাং মালা ॥
দেব সনাতন বন্দে।
ন কুরু বিলম্বমলিন্দে ॥"৩

(পক্ষে অনিন্দে পাঠ আছে)

যিনি তোমার হৃদয়ে সর্বদা অধিশায়িত, তুমি সেই প্রিয়ার সহিত রমন কর। এই অপরাধিণী রাধিকাকে তোমার এখন প্রয়োজন কি?১

হে মাধব, তুমি আমার সহিত ছলনা করিও না। (অর্থাৎ তুমি বলিতেছ তুমি আমার জন্য নিকুঞ্জে বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছ), তোমার কপটতা কোন্ স্ত্রী না অবগত আছে?

তোমার আঁখি দুটি ঘুমে ঢুলু ঢুলু, যাও ঘটিকাকাল শয্যায় শয়ন কর এবং শরীরে চন্দনাদি অনুলেপন কর, তাহা হইলে তোমার প্রিয়ার নখক্ষতগুলি বিনষ্ট হইবে।২

ঐ দেখ আমার মুখরা সখী সকল তোমাকে পরিহাস করিতেছে। অতএব হে দেব সনাতন, হে অনিন্দে অর্থাৎ সত্যবাদী আমি তোমাকে বন্দনা করি, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়া আমাকে বঞ্চনা করিও না। তুমি আমার আঙিনায় (অলিন্দে) বৃথা বিলম্ব করিও না।৩

৬। **কলহান্তরিতা**—"নিরস্তোমন্যুনা কান্তো নমন্নপি ময়া পুরঃ।
সান্তাপমূত্তাদীনা কলহান্তরিতা ভবেৎ ॥"

যে নায়িকা অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া, কান্ত পুনঃ পুনঃ বিনম্র হইলেও অগ্র হইতে বিদায় দিয়া পুনর্বার তাহার নিমিত্ত অনুতাপ করে, তাহাকে কলহান্তরিতা বলে।

উদাহরণ—"নাকর্ণয়মতি সুহৃদুপদেশম্।
মাধব চাটু পটলমপিলেশম্ ॥১
সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরম্।
যদভজমিহ নহি গোকুলবীরম্ ॥ধ্রু
নালোকয়মর্পিতমুরুহারম্।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমন্তবারম্ ॥২
হন্ত সনাতন-গুণমভিযান্তম্।
কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তম্ ॥"৩

হায়, আমি আমার প্রিয় ললিতাদি সুহৃদ্বর্গের উপদেশ শুনি নাই, মাধব যে কত চাটুপটল অর্থাৎ প্রিয় ব.ক্য বলিলেন, তাহার বিন্দুমাত্রও শ্রবণ করিলাম না।১

হে সখি! আমি কুঞ্জমধ্যে গোকুল বীরকে ভজনা করি নাই, সেইজন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

আহা সেই মাধব আমাকে উৎকৃষ্ট মাল্য অর্পণ করিলেন এবং বারংবার প্রণাম করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করি নাই।২

হায়, সেই সমাতন (নিত্যগুণযুক্ত) কান্তকে কেন বক্ষে ধারণ করিলাম না ?৩

[লক্ষ্য কবিতে হইবে যে, এই সকল শ্লোকের প্রত্যেকটির শেষে 'সনাতন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সনাতন শব্দে এক অর্থে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে। অপর অর্থে শ্রীরূপ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসনাতন গোস্বামীকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই শ্লোকটিতে সনাতন শব্দে নিত্য গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে। পক্ষে সনাতন গোস্বামী কীর্ত্তিত গুণ বিশিষ্ট কৃষ্ণকে এই অর্থও প্রকাশ করা হইয়াছে।

৫। খণ্ডিতা শ্লোকে সনাতন এক অর্থে হে দেব সনাতন অর্থাৎ হে নিত্য ক্রীড়াপর কৃষ্ণ আমি তোমাকে বন্দনা করি। (শ্রীরাধার উক্তি) অপর পক্ষে ভক্ত সনাতন গোস্বামীর উক্তি—হে দেব সনাতন আমি তোমাকে প্রণাম করি, তুমি আর শ্রীমতীকে মিথ্যা বাক্যে উত্যক্ত করিও না। অপব অপর শ্লোকেও এইরূপ অর্থ করিতে হইবে।]

৭। **প্রোষিত প্রেয়সী**—"কুতশ্চিৎ কারণাৎ যস্যা বিদূরস্থো ভবেৎ পতিঃ।
তদসঙ্গম দুঃখার্ত্তা সা স্যাৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা ॥"

যাঁহার পতি কোন কারণে বিদেশে গমন করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন, সেই পতির বিরহ দুঃখে যিনি অতিশয় পীড়িতা হন, তাঁহাকে প্রোষিত ভর্তৃকা অর্থাৎ বিরহিণী নায়িকা বলে।

উদাহরণ—মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধব শ্রীরাধার বিরহ জ্ঞাপন করিতেছেন ;—

"কুর্ব্বতি কিল কোকিল কুহু উজ্জ্বল কলনাদম্।
জৈমিনি রিতি জৈমিনি রিতি জল্পতি সবিষাদম্ ॥১
মাধব ঘোরে বিয়োগতমসি নিপপাত রাধা।
বিধুর মলিন-মূর্ত্তিরধিক মধিরূঢ় বাধা ॥ধ্রু
নীলনলিন মাল্য মহহবীক্ষ্য পুলকবীতা।
গরুড়্ গরুড়্ গরুড়েত্যতি রৌতি পরমভীতা ॥২
লম্বিত মৃগনাভি-মগুরু-কর্দ্দমমনুদীনা।
ধ্যায়তি শিতিকণ্ঠমপি সনাতন মস্তলীনা।"৩

হে কৃষ্ণ, কোকিলগণ 'কুহু কুহু' রবে উজ্জ্বল কলনাদ করিলে, শ্রীরাধা ঘোর বিয়োগান্ধকারে নিপতিত হইয়া, নিরতিশয় বিষাদের সহিত বজ্রপাত আশঙ্কা করিয়া 'জৈমিনি জৈমিনি' এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। হে মাধব! শ্রীরাধা বিয়োগান্ধকারে নিপতিত হইয়াছেন, তাঁহার শরীর মলিন হইয়াছে, তিনি কোন বাধা মানিতেছেন না।

নীল পদ্মের মালা দর্শন করিয়া সর্প ভ্রমে অঙ্গে রোমাঞ্চ বহন করতঃ ভীতা হইয়া 'গরুড় গরুড়' এই শব্দ বারবার উচ্চারণ করিতেছেন।২

মৃগনাভিযুক্ত অগুরুচন্দন দর্শনে শ্যামবর্ণ অনঙ্গের ভ্রমে ত দ্বরী শিতিকণ্ঠকে ধ্যান করিতেছেন এবং হে সনাতন তোমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া লীনা হইতেছেন।৩

৮। **স্বাধীন ভর্ত্তৃকা**—"যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টঃ প্রিয়ঃ পার্শ্বং ন মুঞ্চতি।
বিচিত্রসংভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্তৃকা ॥"

যাঁহার কান্ত তাঁহার প্রেমে এবং গুণে আকৃষ্ট হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এবং যে নায়িকা বিচিত্র বিলাস সক্ত, তাহাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে।

বিলাসাবসানে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন ;—

"পত্রাবলিমিহ মমহৃদি গাবে।
মৃগমদবিন্দুভিরর্পয় শৌরে ॥১

শ্যামল সুন্দর বিবিধ বিশেষম্ ।
বরচয় বপুষিমোজ্জ্বল বেশম্ ॥ধ্রু
পিঞ্ছমুকুট মম পিঞ্ছনিকাশম্ ।
বরমবতংসয় কুন্তল পাশম্ ॥২
অত্র সনাতন শিল্প লবঙ্গম্ ।
শ্রুতিযুগলে মম লম্ভয সঙ্গম্ ॥"৩

হে শৌরে, এই গৌরবর্ণ মদীয় বক্ষঃস্থলে মৃগমদ বিন্দুর দ্বারা পত্রাবলি (বিচিত্র তিলক) রচনা কর ।১

হে শ্যামল সুন্দর, আমার অঙ্গে উজ্জ্বল বেশ প্রস্তুত কর। হে পিঞ্ছভূষিত আমার সুন্দর কেশ পাশ কুসুম দ্বারা বিভূষিত কর ।২

হে সনাতন! আমার কর্ণদ্বয়ে লবঙ্গ পুষ্পের কর্ণিকা রচনা কর ।৩

পরিশিষ্ট (ছ)

পৃষ্ঠা ৮৬ স্থায়ী এবং ব্যভিচারী ভাব

শ্রীরাধার মধুরাখ্য স্থায়ী ভাব এক, ব্যভিচারীভাব তেত্রিশ, হাসাদিভাব সাত, একুনে ৪১ প্রকার। ভঃ রঃ সিঃ দক্ষিণ বিভাগ ৪র্থ লহরী ১১৭ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ।

"ত্রয়স্ত্রিংশ দিমেহষ্টৌ চ বক্ষ্যন্তে স্থায়িনশ্চযে।
মুখ্য ভাবাভিধাস্ত্বেকঃ চত্বারিংশদমী স্মৃতা ॥"

ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাস্য প্রভৃতি সাতটি ও একটি মুখ্য যাহা স্থায়ীভাবে বর্ণিত হইবে, এই সমুদায়ে একচত্বারিংশৎ ভাব হইয়া থাকে। স্থায়ীভাব—হাস্য প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাব সকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে তাহাকে স্থায়ীভাব বলে। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়া রতিকেই স্থায়ীভাব বলে। মুখ্য ও গৌণ ভেদে এই রতি দুই প্রকার হয়। (ভঃ রঃ সিন্ধু দক্ষিণ বিভাগ ৫ম লহরী)

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাংনয়ন্ ।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভাব উচ্যতে ॥১
স্থায়ীভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ারতিঃ ।
মুখ্যা গৌণীচ সা দ্বেধা রসজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥২

উজ্জ্বল নীলমণি বলেন, শৃঙ্গার রসে মধুরা রতিই স্থায়ীভাব।

"স্থায়িভাবোঽত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ ॥" (স্থায়িভাব প্রঃ ১)

শ্রীরাধার মধুরাখ্য স্থায়ীভাব—নিত্য নব নবানুরাগ।

ব্যভিচারীভাব—যাহা বিশেষ করিয়া প্রাধান্যরূপে স্থায়িভাবে বিচরণ করে, তাহা ব্যভিচারীভাব। এই ব্যভিচারিভাব সকল স্থায়িভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া ইহাদিগকে সঞ্চারিভাবও বলা হয়। ব্যভিচারিভাব সকল স্থায়িভাবরূপ অমৃত সাগরে মগ্ন হইযা তরঙ্গের ন্যায় স্থায়িভাবকে বর্ধিত কবে এবং স্বরূপ ভাবও প্রাপ্ত হয়।

ব্যভিচারিভাব তেত্রিশ যথা ১) নির্ব্বেদ ২) বিষাদ ৩) দৈন্য ৪) গ্লানি ৫) শ্রম, ৬) মদ, ৭) গর্ব, ৮) শঙ্কা, ৯) ত্রাস, ১০) আবেগ, ১১) উন্মাদ, ১২) অপস্মৃতি, ১৩) ব্যাধি, ১৪) মোহ, ১৫) মৃতি, ১৬) আলস্য, ১৭) জাড্য, ১৮) ব্রীড়া, ১৯) অবহিত্থা, ২০) স্মৃতি, ২১) বিতর্ক, ২২) চিন্তা, ২৩) মতি, ২৪) ধৃতি, ২৫) হর্ষ, ২৬) ঔৎসুক্য, ২৭) ঔগ্র, ২৮) অমষ, ২৯) অসূয়া, ৩০) চাপল্য, ৩১) নিদ্রা, ৩২) সুপ্তি, ৩৩) বোধ। (বিশেষ বিবরণ ভঃ রঃ সিঃ দক্ষিণ বিভাগ ৪র্থ লহরী এবং উজ্জ্বল নীলমণি-ব্যভিচাবি প্রকরণ দ্রষ্টব্য।)

হাসাদিভাব সাত—যথা হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জুগুপ্সা অর্থাৎ নিন্দা—এই সাত প্রকার। ভঃ রঃ সিঃ ২।৫।২২

"হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ শোকঃ ক্রোধোভয়ংতথা।
জুগুপ্সা চেত্যসৌভাব বিশেষঃ সপ্তধোদিতঃ ॥"

পরিশিষ্ট (জ)

ভ্রমর গীত

'উজ্জ্বল নীলমণিব উপর ভিত্তি কবিযা ১২২ পৃষ্ঠায় শ্রীরাধাব যে দশটি জল্পময়ী বাণীর বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং যাহা 'ভ্রমব গীত' নামে প্রখ্যাত, সেই জল্পগুলির 'উজ্জ্বলের' সূত্র এবং ভাগবতের শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্থায়িভাব প্রকরণ

১। প্রজল্পঃ—অসূয়েৰ্ষ্যামদযুজা যোঽবধীরণ মুদ্রযা।
প্রিয়স্যাকৌশলোদগারঃ প্রজল্পঃ সতুকীর্ত্ত্যতে ॥১৯৯

যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৪৭।১২)

"মধুপকিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিত-মালা কুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিডম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্ ॥"

২। পরিজল্পিতম্—"প্রভোর্নির্দ্দয়তা-শাঠ্য-চাপল্যাদ্যুপপাদনাৎ।
স্ববিচক্ষণতা-ব্যক্তির্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতম্ ॥"২০১

যথা তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৭।১৩)

"সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা,
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা,
অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমশ্লোকজল্পৈঃ ॥"

৩। বিজল্পঃ—"ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়-মান মুদ্রান্তরালয়া।
অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তির্বিজল্পো বিদুষাং মতঃ ॥"২০৩

যথা তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৭।১৪)

"কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনা-
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্?
বিজয় সখ-সখীনাং গীয়তাং তৎ প্রসঙ্গঃ,
ক্ষপিত-কুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥"

৪। উজ্জল্পঃ—"হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্ব্বগর্ভিতয়েৰ্ষ্যয়া।
সাসূয়শ্চ তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জল্প ঈর্য্যতে ॥"২০৫

যথা তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৭।১৫)

"দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্ দুরাপাঃ,
কপট-রুচির-হাস-ভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ?
চরণ রজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা,
অপিচ কৃপণ পক্ষে হ্যুত্তমঃ শ্লোক-শব্দঃ ॥"

৫। সংজল্পঃ—"সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপ মুদ্রয়া।
তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্পঃ কথিতো বুধৈঃ ॥"২০৭

যথা তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৭। ৬)

"বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ
রনুনয় বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্য পত্যন্য লোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্ ?"

৬। বিজল্পঃ—"হরৌ কাঠিন্যকামিত্ব-ধৌর্ত্তাদাসক্ত্য যোগ্যতা।
যত্র সের্ষ্যং ভিযেবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাংমতঃ ॥"২০৯

যথা তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৭।১৭)

"মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধেঽলুব্ধ ধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্
বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্য
স্তদলমসিত সখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎ কথার্থঃ ॥"

৭। অভিজল্পিতং—"ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য খগানামপিখেদনাৎ।
যত্র সানুশযং প্রোক্তা তদভবেঽভিজল্পিতম্ ॥"২১১

যথা তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৭।১৮)

"যদনুচরিত লীলা কর্ণপীযূষবিপ্রুট্
সকৃদদনবিধূত-দ্বন্দ্বধর্ম্মাবিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহ কুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা,
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্যাং চরন্তি।"

৮। আজল্পঃ "জৈহ্ম্যং তস্যার্ত্তিদত্বঞ্চ নির্ব্বেদাদ্ যত্র কীর্ত্তিতম্।
ভঙ্গ্যান্যসুখদত্বঞ্চ স আজল্প উদীরিতঃ ॥"২১৩

যথা তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৭। ১৯)

"বয়মৃতমিব জিহ্ম ব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ।
দদৃশুরসকৃদেতত্তন্নখস্পর্শ-তীব্র—
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তা ॥"

৯। প্রতিজল্পঃ—"দুস্ত্যজদ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নার্হে'ত্যনুদ্ধতম্।
দূতসম্মাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজল্পকঃ ॥"২১৫

যথা তত্রৈব (ভা: ১০।৪৭।২০)

"প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং,
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ ?
নয়সি কথমিহাস্মানদুস্ত্যজ-দ্বন্দ্ব পার্শ্বং,
সতত মুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে ॥"

১০। সুজল্পঃ—"যত্রার্জবাৎ সগাম্ভীর্যং সদৈন্যং সহচাপলম্।
সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ সসুজল্পোনিগদ্যতে ॥"২১৭

যথা তত্রৈব (ভা: ১০।৪৭।২১)

"অপিবত মধুপুর্যামার্য্য পুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্ ?
ক্বচিদপি সকথাং নঃ কিঙ্করীনাং গৃণীতে,
ভুজমগুরু সুগন্ধংমূর্দ্ধ্যধাস্যৎ কদানু ?"

পরিশিষ্ট (ঝ)

শূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন।

(৬) অবজল্প—পৃষ্ঠা ১২৫-১২৫

পিতৃসত্যপালনার্থ শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত অরণ্যে বাস করিতেছিলেন তখন লঙ্কাধিপতি দশাননের ভগিনী শূর্পণখা, শ্রীরামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে সুন্দরী রমণীর ছদ্মবেশে তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। শ্রীলক্ষ্মণ যখন তাহাকে লইয়া উপহাস করিতেছিলেন তখন মায়াবিনী শূর্পণখা রাক্ষসীরূপ ধরিয়া সীতাদেবীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে ইঙ্গিতে বিনাশ করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন। যথা—

'শ্রীরাম বলেন ভাই ছাড় উপহাস।
ইঙ্গিতে বলেন কর ইহার বিনাশ॥
ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।
একবাণে তার কাটিল নাক কান॥"

(কৃত্তিবাসী রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড)

যদিও শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং সূর্পণখার নাক কান কাটিয়া দিয়া তাহাকে বিরূপ করেন নাই, তথাপি তাঁহার প্ররোচনায় ইহা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীরামচন্দ্রের উপর দোষোদ্গার করিয়া তাঁহার প্রলাপের মধ্য দিয়া 'অসিতের নিষ্ঠুরতা' ব্যক্ত করিলেন।

পরিশিষ্ট (এ৩)

পৃষ্ঠা — ১৩০ তরঙ্গ সপ্তদশ।

মহাপুরাণের লক্ষণ।

ভাগবতকে মহাপুরাণ বলে। মহাপুরাণের দশটি লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতের ২।১০।১-২ শ্লোকে বর্ণিত আছে, যথা,—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণ মূতয়ঃ।
মন্বন্তরে শানু কথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥"

মহাপুরাণ ভাগবত শাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয় এই দশটি লক্ষণ বর্ণিত আছে। দশম পদার্থ-আশ্রয় তত্ত্বের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণের নিমিত্ত অপরাপর নয়টি পদার্থ বর্ণিত হইয়াছে। বিদুর, মৈত্রেয় প্রভৃতি মহাত্মাগণ কোন স্থলে শ্রুত্যাদি শব্দের দ্বারা, কোন স্থলে তাৎপর্য্য বৃত্তির দ্বারা এবং কোন স্থলে সাক্ষাৎ বিচার দ্বারা এই নয়টি পদার্থের বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন। "আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ। এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ॥" (১।২।৭৭)

(১) সর্গ—আকাশাদি পঞ্চভূত (ক্ষিতি অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম), তাহাদের পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ), পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ) এবং ইহাদের অধিনায়ক মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং ধী অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কারতত্ত্ব--এই সকল উৎপত্তির কারণ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর, ব্রহ্মানহেন। অতএব পরমেশ্বর হইতে জন্ম বা উৎপত্তির নাম সর্গ বা কারণ সৃষ্টি। (ভূতমাত্রেন্দ্রিয়-ধিয়াং জন্ম ব্রহ্মণো গুণ বৈষম্যাৎ।") ভাঃ ২।১০।৩

(২) বিসর্গ—প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের পরিণাম বশতঃ পুরুষ বা ব্রহ্মার কৃত স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টির নাম বিসর্গ। ইহা কার্য্য সৃষ্টি।

সর্গ এবং বিসর্গ এই দুয়ের অর্থই সৃষ্টি। তবে ব্রহ্মার সৃষ্টির নাম বিসর্গ এবং গুণত্রয়ের বৈষম্য হেতু পরমেশ্বর হইতে পঞ্চ মহাভূতাদির যে সৃষ্টি তাহাকে বলে সর্গ।

৩) স্থান বা স্থিতি স্থিতি অর্থে পালন। ভাগবত ২।১০।৪-৫ শ্লোকে বলিয়াছেন,

"স্থিতি বৈকুণ্ঠ বিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ।
মন্বন্তরানি সদ্ধর্ম উতয়ঃ কর্ম বাসনাঃ ॥
অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্তিনাম্।
পুংসামীশ কথাঃপ্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ ॥"

বৈকুণ্ঠ বিজয় শব্দের একটি অর্থ বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ ভগবানের বিজয়। বৈকুণ্ঠের যেমন একটি অর্থ স্থান তেমনি বৈকুণ্ঠ অর্থে ভগবানকেও বুঝায়। এই অর্থে সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা এবং সংহার কর্তা শম্ভু হইতে যাঁহার উৎকর্ষ। আর একটি অর্থ, বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ ভগবান কর্তৃক জীব-দুঃখের অভিভব বা দূরীকরণ। বিজয় অর্থে অভিভব। অথবা—সৃষ্টির পর জীবগণের স্থিতিতে ভগবানের বিজয় অর্থাৎ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। কারণ সৃষ্ট জীবাদির পালন জন্য তিনি সূর্য, বায়ু প্রভৃতিকে তাহাদিগের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন।

ভাগবতে ৩।২৫।৪২ শ্লোকে ভগবদুক্তি; "মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ। বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥"

বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও মৃত্যু ভগবানের ভয়ে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়মিতভাবে আগ্রহশীল।

(৪) পোষণ—সাধক ভক্তগণের প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ তাহারে নাম পোষণ।

(৫) মন্বন্তর—সাধুগণের অর্থাৎ মন্বন্তরাধিপতি মনুগণের ধর্ম, যাহা ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে তাঁহাদের চরিত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার নাম সদ্ধর্ম।

(৬) উতি প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত কর্ম হইতে উত্থিত বাসনার নাম উতি। সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম সমূহের কারণ ভূত শুভ ও অশুভ বাসনা। ইহা দ্বারা স্থিতিতে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট জীবগণের স্বভাব কথিত হয়।

(৭) ঈশানুকথা—হরির অবতার সমূহের আচরিত ক্রিয়াদি এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী অবতারের পরিকর ভক্তগণের অবতারানুচরিতকে ঈশানুকথা বলে। এই সকল কথা নানা উপাখ্যান যোগে বর্ণিত হওয়ায় অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

(৮) নিরোধ—স্থিতির পরে মহাপ্রলয়ে জীবগণের পরমেশ্বরে লয় প্রাপ্তিকে নিরোধ বলে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি- তদ্‌ব্রহ্মেতি।" যাহা হইতে এই সকল প্রাণী জাত হইয়াছে, (সৃষ্টি), জাত হইয়া যাহারা জীবিত আছে (স্থিতি) এবং প্রলয়কালে যাহাতে গমন ও সর্বতোভাবে প্রবেশ করে (লয়) তিনিই ব্রহ্ম। অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্তা যিনি তিনিই ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর।

(৯) মুক্তি মায়িক স্থূল এবং সূক্ষ্ম এই রূপদ্বয় ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ জীবস্বরূপে ব্যবস্থিতিকে মুক্তি বলে। স্বরূপে ব্যবস্থিতি অর্থে অষ্ট গুণ বিশিষ্ট জীব স্বরূপে পুনরাবৃত্তি শূন্য ভগবৎ সন্নিধানে স্থিতিই মুক্তি। ছান্দোগ্য উপনিষদ জীব স্বরূপের অর্থাৎ আত্মার আটটি লক্ষণ দেখাইয়াছেন, যথা আত্মাঽপহত পাপ্মা, বিজরো, বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎ সোঽপিপাসঃ, সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ" ৮।৭।১

অর্থাৎ আত্মা মায়ার অবিদ্যাদি পাপ-বৃত্তি-সম্বন্ধ-শূন্য, জরাধর্ম রহিত, নিত্য নবীন, মৃত্যুশূন্য, শোকাতীত, প্রাকৃত ক্ষুধা ও পিপাসা রহিত, অপ্রাকৃত ও নির্দোষ কামনাযুক্ত বাসনা মাত্রই সিদ্ধি কাম; সেই আত্মাই অনুসন্ধনীয়।

জীব মুক্তিলাভ করিয়া এই স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিন্ময় জ্যোতিঃ সম্পন্নরূপ নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন, তিনি উত্তম পুরুষ সেই চিদ্ধামে পরমানন্দ লাভ করেন।

[এব মৈবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি নিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ সতত্র পর্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ॥ ৮।১২।৩]

ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার ব্যতীত জীব শুদ্ধজীব স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। সুতরাং মুক্তি বলিতে সাধারণতঃ ভগবৎ স্বরূপের সাক্ষাৎ কার বুঝায়।

(১০) আশ্রয়—"আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে।

স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ২।১০।৭)

যাঁহা হইতে সৃষ্টি (আভাস) ও লয় (নিরোধ) হয়, এবং যাঁহা হইতে সমস্ত বস্তু প্রকাশিত বা উপলব্ধ হয় (অধ্যবসীয়তে), তিনিই আশ্রয়তত্ত্ব। সর্গাদিনয়টি লক্ষণ আশ্রয় তত্ত্বে উপলক্ষিত। আশ্রয়তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া থাকেন বলিয়া সর্গ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সকলি আশ্রিত তত্ত্ব। দশমতত্ত্ব আশ্রয়তত্ত্বকে বিশেষভাবে নির্ণয় করিবার জন্য নয়টি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে আশ্রয়তত্ত্ব বলে। এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ, যথা ব্রহ্মা, পরমাত্মা এবং ভগবান।

"বদন্তিতৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যদ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

একই আশ্রয়তত্ত্ব বা পরতত্ত্ব জ্ঞানসাধনের সম্মুখে ব্রহ্ম, যোগসাধনের সমক্ষে পরমাত্মা এবং ভক্তি সাধনের সম্মুখে ভগবানরূপে প্রকাশ পান। এই ত্রিবিধ আবির্ভাবের মধ্যে পরপর উৎকৃষ্ট। সেইহেতু ভগবানই আশ্রয়তত্ত্ব বা পরমতমতত্ত্ব। ভাগবত 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই আশ্রয়তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলিয়াছেন ;—

"কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সব বিশ্বের বিশ্রাম ॥" ১।২।৭৮

* * . *

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ—কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্বশাস্ত্রে কয় ॥" ১।২।৮৯

এই দশটি লক্ষণযুক্ত পুরাণকে মহাপুরাণ বলে। ভাগবতে এই দশটি পদার্থের বিশেষভাবে বর্ণনা আছে বলিয়া ভাগবত মহাপুরাণ।

শ্রীভাগবত—কৃষ্ণের অবয়ব স্বরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ তাঁহার দুই চরণ, তৃতীয় ও চতুর্থ দুই উরু, পঞ্চম স্কন্ধ নাভি, ষষ্ঠ বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম বাহুদ্বয়, নবম কণ্ঠ, দশম ফুল্ল মুখারবিন্দ, একাদশ ললাট পট্ট ও দ্বাদশ স্কন্ধ মস্তক। যিনি অসার সংসার সমুদ্রের সেতু স্বরূপ, জগতের সুমঙ্গলের জন্য যাহার অবতার, তমাল বর্ণ করুণানিধান সেই আদি দেবতা ভাগবত স্বরূপকে বন্দনা করি।

পরিশিষ্ট (ট)

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ। (পৃষ্ঠা ১৩৬)

গেল কামিনী, গজহুঁ গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক, কুসুম সায়ক
কুহকী ভেলী বরনারী ॥
জোড়ি ভুজ যুগ মোরি বেড়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।

দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদচন্দ॥
উরহি অঞ্চল, ঝাঁপই চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে শারদ ঘন জনু
বেকত করল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়াযব
টুটব বিরহ ওর।
চরণে যাবক হৃদয়ে পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যদুপতি,
চিতথির নাহি হোয।
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব তোয॥
(বিদ্যাপতি)

সরলার্থ

যাদুকরগণের ভেল্কী দেখাইবার জন্য একজন কবিয়া রমণী থাকে, তাহাকে বলে কুহকী। কৃষ্ণ বলিতেছেন—এই বরনারী যিনি গজমত্ত গমনে আমার সম্মুখ দিয়া মুচকি হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন, তিনি সেইরূপ ইন্দ্রজালিক কুসুম সাযকের (মদনের) কুহকিনী রমণী। তিনি আমার উপর এক ভেলকি খেলিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি ভুজ যুগল জুড়িয়া ঘুরাইয়া তাঁহার মুখমণ্ডল এমনি সুছন্দে (সুন্দর ভঙ্গীতে) বেষ্টন করিলেন, যেন মনে হইল কামদেব চম্পকদামে শারদচন্দ্রকে পূজা করিল। অর্থাৎ তাঁহার শারদ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখে যখন তাঁহার হস্তাঙ্গুলী অর্পিত হইল, তখন মনে হইল ঐ হস্তাঙ্গুলী মদন কর্ত্তৃক পূজার জন্য চন্দ্রের নিকট নিবেদিত চম্পক কলিকা। তিনি চঞ্চল হইয়া পুনরায় বক্ষঃস্থল তাঁহার বসনাঞ্চল দ্বারা চাপা দিতে থাকিলে, তাঁহার অর্দ্ধেক পয়োধর আমার নয়নগোচর হইল। মনে হইল যেন পবন পরাভূতশারদমেঘ সুমেরু পর্বতকে ব্যক্ত করিল। অর্থাৎ তাঁহার পীন পয়োধর বসনাঞ্চলে আবৃত ছিল কিন্তু চঞ্চলভাবে পুনরায় ঢাকিতে যাওয়ায় অর্দ্ধেক বাহির হইয়া গেল। যদি কখন তাঁহার দেখা পাই, তাহা হইলে আমার জীবন জুড়াইবে এবং বিরহের ওর (সীমা) টুটিবে। তাঁহার চরণ যাবক

(আলতা) আমার হৃদয় পাবক রূপে অর্থাৎ অন্তর দাহকারী আগুন ন্যায় সর্বদা দগ্ধ করিতেছে।

বিদ্যাপতি বলিলেন—যদুপতি শুন, সেই পরম গুণমণি রমণী তোমার ভাগ্যে পুনরায় মিলিবে কিনা, তাহা আমার চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছে না।

[এখানে শ্রীরাধাকে যাদুকরের কুহকিনী রমণীর সহিত, তাঁহার হস্তাঙ্গুলীকে চম্পক কলিকার সহিত, বসনাঞ্চলকে মেঘের সহিত, সুমেরুকে পীন পয়োধরের সহিত এবং ভুজ যুগলকে পবনের সহি তুলনা করা হইয়াছে।

রাধাকৈঙ্কর্য

পরিশিষ্ট—ঠ

সৌন্দর্য্য এবং প্রেম—পৃষ্ঠা ১৬৪

"গৌড়ীয় আচার্য্যগণ সৌন্দর্য্য এবং মিলনের পরাকাষ্ঠার উপাসক। যিনি তাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের দ্বারা চিরসুন্দরকে পূজা করেন, তাঁহারা তাঁহার অনুগতদাসী।"

পরতত্ত্ব নির্দ্ধারণ এবং তদুচিত উপাসনা প্রণালী সম্প্রদায় ভেদে বিভিন্ন। জগতে যে সকল সাধন পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তৎ সমুদয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এবং তটস্থ হইয়া বিচার করিলে দেখা যায়, যে তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে কোন না কোন স্বার্থানুসন্ধান জড়িত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে আবির্ভূত হইয়া যে ধর্ম প্রচার করিলেন তাহা ভাগবত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা সব প্রকার কাপট্য রহিত, অতএব পরমধর্ম। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং এই ভাগবত বচনের পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়া, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্বের আসনে বসাইলেন। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত্তা তাঁহার কেবল পারমৈশ্বর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাই তাহার অনুগত আচার্য্যগণ বলিলেন, ঐশ্বর্য্য ভগবত্তার সার নহে, মাধুর্য্যই ভাগবত্তার সার। ঐশ্বর্য্য ভগবানের বহিঃবিকাশ মাত্র, অন্তর বিকাশ তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য। ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণে অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য থাকিলেও, তাঁহাতে অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং মাধুর্য্যের প্রাধান্য থাকায়, তাঁহারা তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান রূপে গ্রহণ করিলেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী 'স্বয় ভগবানের' অর্থ করিয়াছেন,

"যার ভাগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা
'স্বয়ং ভগবান' শব্দের তাহাতেই সত্তা।।" (চৈ চ ১।২।৭৯)

অনন্ত কোটি ভগবৎ স্বরূপ থাকিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার উপর নির্ভরশীল। তাহারা শ্রীকৃষ্ণ বৈভবের অনন্ত বৈচিত্র্য। সে কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

স্বকীয়-মাধুর্য্য-রস-আস্বাদনই ভগবত্তার লক্ষণ। 'রসোবৈসঃ, আনন্দ ব্রহ্মোঃ ব্যজনাৎ, সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতিবাচ্য দ্বারা ইহা সমর্থিত।

মধুর রসে ভজনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রেত। এই প্রকার ভজনের মূল প্রযোজন প্রেম, যে প্রেম স্বচ্ছ, নির্মল এবং নিরবদ্য অর্থাৎ যে প্রেমের মধ্যে বিন্দুমাত্র কালিমা নাই। এই জাতীয় প্রেমের অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীমতীরাধিকা। অতএব তাঁহার চরণ দাস্য ব্যতিরেকে এ জাতীয় প্রেমলাভ সম্ভব পর হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

'জীব স্বরূপে হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ॥" (চৈঃ চঃ ২।২০।১০১

জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি হওয়ায়, তাঁহার স্বাতন্ত্র্যময়ী অর্থাৎ রাগাত্মিকা সেবার অধিকার নাই। তাহার সেবা হইবে আনুগত্যময়ী অর্থাৎ রাগানুগা। এ সেবার একমাত্র প্রবর্ত্তক লোভ। অপর কোন উদ্দেশ্যের দ্বারা ইহা প্রণোদিত নহে। সখী ভাবে সেবা করা জীবের সাধ্যাতীত। কারণ সখীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহ। তাঁহাদের সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী। মঞ্জরীভাবে বিভাবিত হইলে, জীবের মধুরভাবে সেবা সম্ভব। মঞ্জরীগণ শ্রীরাধার কিঙ্করী। তাঁহাদের সেবা আনুগত্যময়ী। মঞ্জরী গণের সহিত জীবের সজাতীয়ত্ব ভাব বিদ্যমান আছে। অতএব শ্রীরাধার অন্তরঙ্গাদাসীর অনুদাসী হইয়া সাধককে ভজন পথে চলিতে হইবে। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশ এবং গোস্বামী চরণ গণ তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।

আনুগত্য ময়ীসেবায় যখন জীবের অধিকার এবং মধুর রসে ভজন যখন শ্রেষ্ঠ, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীবৃন্দের আনুগত্যে তাহার ব্রজদাসত্ব বজায় রাখিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার দাসত্ব তখন দাসীত্বে রূপান্তরিত হইবে। অর্থাৎ কৃষ্ণ দাস্য তখন রাধা দাস্যে পরিণত হইবে। শ্রীমহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবগণ যদিও পরম পুরুষ, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই ভজনা করেন, তথাপি তাঁহাদের ভজন প্রবৃত্ত হয় রাধা কৈঙ্কর্য্যের মাধ্যমে। তাঁহারা বলেন, জগতে একমাত্র পুরুষ কানাইয়া লাল. আর সব প্রকৃতি। প্রকৃতির কর্ত্তব্য পুরুষের সেবা। জীব মাত্রই প্রকৃতি, অতএব দাসী। এখানে স্ত্রীভাব অর্থে লিঙ্গ-গত ভেদ নহে। শুদ্ধ বুদ্ধ-স্বভাব জীব স্বরূপের পুরুষাকার রূপ অহংভাব নিরসন। বাহ্য স্ত্রীবেশ ধারণ ভজনের প্রযোজনীয় অঙ্গ নহে। গোস্বামী প্রভুগণ মঞ্জরী ভাবে তন্ময়

হইয়া থাকিলেও কখন স্ত্রীবেশ ধারণ করেন নাই বা কাহাকেও করিতে বলেন নাই। তবে শ্রীমতী রাধারাণীর সখীমঞ্জরী দিগের দাসী অনুদাসী রূপে অন্তরে অন্তরে মনন করিয়া সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইবে ইহাই তাঁহাদের অভিমত। এই প্রকার সাধনের দুইটি দিক আছে। একটি বাহ্য সাধন, অপরটি অন্তর সাধন। অন্তর সাধন শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহা মানস সেবা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার মধ্য লীলার ৩৩ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন।

"বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্য সাধক দেহে করেন শ্রবণ কীর্ত্তন।
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।" (৮৯—৯০)

'মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন' অর্থে মঞ্জরীভাবে বিভাবিত চিত্ত হইয়া নিবিষ্ট মনে ভজন। যথাবস্থিত দেহে বাহ্য এবং অন্তর সাধন করিয়া গোপীভাব লিপস্নু সাধক যখন সাধনে সিদ্ধিলাভ করেন, তখন তাঁহার দেহাবসানের পর, তিনি নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হন এবং তৎপরে গোপীজন্মলাভ করিয়া, তিনি যুগলের মঞ্জরীরূপে আন্তরিক সেবালাভের অধিকারী হন। এই প্রকার অবস্থা প্রাপ্তি গৌড়ীয় সাধকবৃন্দের চরমতম কাম্য। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় সাধকদেহে সিদ্ধদেহের অভিমান লালসা প্রকাশ করিয়া নিম্নোক্ত গীতি কবিতা লিখিয়াছেন।

"হরি, হরি আর কবে হেন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব
দুঁহু অঙ্গে চন্দন পরাব॥"

অথবা

"কবে বৃষভানু পুরে আহিরী গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব।"

গোস্বামি প্রভুগণ মঞ্জরী ভাবে সেবা করিবার অভিলাষ তাঁহাদের প্রায় সকল স্তোত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। দুই একটি উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—শ্রীরূপ গোস্বামি পাদ তাঁহার 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি' নামক স্তোত্রে লিখিয়াছেন,

"কেলি বিস্রংসিনো বক্রকেশ বৃন্দস্য সুন্দরি।
সংস্কারায় কদাদেবি জনমেতং নিদেক্ষসি॥"

হে সুন্দরি, দেবি! কৃষ্ণের সহিত বিলাসাবসানে তোমার কুটিল কেশ পাশ আলুলায়িত হইলে, তাহা সংস্কার করিবার জন্য কবে এই জনকে আদেশ করিবে?

আরও লিখিলেন,

"অপার করুণাপূর পূরিতান্তর্মনোহ্রদে।
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি নিজ দাস্য স্পৃহাজুষী।"

হে রাধিকে! তোমার অন্তঃকরণ রূপ সরোবর অশেষ করুণা বারি দ্বারা পূর্ণ। অতএব হে দেবি, তোমার দাসীত্ব অভিলাষী এই জনের উপর করুণা কর।

পরিশেষে লিখিলেন,

"ব্রজরাজ কুমার বল্লভাকুল সীমন্ত মণি প্রসীদ মে।
পরিবার গণস্য তে যথা পদবী ন দবীয়সী ভবেৎ॥"

হে দেবি রাধিকে! তুমি ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী বর্গের শিরোমণি। অতএব তুমি আমাকে এই প্রকার করুণা কর, যাহাতে আমি তোমার পরিবার গণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারি।

তিনি যত যত স্তোত্র লিখিয়াছেন, প্রায় সকলি শ্রীরাধার চরণদাস্য কামনা এবং মঞ্জরী রূপে সেবা প্রার্থনা।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার 'চৈতন্য চন্দ্রামৃতে' লিখিয়াছেন,

"অশ্রূনাং কিমপি প্রবাহ নিবহৈঃ ক্ষৌনীংপুরঃ পঙ্কিলাং
কুর্বন্ পানিতলে নিধায় বদর পাণ্ডুং কপোলস্থলীং।
আশ্চর্যাং লবণোদরোধসি বসন্ শোণং দধানোহংশুকং
গৌরীভূয় হরিঃ স্বয়ং বিতনুতে রাধাপদাব্জে রতিং।"

(একাদশ বিভাগ ১৩৫ নং শ্লোক)

এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাবতারের মূল কারণ—জগৎকে রাধাদাস্য প্রদান।

তাঁহার রাধা-রস-সুধানিধি গ্রন্থ মঞ্জরী ভাবে রাধাদাস্য কামনা।

তিনি ৮নং শ্লোকে লিখিয়াছেন;—

'যৎ কিঙ্করীষু বহুশঃ খলু কাকুবাণী
নিত্যং পরস্য পুরুষস্য শিখণ্ড মৌলেঃ।

তস্যাঃ কদা রসনিধের্বৃষভানুজায়া
স্তৎকেলি কুঞ্জভবনাঙ্গন—মার্জ্জনীস্যাম্ ॥"

তাঁহার স্বাভিলাষ রসনিধি বৃষভানুসুতার কেলি কুঞ্জ ভবনের মার্জ্জনাকারিণী হইতে। অদ্বৈতবংশোদ্ভব প্রসিদ্ধ ভাগবতবেত্তা প্রভুপাদ শ্রীজীতেন্দ্র নাথ গোস্বামি ভক্তিশাস্ত্রী এই গ্রন্থের সঙ্গীত মালিকা গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন। শেষোক্ত কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হে ভানুকুমারি ! তোমার দাসীর মহিমা যেদিন শুনেছি।
সেই দিন হ'তে তাদের অনুদাসী হইতে বাসনা করেছি ॥
বাসনা আমার মার্জ্জনী করে কুঞ্জ ভবন প্রাঙ্গন।
মার্জ্জনা করি তব পদরেণু করিব অঙ্গ ভূষণ ॥
সেই পদরেণু ভূষিত আমায় দেখিয়া তোমার শ্যাম।
তব প্রিয়দাসী জানিবে আমায় (আমার)পূরিবে মনস্কাম ॥"

ইহা আনুগত্যময়ী সেবা। রাধাদাস্যের মাধ্যমে পরমতত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করা।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী রাধাকুণ্ডে বসিয়া অশ্রু সিক্ত বদনে, রাধাদাস্য পাইবার নিমিত্ত তাঁহার বিলাপকুসুমাঞ্জলি'র মধ্য দিয়া আকুল প্রাণে বিলাপ করিয়াছেন। তিনি সখীদ্বয়কে নমস্কার করিয়া শ্রীরাধারচরণদাস্য প্রার্থনা করিয়াছেন অর্থাৎ মঞ্জরী-ভাবে সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন। কারণ সখীগণের সেবা এবং মঞ্জরী গণের সেবার মধ্যে বিশেষ তারতম্য আছে।

সখী—মঞ্জরী

সখীগণের রাধাকৃষ্ণের লীলায় পূর্ণ অধিকার আছে। তাঁহারা এই লীলার বিস্তার করেন, পুষ্টিবিধান করেন এবং বিস্তার করিয়া তাহা আস্বাদন করেন। রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করেন এবং বিরহে শ্রীরাধাকে সান্ত্বনা দেন. প্রবোধদেন, কৃষ্ণনাম গান করিয়া এবং কৃষ্ণকণ্ঠ-মাল্য-গন্ধ তাঁহার নাসিকায় আঘ্রাণ করাইয়া তাঁহার মোহ অপনোদন করেন। তাঁহারা তাঁহাকে উপদেশ দেন এবং আদেশও করেন। শ্রীরাধরাণী মানিনী হইলে, নাগর তাঁহাদের শরণাপন্ন হন এবং চাটুবাক্যে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া রাধা সঙ্গ প্রার্থনা করেন। তাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কার লিখিয়াছেন,

"সখীবিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥" (২।৮।১৬৪)

সখীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহা। তাঁহারা রাধারূপ কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতিকার কিশলয়, পুষ্প এবং পত্রস্থানীয়া। যেমন লতার মূলে জল সেচন করিলে, পত্র পুষ্প পুষ্ট হয়, সেই প্রকার সখীগণ শ্রীরাধার কৃষ্ণসঙ্গমে অতিশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। তাঁহারা শ্রীরাধার মধ্য দিয়া কৃষ্ণকে ভোগ করেন। রাধিকার শরীরের উপর যে সকল কৃষ্ণ ভোগ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সই সকল সখীগণের উপরও সংক্রামিত হয়। তাহাতে তাঁহারা রাধা অপেক্ষা অধিক সুখ লাভ করেন। সে কারণ তাঁহাদের স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণকে ভোগ করার কোন প্রয়োজন হয় না। তথাপি কৃষ্ণসঙ্গমে তাঁহাদের কোন বাসনা না থাকিলেও, কোন কোন সময়ে শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণকে যত্ন সহকারে এবং ছল পূর্বক তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া কৃষ্ণ সঙ্গম করাইয়া দেন। তাহাতে রাধারাণীও কৃষ্ণকে সুখী করাইয়া নিজেও নিজকেলি অপেক্ষা অধিকতর সুখী মনে করেন। কারণ তাঁহাদের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লিখিয়াছেন,

"যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মকৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥" (২।৮।১৭১-১৭২)

কিন্তু তথাপি মঞ্জরীগণের সেবা এবং প্রেম, সখীগণের সেবা এবং প্রেম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মঞ্জরীগণ শ্রীরাধার কিঙ্করী। সখীগণ শ্রীরাধার প্রায় সমপর্য্যায়ভুক্তা। সখী-গণের স্বসুখ বাসনা না থাকিলেও, কখন কখন কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করেন। সে কারণ রাধারাণীর তাঁহাদের উপর স্বাপত্ন্য বোধ আছে। কিন্তু মঞ্জরীগণের রাধানিষ্ঠা এতই প্রবল যে পরিহাস পটু ধৃষ্ট নাগর, যদি কোন সময় তাঁহাদের প্রেম পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট গমন করেন, তখন কিন্তু তাঁহাকে অপমানিত এবং অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। অতএব তাঁহাদের প্রেমে কোন প্রকার মসীরেখা নাই। ইহা স্বচ্ছ এবং নির্মল।

সখীগণের সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী বা রাগাত্মিকা। মঞ্জরীগণের সেবা আনুগত্যময়ী বা রাগানুগা। তাঁহারা রাধারাণীর মনের মত হইয়া সেবা করেন। মঞ্জরীগণ শ্রীরাধার নর্মসখী। তাই তিনি অসংকোচে তাঁহাদের নিকট রহঃলীলার সকল

কথাই প্রকাশ করেন। কিন্তু সকল সখীই শ্রীরাধা হইতে জ্যেষ্ঠা। শ্রীরাধারাণী তাঁহাদের নিকট স্বাপত্ন্য বোধেই হউক আর মর্যাদা জ্ঞানেই হউক, রহঃলীলার নিগূঢ় সংবাদ জানাইতে সংকোচ বোধ করেন। মঞ্জরী গণের নিকট কুঞ্জাভ্যন্তরের কোন লীলাই অপরিজ্ঞাত নহে। যে সকল সেবায় সখীগণের অধিকার নাই, মঞ্জরীগণ সেই সকল অন্তরঙ্গ সেবার অধিকারিণী। সখীগণ নিভৃত কেলি কুঞ্জে প্রবেশ করিতে পারেন না, রন্ধ্র পথ দিয়া লীলা উপভোগ করেন মাত্র। রহঃলীলার নিগূঢ় সংবাদ তাঁহাদের নিকট পরিজ্ঞাত নহে। মঞ্জরীগণ বিলাসকুঞ্জের অভ্যন্তরে গিয়া কুঞ্জসংমার্জন করেন, কেলিতল্প রচনা করেন, শয্যার উপর বৃন্তহীন কুসুম বিকীর্ণ করেন। বিলাসের যত কিছু উপকরণের প্রয়োজন, তৎসমুদয় সজ্জিত করিয়া রাখেন। লীলা অবসানে তাঁহারা শ্রীরাধার আলুলায়িত কেশপাশ বন্ধন করেন, অসংলগ্ন বেশ-পুনরায় সজ্জিত করিয়া দেন। তাঁহার শ্রান্ত-ক্লান্ত পদযুগল সম্বাহন করেন এবং তাঁহার ইঙ্গিতে তাঁহার প্রিয়তমেরও অসংলগ্ন বেশভূষা সংস্কার করেন এবং তাঁহারও পদসেবা এবং অঙ্গ সেবা বিধান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন। বাধা কৈঙ্কর্য্যের মাধ্যমে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যাদি উপভোগ করেন। তাই দাস গোস্বামী সখীত্বকে বরণ না করিয়া রাধাদাস্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার বিলাপকুসুমাঞ্জলীর ১৬ স্তবকে লিখিলেন,

'পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্য মেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিলদেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তে নিত্যম্
দাস্যায় মম রসোস্ত নিত্যম।"

হে দেবি রাধিকে! তোমার পাদপদ্মের দাসী ব্যতীত আমি কোন কালে সখীত্ব দি কামনা করি না। তোমা সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার দাস্যের প্রতি আমার নিত্য অনুরাগ হউক। তিনি রাধাদাস্যকে বরদাস্য বলিয়াছেন, কারণ রাধাদাস্য ব্যতীত কৃষ্ণদাস্য পাওয়া যায় না।

যেমন পূর্ণ চন্দ্রকে পাইতে হইলে পূর্ণিমা তিথির প্রয়োজন, তেমনি রসিকশেখর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে হইলে রাধাদাস্যের প্রয়োজন।

নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার লালসাময়ী গীতি কবিতার মধ্য দিয়া আকুল প্রাণে মঞ্জরী পদ প্রার্থনা করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কয়েকটি চরণ প্রদত্ত হইল।

"শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি, সেই মোর ভক্তি ঋদ্ধি
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ
সেই মোর ধরম করম॥

রসাস্বাদনেই যেমন ভগবত্তার প্রাধান্য, তেমনি মধুর রসে ভজন শীল সাধক গণেরও প্রাধান্য। তাঁহারা যুগলের ভজনা করিয়া স্বতঃস্ফূর্তরূপে যে আনন্দ লাভ করেন, তাহার তুলনায় ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ, যোগীগণের আত্মা পরমাত্মার মিলন জাত আনন্দ হইতে ইহা উৎকৃষ্ট। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতী।" এই শ্রুতি বাক্যের পূর্ণ তৎপর্য্য লক্ষিত হয়—রসিক শেখরের আরাধনায় 'রাধাকিঙ্করী' রূপে।

পরিশিষ্ট—ঙ

(পৃষ্ঠা ২০৫)

'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইলেন, তখন তিনি গোদাবরী তীরস্থিত 'বিদ্যানগর' নামক স্থানে আসিয়া রামানন্দের সহিত মিলিত হন। রামানন্দ ছিলেন উড়িষ্যাধিপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্মচারী এবং বিদ্যানগরের রাজা। অপরদিকে ছিলেন পরম ভাগবত এবং সর্বশাস্ত্র বিশারদ। তাঁহার সহিত শ্রীমহাপ্রভুর সাধ্য সাধন তত্ত্বের যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

প্রভু রায় রামানন্দকে শাস্ত্র যুক্তি বলে 'সাধ্য' নির্ণয় করিতে বলিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ তাহাতে স্বধর্মাচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরপর কৃষ্ণে কর্ম সমর্পণ, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি প্রভৃতি গীতোক্ত সকল কথাই বলিলেন. কিন্তু মহাপ্রভু তাহাতে প্রীত না হইয়া প্রত্যেকটিকে বাহ্য বলিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন, 'এহো বাহ্য আগে কহ আর।' তখন রায় ভাগবত রাজ্যে প্রবেশ করিয়া জ্ঞান শূন্যা কেবলা ভক্তিকে 'সার' বলিলেন। মহাপ্রভু ইহাকে 'এহো হয়' বলাতে রায় উৎসাহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে দাস্য প্রেম, সখ্য প্রেম এবং বাৎসল্য প্রেমের উত্তরোত্তর রসাধিক্য দেখাইয়া পরিশেষে কান্তাপ্রেমে আসিয়া উপনীত হইলেন। কান্তা প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রস বিশ্লেষণ করিয়া রাধা প্রেমকে সাধ্য শিরোমণি রূপে স্থাপিত করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু অতিশয় প্রীত হইয়া আরও যেন কেমন এক অনির্বচনীয় রহস্যপূর্ণ বাণী শুনিবার নিমিত্ত রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"প্রভু কহে—এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে—ইহা বই বুদ্ধি গতি নাহি আর॥
যেবা প্রেম—বিলাস—বিবর্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কিনা হয়॥
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥" (চৈঃ চঃ ২।৮।১৪৯—১৫১)

গীতটি হইল— 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল ইত্যাদি ॥"

এই গীতটি পুনরায় আলোচ্য বিষয়। ২০৬ পৃষ্ঠায় কিঞ্চিৎ দিগ দর্শন করা হইয়াছে 'পহিলহি রাগ' বাক্যাংশে 'রাগ' শব্দের বিবিধ অর্থ আছে। শ্রীমদুজ্জ্বলে 'রাগ' শব্দের অর্থ "দুঃখমত্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।

যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগঃ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥" (স্থায়িভাব প্রঃ ১২৬)

যে অবস্থায় কৃষ্ণ সঙ্গ লাভের জন্য অত্যন্ত দুঃখকেও অতীব সুখ বলিয়া মনে হয়, সেই প্রণয়োৎকর্ষ অবস্থার নাম রাগ। (১৬১—১৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) রাগ শব্দের একটি পারিভাষিক অর্থ আছে তাহা রং। শ্রীরাধার রাগকে 'উজ্জ্বলে' মঞ্জিষ্ঠা কুসুমের রং এর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মঞ্জিষ্ঠা কুসুমের রং পাকা লাল রং। ইহা স্বতঃ প্রকাশশীল, স্থায়ী এবং দ্রুত সঞ্জাত হয়। মঞ্জিষ্ঠা রাগের লক্ষণ 'অহার্যোঽনন্য সাপেক্ষো যঃ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা।

ভবেন্মঞ্জিষ্ঠ রাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা॥" (স্থায়িভাব প্রঃ ১৩৯)

মঞ্জিষ্ঠা রাগ নিত্য বিদ্যমান থাকে, কিছুতে ধ্বংস হয় না। ইহা উত্তরোত্তর বর্ধনশীল। ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অন্য নিরপেক্ষ এবং দ্রুত সঞ্জাত হয়। এই সব লক্ষণ এই গীতটির মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত। (২০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কিন্তু এই গীতটির প্রাণ—'নাসোরমণ নাহামরমণী। দুঁহুমন মনোভব পেষল জানি॥' এই চরণ দুটি প্রেম বিলাস বিবর্ত অর্থাৎ বিলাস মহত্বের চরম পরাকাষ্ঠা জ্ঞাপক। ইহা অতীব গুহ্য এবং রহস্যময় বস্তু। বিবর্ত শব্দেরও বিভিন্ন অর্থ আছে। শ্রীজীব গোস্বামী উজ্জ্বলের উদ্দীপন বিভাগের ৩৭ শ্লোকে 'বিবর্ত' শব্দের অর্থ করিয়াছেন পরিপাক' যথা "বকারেঃ সুমুখি নব বিবর্তঃ কোঽপ্যসৌমাধুরীণাম্।" বকারি কৃষ্ণের অনির্বচনীয় মাধুর্যের প্রথম বিবর্ত (অর্থাৎ পরিপাক বা পরিণাম)। চক্রবর্তি মহাশয় বিবর্ত শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'বিপরীত'। বিবর্ত শব্দের আর একটি আভিধানিক অর্থ আছে তাহা ভ্রম। 'বিবর্ত' শব্দের 'পরিপাক' অর্থকে মুখ্যার্থ ধরিয়া লইলে প্রেম বিলাস-বিবর্তের অর্থ দাঁড়ায়, প্রেম বিলাসের পরিপক্ক অবস্থার পরিণত বা পরিণাম— বৈপরীত্য এবং ভ্রম। 'নাসো রমণ না হাম রমণী এই বাক্যটি পরৈক্যসূচক। বিলাস সুখের তন্ময়তা নিবন্ধন কে 'রমণ' আর কে 'রমণী' কে 'কান্ত' কে 'কান্তা' এই ভেদ জ্ঞান অবলুপ্ত হয়। উভয়ের দ্বৈত জ্ঞান বিলাস সুখমাত্রৈক তন্ময়তার অতলতলে ডুবিয়া

যায। ইহা নির্ধূর্ত ভেদ ভ্রমের অবস্থা। ইহা আত্ম বিস্মৃতি বা আত্মবিভ্রম। কিন্তু ইহা অদ্বৈতবাদিগণের 'একত্ব' সূচক নহে। ইহার সহিত উজ্জ্বলের 'রাধায়া ভবতশ্চ চিত্ত জতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্' শ্লোকটির অর্থ সাম্য আছে। (১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

'বিবর্ত' শব্দের বেদান্ত সূত্রে আর একটি অর্থ আছে—"অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্তঃ ইত্যুদাহৃতঃ।" তত্ত্বতঃ অন্যরূপ না হইলেও যে অন্য প্রকার ভাব দৃষ্ট হয় তাহাকে বিবর্ত বলে। এই অর্থ অনুসারে রাধা এবং কৃষ্ণ তাঁহারা স্বস্বতত্ত্ব (অর্থাৎ রসতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্ব) হইতে বিচ্যুত হন না। কিন্তু বিলাসের এতদৃশী শক্তি যে তাঁহাদের উভয়ের স্বরূপ (রমণত্ব এবং রমণীত্ব) এই ভেদ জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করিয়াদেয়।

ইহা মাদনাখ্য মহাভাবের প্রভাব। মাদনাখ্য মহাভাবের উদয়ে প্রেমময়সম্ভোগের চরম অবস্থায় ভেদবুদ্ধি অপগত হইয়া পরম একত্ব প্রাপ্ত হয় এবং বিলাসের বহুবিধ রসবৈচিত্র্য সাধিত হয়। বিলাস বিবর্তের মধ্যে বিপরীত বিহার বা চেষ্টা নিহিত আছে বটে কিন্তু তাহা বিলাস বিবর্তের বহির্লক্ষণ বা বিভ্রমের পরিণাম।

কবি কর্ণপুর তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্যে ত্রয়োদশসর্গের ৪৫ শ্লোকে রামানন্দ রচিত এই গীতের কথা লিখিয়াছেন;

"ততঃ স্বগীতং সরসালি পীতং
বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরস্য।
প্রেমোহতিকাষ্ঠা প্রতিপাদনেন
দ্বয়োঃপরৈক্য প্রতিপাদ্যবাদীৎ॥"

শ্রীরামানন্দ রায় বিদগ্ধ নাগর নাগরীর প্রেমের পরম কাষ্ঠা প্রতিপাদন করিয়া এতদুভয়ের একত্ব সূচক গীত গাহিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকের ৭ম অঙ্কের ১৬।১৭ শ্লোকে এই গীতটির সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন,

"সখি! নসো রমণ নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে।
প্রেমরসেনোভয় মনোমদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥
অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানী মতিরভূৎ।
মনোবৃত্তিলুপ্তাত্ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হতা॥
ভবান্ ভর্ত্তা ভার্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতিঃ।
তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরম্॥"

সখি! তিনি আমার রমণ (পতি) নন এবং আমি তাঁহার রমণী (পত্নী) নহি এই ভেদবুদ্ধি আমাদের বরাবরই আছে। কিন্তু দুরন্ত মদন যেন বল পূর্বক প্রেমরসে আমাদের উভয়ের চিত্তকে নিষ্পেষিত করিয়া অভিন্ন করিয়া দিয়াছিল। মিলনের চরমোৎকর্ষ অবস্থায় 'তুমি কান্ত, আমি কান্তা' এইরূপ মতি আমাদের ছিল না। তখন চিত্ত বৃত্তি বিলুপ্ত হওয়ায় 'তুমি, আমি' এই ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছিল। যদিও ইদানীং প্রেম শৈথিল্য বশতঃ আমাদের উভয়ের 'আপনি ভর্ত্তা' এবং 'আমি ভার্য্যা এই দ্বৈতভাবের উদয় হইয়াছে তথাপি হায়! এখনও যে আমার প্রাণ রহিয়াছে. এতদপেক্ষা আর বিচিত্র কি?

এই গীতটি সংযোগ অবস্থার গীত কি বিয়োগ অবস্থার গীত সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন এই গীতটি সংযোগ অবস্থার গীত, কারণ শ্রীরামানন্দ মহাপ্রভুকে 'বিলাস বিবর্ত' ই শুনাইতে চাহিযাছিলেন, বিরহের কথা শুনাইতে যান নাই যদিও 'না সো রমণ না হাম রমণী' অংশটি গীতের কেন্দ্রস্থিত মণি স্বরূপ এবং শ্রীরামানন্দ শ্রীমহাপ্রভুর নিকট রাধাকৃষ্ণের 'প্রেম-বিলাস-বিবর্ত' তত্বটি প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে এই গীতের অবতারণা করিয়াছিলেন, তথাপি ইহার সমুদয় অংশ শ্রীরাধাকৃষ্ণেব '.প্রেম বিলাস বিবর্ত' বা পরৈক্যভাব ব্যঞ্জক নহে। ইহার মধ্যে বিয়োগ অবস্থাবভাব নিহিত রহিয়াছে। সে কারণ কবিকর্ণপূর এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই গীতটিকে 'মাথুর গীত' বলেন। 'মাথুর গীত' রূপে লইলে ইহার অর্থ দাঁড়ায় যে:—

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহার বিয়োগ দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার এক দূতীকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইবার সংকল্প করিলেন। দূতী তাঁহাকে গিয়া কি বলিবে, তিনি তাহাই তাহাকে শিক্ষা দিতেছিলেন। বিরহের মধ্যে তাঁহার পূর্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল এবং সেই পুরাতন মধুব স্মৃতির কথাই শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিবার জন্য দূতীকে পাঠাইতে ছিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "সখি! তুই গিয়া সেই বিস্মরণ শীল বিদগ্ধ নাগর রাজকে বলিস্ যে সে যে আমার রমণ নয় এবং আমি যে তার রমণী নই এ ভেদ জ্ঞান আমাদের বরাবরই ছিল, কিন্তু দুরন্ত মদন আমাদের চিত্তকে এমনি ভাবে নিষ্পেষিত করিয়াছিল যে উভয়ের প্রতি রাগ চোখের পলক পড়িতে না পড়িতে স্বতঃস্ফূর্ত রূপে আবির্ভূত হইয়া উদ্দাম গতিতে সীমাহারা হইয়া চলিতে লাগিল। তৎপরে মিলনের সময় বিলাস সুখের এমনি তন্ময়তা দেখা দিল যে সে তন্ময়তায় আমরা উভয়ে ডুবিয়া গেলাম। বিলাস বিভ্রমের পরিপক্ক অবস্থায় তখন কে যে রমণ আর কে যে রমণী অর্থাৎ কে যে রতিবীর নাগর আর কে যে রতি বিলাসিনী নাগরী এ ভেদ জ্ঞান পর্য্যন্ত আমাদের রহিল না। আমরা যেন

একত্ব প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু হায় এখন আমাদের পুনরায় ভেদ জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি আমার যে প্রাণ রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য!

পঞ্চবাণ মদনের মধ্যস্থতায় আমাদের মধ্যে যে প্রণয় সংঘটিত হইয়াছিল, অপর কাহারও মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় নাই, সে প্রেম পুণরায় স্থাপন করিবার জন্য তোকে দূতি হইতে হইল। ইহার চেয়ে আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে। তুই তাকে এসব কথা বলিস,. (যেন তার সঙ্গদোষে ভুলে যাস না) যে উত্তম বিদগ্ধ নাগরের প্রেমের এই প্রকার রীতিই বটে। শেষ চরণ দুটি শ্রীরাধার বক্রোক্তি।

অনেকে বলেন, ইহা শ্রীরাধার ধীরাধীর মধ্যা নায়িকার লক্ষণ। ধীরাধীর মধ্যা নায়িকার সম্বন্ধে শ্রীমদুজ্জ্বল নীলমণি নায়িকা ভেদ প্রকরণে ৩৯ শ্লোকে বলিয়াছেন, "ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম।" ধীরাধীর মধ্যা নায়িকার লক্ষণ এই যে যখন নায়িকা গদ গদ কণ্ঠে অশ্রু মোচন করিতে করিতে নায়কের প্রতি বক্রোক্তি করেন। কিন্তু এখানে সবাষ্পের উল্লেখ নাই। শ্রীচক্রবর্তি মহাশয় তাঁহার শ্রীমদানন্দ চন্দ্রিকা টীকায় বলিয়াছেন, ধীরাধীর মধ্যা নায়িকা দ্বিবিধা। এক প্রকার ধীরতাংশের আধিক্য আর এক প্রকার অধীরতাংশের আধিক্য। যেখানে অধীরতাংশের আধিক্য সেখানে সরোষেই বক্রোক্তি করেন, নয়নজল বাহির হয় না। এখানে অধীরতাংশের আধিক্যই বুঝিতে হইবে।

অপর কেহ কেহ এই গীতটিকে কলহান্তরিতার গীত বলেন। তাঁহারা এই গীতের অর্থ করেন, রাধা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত এবং অপমানিত হইয়া মানিনী শ্রীরাধার সহিত পুনরায় মিলনের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠার তাড়নায় শ্রীকৃষ্ণ এক দূতীকে শ্রীরাধার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরাধা সেই দূতীকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ববৎ কথা গুলি বলিলেন।

শ্রীরাধা মোহন ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'পদামৃত সমুদ্র' নামক সংগ্রহগ্রন্থে এই গীতটিকে কলহান্তরিতা নায়িকার প্রকরণে ফেলিয়াছেন। কিন্তু এই গীতটির মধ্যে কলহান্তরিতা নায়িকার সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট হয় নাই। তবে মানিনীর মানের প্রাখর্য্য তখন মন্দীভূত হইয়া ধীরাধীর মধ্যা নায়িকার লক্ষণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তিনি এই গীতের অব্যবহিত পূর্বে চণ্ডীদাসের মানভঞ্জনের একটি পদকীর্তন সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। যথা,—

'শুনলো রাজার ঝি	আনত সংকেত করি।
লোকে না বলবে কি ?	তাঁহা জাগাইলে হরি॥
মিছাই করলি মান।	উলটি করসি মান।
তো বিনু জাগল কান॥	বড়ু চণ্ডীদাস গান।"

শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত দূতী রাধাকে বলিতেছেন, 'রাধে! লোকে শুনলে বলবে কি? তুই অকারণে মান করলি। তোর বিরহে কাহ্নু সমস্ত রাত জেগে বসেছে। তুই সংকেত করে তাকে ডেকে আনলি, সারারাত তাকে জাগালি। আর উল্টা মান করে বসলি।'

তৎপরে সেই দূতীর কথা শুনিয়া শ্রীরাধা উত্তর দিলেন,

'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল॥'

এই গীতটি শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভুর রায় রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিয়া সাধ্য সাধন তত্ত্বের আলোচনা এইখানেই পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন। কবি কর্ণপূর মুখাচ্ছাদনের দুইটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন একটি প্রভুর আনন্দ বৈবশ্য, অর্থাৎ আরও অগ্রসর হইলে হয়তো তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারিবেন না, অপরটি ইহা অতীব গুহ্য এবং রহস্যময়।

তৎপরে যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত তনুরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তাঁহারা বলিবেন যে তত্ত্বটি বিশেষ ভাবে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িলে প্রভুর গোপনী তত্ত্বটি ফাঁস হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায়।

ডঃ রাধা গোবিন্দ নাথ মহাশয় তাঁহার 'গৌর কৃপাতরঙ্গিনী' টীকায় ইহা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। (চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ)

যাহা হউক, মনে হয় এই গীতটি আক্ষেপানুরাগের গীত। আক্ষেপানুরাগের মধ্যদিয়া 'বিলাস বিবর্ত' পরিস্ফুট হইয়াছে। কারণ শ্রীমতীর সংযোগেও যেমন অসংযোগের অবস্থা থাকে, সেই প্রকার অসংযোগেও সংযোগের মধুর স্মৃতি তাঁহার চিত্তাকাশে ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে বিবিধ ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপ্লুতকরে।

পদামৃত সমুদ্র ও তদনুযায়ী সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত—শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থের ২য় শাখা ২১ পল্লবে 'মান প্রকারান্তর' প্রকরণে এই গীতের শেষ দুইটি পংক্তি আছে। যথা

'বর্দ্ধন—রুদ্র—নরাধিপ—মান।

রামানন্দ রায় কবি ভান॥''

ইহার দুটি অর্থ—প্রথম অর্থ রুদ্রগুণের দ্বারা অর্থাৎ ক্রোধভাব দ্বারা নরাধিপের (প্রতাপরুদ্রের) মানের ন্যায় শ্রীরাধার মান বর্দ্ধন। দ্বিতীয় অর্থ প্রতাপ রুদ্র মহাশয় বর্ধিত মান (সম্মান) যাঁহার, ইহা কবিকে সম্মান জ্ঞাপন করা হইতেছে।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১	৬	দুঃখংমাভূঃ	দুঃখংমেমাভূৎ
,,	১	১৩	অীব	জীব
৫	১	২	রিষ্টা	রিষ্টা
৯	২	১	সম্যক্ত	সম্যঙ্
১১	৪	৫	অখণ্ড ঘন	অখণ্ড জ্ঞান ঘন
১৩	২	১	সাধুঙ্গোহথ	সাধুসঙ্গোহথ
৩১	৫	১	পর্য্যপাসতে	পর্য্যপাসিতম
৭২	১	১	অ নত্বসুগন্ধ	আমিত্বগন্ধ
,,	,,	,,	সুখবাসনা	স্বসুখবাসনা
৪৩	২	৩	ব্যাজানাৎ	ব্যাজান্
৪৪	৫	১	নরলীলা	নবলীন
৬১	৩	১১	অভিহিত	অভিভূত
৬২	২	৭	শিক্ষা	কক্ষা
৬৩	৪	১	মোর	মোড
ঐ	৪	১	শ্রীকৃষ্ণনন্দন	শ্রীকৃষ্ণনন্দনন্দন
৮০	৩	৮	তাল	তাতল
৯৬	২	৪	কৃষ্ণপ্রেমের	কৃষ্ণমাধুর্য্যের
১২১	১	৮	খিলা	খিন্না
১৪৬	২	২	শ্যামোহয়ং	শ্যামবর্ণোহয়ং
১ ৯	২	১	কোপনস্বভাবা	কোপনস্বভাব
১৫৪	১	৬	প্রেমপ্রীতি	প্রেমনীতি
২০৪, ২০৯, ২১৫	১, ৩, ১	৭, ২, ৩	পারিপূবক	পরিপোষক
২৭২	২	২	শ্রুতিবাচ্য	শ্রুতিবাক্য
	৬	৮	শুদ্ধবুদ্ধ	শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত